পাঁচফোড়ন

ইন্দ্রনীল সান্যাল

আচ্ছা, স্বপ্নে কি গন্ধ পাওয়া যায়? স্বপ্ন নিয়ে নানা তত্ত্বকথা আছে। স্থান ও কালের

ওলটপালট, অবদমিত কামনার হঠাৎ বহিঃপ্রকাশ, সুপ্ত ইচ্ছার জেগে ওঠা...আরও সব হাবিজাবি। স্বপ্নে রং থাকে কি থাকে না, স্বপ্ন দীর্ঘ হয় না হ্রস্ব, স্বপ্ন দেখতে-দেখতে কেউ-কেউ কেন চিৎকার করে ওঠে, তা নিয়েও নানা কূটকচালি। তা বলে গন্ধওয়ালা স্বপ্ন? স্বপ্ন দেখতে-দেখতে এই সব ভাবছিল মধুরা। স্বপ্ন দেখতে-দেখতেই ভাবছিল। কারণ, এখনও তার ঘুম ভাঙেনি।

স্বপ্নের মধ্যে জায়ফল, জয়ত্রি, কেওড়া, গোলাপজল, পাঁঠার মাংস আর ঘি মিলেমিশে বিরিয়ানির উৎকৃষ্ট গন্ধ-জলসা বানিয়েছে। যদিও দৃশ্য বলতে বিশ্রী ট্রাফিক জ্যাম। ট্রাফিক সিগনালের ডিসপ্লেতে ডিজিটাল অপেক্ষাঘড়ির ষাট সেকেন্ড কমতে-কমতে শূন্যের দিকে আসছে। সামনে পরপর দাঁড়িয়ে লরি, টেম্পো, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, সরকারি ও বেসরকারি বাস। ধোঁয়া এবং ধুলোয় চারিদিকে দমচাপা ভাব। মাথার উপরে খটখট করছে জুন মাসের রোদ। গাড়ির চাকার তলায় পিচ গলে যাচ্ছে চড়চড় করে। দু'টো কুকুর নর্দমার নোংরা জলে বসে আধহাত জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার লাল শালু দিয়ে মুছে নিচ্ছে কপাল, গলা, ঘাড়ের ঘাম।

আর এসবের মধ্যে ভেসে আসছে বিরিয়ানির সুবাতাস!

"ওরে মধু, ওঠ! সাড়ে সাতটা বেজে গেল। তোকে সাড়ে আটটার মধ্যে বেরতে হবে। অফিসে জয়েন করার দিনে কুঁড়েমি করিস না!" স্বপ্নের পিণ্ডি চটকে মধুরাকে ঘুম থেকে তুলে দিল তার মা যুথিকা। তারপর হাঁটুর ব্যথার কারণে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মায়ের কি কোনও দিনও কাণ্ডজ্ঞান হবে না? বিছানায় বসে আয়নার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে ভাবল মধুরা। একটা সুন্দর স্বপ্নের গলা জল্লাদের মতো কেটে কেউ ঘুম ভাঙিয়ে দেয়? মহিলার প্রাণে কি কোনও মায়াদয়া নেই? মুখ তোম্বা করে আয়নায় নিজেকে মাপতে থাকে মধুরা।

পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি বাঙালি মেয়েদের স্ট্যান্ডার্ড উচ্চতা। কিন্তু মধুরার বরাবরের দুঃখ, সে কেন আর দু'ইঞ্চি লম্বা হল না! কলেজে পড়ার সময়েও গোপন আশা ছিল, বাড়ের বয়স এখনও যায়নি। গ্র্যাজুয়েশনের আগে ঠিক সে পাঁচ ফুট পাঁচ হয়ে যাবে। কিন্তু সে গুড়ে মরুভূমি ঢেলে কলেজ জীবন শেষ হয়ে গেল।

দুঃখ কি আর একটা? ভগবান তাকে আর এক পোঁচ ফরসা করতে পারত। সেটাও করল না। মধুরা কালো নয়, তা বলে ফর্সাও নয়। ওই, যাকে বলে গমরঙা ত্বক, তার চেয়ে এক শেড অন্ধকার। তাকে কি কালো বলে? বলে না। কিন্তু মধুরার মন মানে না। সামান্য কমপ্যাক্ট বোলালেই ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু সেটাই বা করতে হবে কেন? দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে হাই তুলে ফেলে সে।

মাথার চুল একটা অ্যাডভান্টেজ। যুথিকার মাথায় এই বয়সেও কোমর পর্যন্ত চুল। মায়ের চুল-জিন পেয়েছে মধুরা। তারও একমাথা চুল। কিন্তু আজকের জমানায় অত চুল দিয়ে কী হবে? পরচুলা কোম্পানিকে চুল বিক্রি করা অথবা হেয়ার অয়েলের মডেল হওয়া ছাড়া কেশবতী কন্যাদের কোনও প্রসপেক্ট নেই। মেনটেন করা কি মুখের কথা? প্রতি সপ্তাহে প্রায় এক বোতল শ্যাম্পু আর এক বোতল কন্ডিশনার শেষ হয়ে যায়। গতকাল তাই পার্লারে গিয়ে চুল ছেঁটে এসেছে মধুরা। অফিসের জন্য কেজো, নো মেনটেন্যান্স, ফাস ফ্রি কাট।

উচ্চতা হল, রং হল, চুল হল। এবার মুখ।

উফ, মাগো! লজ্জায় চোখ বন্ধ করে ফেলে মধুরা। দেখতে সে খারাপ না। কিন্তু বেঢপ চশমা চোখে উঠে পুরো জিওগ্রাফি বদলে দিয়েছে। যতই ফ্যাশনেব্‌ল ফ্রেম হোক না কেন, বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ের মুখে কি চশমা মানায়? কনট্যাক্ট লেন্সের জন্য চোখের ডাক্তারের পায়ে পড়তেও রাজি ছিল সে। ভদ্রলোক মধুরার বাবা মনোহরের বাল্যবন্ধু। পুরনো জমানার মানুষ। পরিষ্কার বলে দিল, "কনট্যাক্ট লেন্স নেসেসিটি নয়। লাক্সারি। বারফাট্টাই বাপের পয়সায় কোরো না। নিজের পয়সায় কোরো।"

চোখে চশমা গলিয়ে বেজার মুখে বিছানা ছাড়ে মধুরা। এবার বাথরুমে ঢুকতে হবে। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠাটা ট্রু মাচ! আজ থেকে সেই দুঃস্বপ্ন শুরু হল। বাকি জীবন তাকে এই জোয়াল ঠেলতে হবে। সাড়ে সাতটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে রাজচন্দ্রপুরের ভৌমিক ভবন থেকে বেরিয়ে পুলকারে করে নিউটাউন ছোটা। সারাদিন এসি জেলখানায় বন্দি থেকে টেকনোকুলির কাজ করে যাওয়া। গভীর রাতে পুলকারে ভৌমিক ভবনে ফেরা। উফ, হরিব্‌ল!

ভৌমিক ভবন। হাওড়ার রাজচন্দ্রপুরে মেন রাস্তার উপরে এই তিনতলা বাড়িকে এলাকার লোকে এক ডাকে চেনে। তার কারণ, মধুরার বাবা মনোহর ভৌমিক এবং তার ভৌমিক মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। এত ভাল মিষ্টির দোকান গঙ্গার এই পারে দু'টি নেই। ওদিকে বেলুড় থেকে এদিকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত এলাকার লোকজন ভৌমিক মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মিষ্টি বলতে অজ্ঞান। বিশেষত কমলাকান্ত আর আশাপূর্ণা। প্রথমটি কমলাভোগের ভ্যারিয়েশন। দ্বিতীয়টি জলভরা তালশাঁস।

মনোহর এই দোকান বানিয়েছিল নব্বই দশকের গোড়ার দিকে। দু' দশক পেরিয়ে তার এতই রমরমা কারবার যে, দোতলা বাড়ি করে ফেলা ছাড়াও সে দুই ছেলেমেয়েকে প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়ে ফেলেছে। বড় ছেলে কৃশানু পাশ করে চাকরি পেয়েছে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার নিউটাউন ক্যাম্পাসে। মধুরা ফাইনাল সেমিস্টার দেওয়ার আগেই ক্যাম্পাসিং-এর মাধ্যমে তিনটি কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছিল, বেছে নিয়েছে ডিজিটাল ইন্ডিয়া। দাদার কোম্পানিতেই জয়েন করেছে সে। এত দিনের পুরনো, ব্লু চিপ কোম্পানির ইজ্জতই আলাদা।

কৃশানু যে চুপকে-চুপকে প্রেম করত, এটা বাড়ির কেউ জানতে পারেনি। তিন বছর চাকরি করার পর ঘোষণা করে, বিয়ে করব। মনোহর-যুথিকা অবাক! পঁচিশ বছর বয়সে বিয়ে? আজকের জমানায়? জেরা করতে ব্যাপারটা খোলসা হল।

দিয়ার সঙ্গে কৃশানুর যোগাযোগ, আজকাল যেমন হয়, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে। তারপর সেটা প্রেমে গড়িয়েছে। মেয়েটার বাড়ি বেহালা। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করে ইংরেজি ফ্যাশন ম্যাগাজিনের চিফ সাবএডিটর। ধর্মতলায় অফিস। মেট্রোয় যাতায়াত করে।

দিয়ার বাড়ি থেকে বিয়ে দিতে উঠে-পড়ে লেগেছে। কারণ, দিয়ার বয়স সাতাশ। সে কৃশানুর চেয়ে দু'বছরের বড়। উপায় না দেখে কৃশানু বাড়িতে নোটিস দিয়েছে। ভাবী বউমার বয়স নিয়ে যুথিকা গাঁইগুঁই করছিল। আপত্তি ধোপে টেকেনি। দিয়া মেয়েটা ভাল। বেহালা থেকে মফস্‌সলে এসে চমৎকার অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছে। অফিস জার্নির ধকল, অফিসে কাজের চাপ, এসব সামলেও শ্বশুরবাড়িতে সাধ্যমতো সময় দেয়। টিভির সাবানপালা মার্কা 'সাস-বহু' রিলেশন এবাড়িতে নেই। শ্বশুর-শাশুড়ি পুরোদস্তুর কর্মঠ। তা-ও ছুটির দিন দেখে টুকটাক রান্না করা, ভৌমিক মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের হিসেব বোঝা, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, টেলিফোন বিল জমা দেওয়ার কাজ ফটাফট করে ফেলে। এসব ব্যাপারে কৃশানু বরং ঢ্যাঁড়স। সে বিয়ে করেই খালাস।

ভৌমিক ভবনের একতলা জুড়ে মিষ্টির দোকান এবং তার গ্রিনরুম। প্রধান হালুইকর বিমল মোদকের তত্ত্বাবধানে দুধ কেনা, ছানা কাটানো, রস জাল দেওয়া, মিষ্টি বানানোর দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে যায় ভোর থেকে। বিমলের বউ সবিতা দেখে দোতলা ও তিনতলার হোমফ্রন্ট। দোতলায় মনোহর-যুথিকার বেডরুম, কৃশানু-দিয়ার বেডরুম, ড্রয়িং রুম, ওপেন কিচেন, একফালি বারান্দা। তিনতলায় দুটো ঘর। সেখানে রাজত্ব করে মধুরা। আজ থেকে রাজত্বের পালা শেষ। দাসত্বের শুরু। স্নান করে বেরিয়ে চুল মুছতে-মুছতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। এবার সাজুগুজু করতে হবে। গত রাতে ট্রাউজার আর ফর্মাল হোয়াইট শার্ট বের করে রেখেছিল। সঙ্গে মানানসই, ব্ল্যাক লেদারের হোবো ব্যাগ।

স্নান সেরে মুখে আর হাতে সানস্ক্রিন লোশন লাগিয়ে ফটাফট অন্তর্বাস গলায় মধুরা। চুল নিয়ে পড়ে। সানস্ক্রিন শুকোক। তারপর পোশাক পরা যাবে।

"তোমার চা!" দরজার বাইরে হাঁক পাড়ছে সবিতা।

উফ! একটা মিনিটও কি এরা শান্তিতে থাকতে দেবে না? বিরক্ত হয়ে মধুরা চেঁচায়, "নীচে নিয়ে যাও! আমি আসছি।"

"নীচ থেকে হুকুম, উপরে নিয়ে যাও! উপর থেকে হুকুম, নীচে নিয়ে যাও। আমি মানুষ না নাগরদোলা?" গজগজ করতে-করতে চলে গেল সবিতা।

নিজের ব্যাগ ঘেঁটে দেখে মধুরা।

টাকাপয়সা, ক্রেডিট কার্ড, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, দু'টো ছোট ক্লাচ ক্লিপ, মেকআপের টুকিটাকি, স্যানিটারি ন্যাপকিন, ডিও, বেঁটে ছাতা, চাবির গোছা, গতকাল মোড়ের দোকান থেকে কেনা আব্রাহাম সেনের লেখা 'বাদশাহি কুইজিন' নামের পেপারব্যাক...ও হরি! এই জন্য তার স্বপ্নে বিরিয়ানির গন্ধ আসছিল! হাসতে-হাসতে ট্রাউজার আর শার্ট গলায় মধুরা। গত রাতে বইটা পড়ে সে হায়দরাবাদি, অওয়ধি আর কলকাতা বিরিয়ানির রন্ধনপ্রণালীর তফাত বোঝার চেষ্টা করছিল। ওটাই বদহজম হয়ে স্বপ্নে দেখা দিয়েছে। চোখে কাজল, ঠোঁটে সামান্য লিপস্টিক, গায়ে সুগন্ধি। এক হাতে ব্যাগ, অন্য হাতে মোজা নিয়ে তড়বড়িয়ে দোতলায় নামে মধুরা। খাবার টেবিলে সবাই বসে ঘড়ি দেখছে। কৃশানু আর দিয়ার সামনে এক প্লেট করে দালিয়া, মনোহর আর যুথিকার সামনে চা। মধুরা চেয়ারে বসতে সবিতা দালিয়ার প্লেট বাড়িয়ে বলল, "খেয়ে উদ্ধার করো।"

ভৌমিক ভবনে দালিয়া ঢুকিয়েছে মধুরা। প্রথম দিন মনোহর এবং যুথিকার তীব্র প্রতিবাদে ফেলে দেওয়ার উপক্রম হয়েছিল। "এসব উত্তর ভারতীয় খাবার বাঙালি বাড়িতে চলবে না!" রায় দিয়েছিল মনোহর। যুথিকা বলেছিল, "এই অখাদ্য কেউ খাবে না। এর পর কোনওদিন তোর জন্য ছাতু গোলা জল খেতে হবে।"

মধুরা রান্না করার পর খেয়ে সবাই মুদুমন্দ ঘাড় নেড়েছিল, "খারাপ না! ভালই তো! কে যেন বলছিল, খুব পুষ্টিকর!" এই জাতীয় মন্তব্যের শেষে এখন ভৌমিক ভবনে সপ্তাহে একদিন ব্রেকফাস্টে দালিয়া হয়। মধুরা মাথা খাটিয়ে দু'-তিন রকম ভ্যারিয়েশন বের করেছে। মিক্সড মিট অথবা গাজর-কাপসিকাম দিয়ে। দিব্যি খেতে হয়।

মুখে এক চামচ দালিয়া দিয়ে ঘাড় নাড়ে মধুরা। না, হয়নি। কোথাও একটা প্রবলেম আছে!

তড়াক করে চেয়ার থেকে ওঠে সে। আভেনপ্রুফ পাত্রে নিজের এবং দাদা-বউদির দালিয়া ঢেলে এক চিমটি নুন দিয়ে, আধখানা পাতিলেবু টিপে, ভাল করে নেড়ে নিয়ে আভেনে ঢোকায়। আধমিনিট

গরম করে আবার প্লেটে ঢেলে কৃশানু আর দিয়ার সামনে রাখে।
"ব্যাপারটা কী হল জানতে পারি?" কড়া গলায় জানতে চাইল যূথিকা। মায়ের রান্নায় মেয়ের খোদকারি তার পছন্দ হয়নি।
যূথিকার মোটার ধাত। কোনও-কোনও মানুষ জল খেলেও মুটিয়ে যায়। যূথিকা সেই টাইপ। তার ফল যা হওয়ার হয়েছে। হাঁটুর ব্যথায় সারাক্ষণ 'বাপ রে, মা রে' করে বেড়ায়। অ্যালোপাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, নেচারোপ্যাথি, কোনও কিছুতে লাভ হয়নি। শেষ আশ্রয় হিসেবে এক হেকিমকে ধরেছে। সে প্রতি সপ্তাহে এক বোতল তেল সাপ্লাই করে একশো টাকা নিয়ে যায়। মনোহর ঘোষণা করেছে, ওটা তার্পিন তেল আর সাপের বিষের কম্বিনেশন! কথাটা শুনলে যূথিকা বেজায় রেগে যায়। সবিতাকে দিয়ে দু'বেলা হাঁটু মালিশও করায়। ব্যথা এখন কম। বেতো হাঁটু নিয়ে সকাল-সকাল রান্না করেছে। মেয়ের পাকামিতে রাগ হওয়া স্বাভাবিক।
"নুন কম ছিল। আর কী যেন একটা মিসিং ছিল। টেস্টটা খুলছিল না। তাই একটু লেবুর রস দিলাম। ফাটাফাটি খেতে হয়েছে। খাবে একটু?" মায়ের দিকে এক চামচ দালিয়া বাড়িয়ে দেয় মধুরা।
"না গো, মা, চমৎকার খেতে হয়েছে। মধুর সব কিছুতে পাকামি। অফিস যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই," মুখে গরম দালিয়া পুরে বোনকে ধমকায় কৃশানু।
দাদা আর বোন চেহারার দিক থেকে একে অপরের বিপরীত। কৃশানু লম্বা, ফর্সা, সুপুরুষ। রাস্তা দিয়ে গেলে মেয়েরা আড়চোখে মেপে নেয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত গোঁফ ছিল। দু'-একটা পাকতে শুরু করা মাত্র ক্লিন শেভ্ন হয়ে গেছে। তাতে রূপ বেড়েছে বই কমেনি। গাঢ় নীল ট্রাউজার ও পিন স্ট্রাইপড সাদা ফুল স্লিভসে তাকে টিপিক্যাল কর্পোরেট পিপল-এর মতো লাগছে।
"তোকে আর সান্ত্বনা দিতে হবে না," পান চিবোতে-চিবোতে ঠোঁট বেঁকায় যূথিকা। "জবর কাটা বন্ধ করে চায়ে চুমুক দাও। ওটা শরবত হয়ে গিয়েছে!" ফুট কাটে মনোহর।
"তুমি ছোটলোকদের মতো বিড়ি ফোঁকা বন্ধ করো। আমিও পান খাওয়া ছেড়ে দেব," বরকে ধাতানি দেয় যূথিকা।
যূথিকার অভিযোগের পিছনে যুক্তি আছে। মনোহরের আর্থিক অবস্থা বদলেছে। ছেলে, বউমা, মেয়ে হোয়াইট কলার জব করে। এসব সত্ত্বেও নোংরা লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে বিড়ি ফোঁকার স্বভাব যায়নি মনোহরের। দিনে দু' প্যাকেট '১ নং ঘড়ি বিড়ি' ছাড়া চলে না। উঁচু রক্তচাপের জন্য ওষুধ চলছে, রক্তে শর্করার জন্য চলছে ইনসুলিন। কিন্তু বিড়ি বন্ধ করা যাচ্ছে না। এক-একদিন ভৌমিক মিষ্টান্ন ভাণ্ডার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বিমলের সঙ্গে নাকি বাংলুও খায়। মুখে বোঁটকা গন্ধ ছাড়া অবশ্য আর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এসব ব্যাপারে সবিতা মুখ খোলে না। পান চিবোনো স্ত্রী ও বিড়ি ফোঁকা স্বামীর ঝগড়া নিয়ে ছেলেমেয়ে ব্যতিব্যস্ত।
"টেস্টটা বেশ ট্যাঙ্গি হয়েছে," খাওয়া শেষ করে বলে দিয়া, "এটা ক্লাসিকাল দালিয়ার রেসিপি নয়। লেবুটা কেন অ্যাড করলি মধু?"
ইংরেজি ফ্যাশন ম্যাগাজিনে চাকরি করার সুবাদে কলকাতা এবং ভারতবর্ষের নানা সেলিব্রিটিদের সঙ্গে নিত্য ওঠাবসা দিয়ার। কিন্তু তার মাথা ঘুরে যায়নি। ম্যাগাজিনের বাইলাইন তার কাছে রিফ্লেক্টেড গ্লোরি। যার সেল্ফ্ লাইফ পনেরো দিন।
"লেবুটা..." সামান্য ভাবে মধুরা, "কেন? কোনও বারণ আছে নাকি?"
"তা নেই। আসলে সব জিনিসেরই একটা গ্রামার আছে।"
"রান্নার ক্ষেত্রে গ্রামার হল খেতে ভাল লাগা," দালিয়া শেষ করে সিঙ্কে প্লেট রেখে মধুরা বলে, "আমি রেডি। দাদা, তোর হল?"
কৃশানু কিছুদিন হল একটা হ্যাচব্যাক গাড়ি কিনেছে। ভৌমিক ভবনের একতলায় গ্যারেজ। দিয়াকে নিয়ে সে সকালে বেরয়। দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ধরে। এয়ারপোর্টের আড়াই নম্বর গেটের ট্রাফিক জ্যাম টপকে নিউটাউন যেতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগে।
কষ্ট হয় দিয়ার। ডানকুনি লোকাল ধরে দমদম স্টেশনে নেমে সে মেট্রো ধরে। বাকি জার্নিটা স্মুদ। ধর্মতলায় নেমে দু' পা গেলেই অফিস। কিন্তু সকালবেলার ডানকুনি লোকালে দুর্বিষহ ভিড় হয়। প্রতিদিন সকালের ওই দশ মিনিটের জার্নি সারাদিন দুঃস্বপ্নের মতো মাথায় ঘুরঘুর করে। থেকে-থেকেই মনে হয়, কাল আবার? ফেরার সময় একই পরিস্থিতি। অ্যাসাইনমেন্ট থাকলে অফিসের গাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়। না থাকলে, সেই ডানকুনি লোকাল। মহিলা কামরায় বাদুড়ঝোলা অবস্থা। শরীরে কিছু থাকে না। খাওয়া শেষ করে চামচ আর প্লেট সিঙ্কে রাখার আগে দিয়া আড়চোখে কৃশানুর দিকে তাকাল। আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। মধুরার অফিসের প্রথম দিন বলে নয়। অন্য একটা কারণ আছে।
"হ্যাঁ রে মধু, তুই কত মাইনে পাবি?" চায়ে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করে যূথিকা।
"এ আবার কী প্রশ্ন?" বউকে ছদ্ম ধমক দেয় মনোহর, "মেয়েদের বয়স আর ছেলেদের মাইনে জিজ্ঞেস করতে নেই, এটা জানো না?"
"জানি তো!" মুচকি হাসে যূথিকা, "আমি তো আর মধুর বয়স জিজ্ঞেস করিনি। ওর মাইনে জিজ্ঞেস করেছি।"
"থ্রি পয়েন্ট সিক্স ল্যাকস পার অ্যানাম। এক বছর পরে ওটা বেড়ে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ হবে!" গর্বের সঙ্গে বলে মধুরা।
"সেটার মানে কী হল?" পাশ থেকে ফুট

কাটে সবিতা, "আনাম মানে কী?"
"উফ! আনাম নয়, অ্যানাম!" কপাল চাপড়ায় মধুরা, "মানে, মাসে তিরিশ হাজার টাকা।"
"হায় মা!" চোখ গোল-গোল করে সবিতা বলে, "বাইশ বছরের মেয়ে মাসে তিরিশ হাজার টাকা রোজগার করবে! ও দিদি, ওর বিয়ের সম্বন্ধ দ্যাখো।"
"তুই ট্রেনি প্রোগ্রামার হিসেবে জয়েন করেছিস?" থালিয়া নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে জানতে চায় কৃশানু।
"হ্যাঁ।"
"কোন মডিউলে তোকে দিয়েছে জানিস?"
"না," ঘাড় নাড়ে মধুরা। তার এটুকু ধারণা আছে যে, তাকে কোনও টিমে বা মডিউলে কাজ করতে হবে। সেই টিমে একজন টিম লিডার আর প্রজেক্ট ম্যানেজার থাকবে। তাদের ডেজিগনেশন হবে জুনিয়র প্রোগ্রামার।
"ইন্ডিয়ান রেলওয়ের টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটা বড় প্রজেক্ট পেয়েছে ডিজিটাল ইন্ডিয়া। ম্যামথ টাস্ক। ওটাকে অনেকগুলো মডিউলে ভাগ করা হয়েছে। তারই একটায় তোকে ভেড়াবে," আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে কৃশানু।
দিয়া হাত মুখ ধুয়ে রেডি। সে সবিতাকে বলল, "গ্যারাজের চাবি দাও।"
দেওয়ালে ঝোলানো চাবি দিয়ার হাতে দিয়ে সবিতা বলল, "তোমাদের দেরি হচ্ছে না?"
কৃশানু ভুরু কুঁচকে কিছু একটা ভাবছিল। বলল, "সবিতাদি, তুমি আর দিয়া নীচে যাও। বাবা-মা'র সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।"
সবিতা অবাক হয়ে মনোহর-যুথিকার দিকে তাকাল। দিয়া নীচে নেমে যাচ্ছে দেখে তার পিছু নিল।
"শানু, কিছু হয়েছে নাকি রে?" কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে যুথিকা, "ভয়ের চোটে আমার বুক ঢিপঢিপ করছে।"
"কী বলবি, বল," ফতুয়ার পকেটে হাত গলিয়ে বিড়ির বান্ডিল বের করেছে মনোহর।
"আমি...মানে, আমরা...মানে...আমি আর দিয়া মিলে, নাগেরবাজারে একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। আসলে, হাউজ বিল্ডিং লোনটা পাওয়া যাচ্ছিল। ওটা নিলে ট্যাক্স সেভিংস হয়। তা ছাড়া, সত্যি কথা বলতে, এখান থেকে জার্নি করে অফিস করাটা টু মাচ স্ট্রেসফুল। আমি তা-ও গাড়িতে মুভ করি। দিয়ার পক্ষে ফিজিক্যালি ইমপসিবল হয়ে যাচ্ছিল। তাই..."
যুথিকা নীরবে পান চিবোচ্ছে। মনোহর নিঃশব্দে ধোঁয়া ছাড়ছে।
"আমাদের...মানে, আমার কিন্তু অন্য কোনও অ্যাজেন্ডা নেই। তোমরা এটা অন্য ভাবে নিও না, প্লিজ। ইনফ্যাক্ট, মধুও আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে!"
"মধু?" অবাক হয়ে বলে যুথিকা, "ওকেও নিয়ে যাবি?"
"উফ, না! আয়্যাম সরি! মানে, তোমরাও ওখানে গিয়ে থাকতে পার। মানে, যাকে বলে আলাদা হয়ে যাওয়া, সেরকম কোনও প্ল্যান আমাদের নেই। এটা জাস্ট নেসেসিটি। বাবা নাগেরবাজার থেকে রোজ এখানে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে দোকান সামলাক না। দেখি, কেমন পারে!" এবার অফেন্সে খেলছে কৃশানু।
"জাস্ট নেসেসিটি!" আনমনে বলে মনোহর। কণ্ঠস্বর বদলে, বাবা-বাবা ভাব এনে বলে, "তোরা এবার বেরো। এসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে। মধুর দেরি হয়ে যাচ্ছে।"
আধখাওয়া দালিয়ার প্লেট সরিয়ে কৃশানু মুখ ধোয়। তড়বড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামে।
দিয়া এর মধ্যে গাড়ি রাস্তায় নামিয়েছে। সে মধুরাকে বলল, "তুই সামনে বোস। দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে আমি নেমে গেলে তোর দাদা পিছন থেকে সামনে চলে আসবে।"
গাড়ির রং কুচকুচে কালো। দিয়া আর কৃশানু মিলে গাড়িটা যত্নে রেখেছে। সদ্য কেনা বলে মনে হয়। এসির ফুরফুরে হাওয়া খেতে-খেতে মধুরা ভাবল, এই ঠান্ডা থেকে বেরিয়ে বউদিকে ট্রেন ধরতে হবে।
ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরেছে দিয়া। গাড়ি যাচ্ছে শাঁ-শাঁ করে। বালি স্টেশন পেরনোর সময় সে জিজ্ঞেস করল, "বাবা-মা কী বলল?"
"শকড অ্যাজ ইউজুয়াল," বিড়ম্বিত গলায় বলে কৃশানু, "আচ্ছা মধু, তুই বল, এই জার্নি করে রোজ অফিস করা সম্ভব? এটা টর্চার নয়?"
মধুরা কী উত্তর দেবে? সে চুপ করে থাকে।
"আঃ! তুমি এত চাপ নিচ্ছ কেন?" বালি ব্রিজ পেরতে-পেরতে বলে দিয়া।
"মনটা খচখচ করছে। মা প্রায় কেঁদে ফেলেছিল।"
দক্ষিণেশ্বরের ক্রসিংয়ে এসে গাড়ি সাইড করে দিয়া। মধুরাকে বলে, "বেস্ট অফ লাক। অফিসে প্রথম দিনে একদম মুখ খুলবি না। বিহেভ লাইক আ স্পঞ্জ। সব কিছু ইমবাইব করবি। একচুল এদিক-ওদিক হলে ব্যাড ইমেজ তৈরি হবে। হ্যাহা-হিহির কোনও জায়গা নেই। দিস ইজ় নট কলেজ। দিস ইজ় কর্পোরেট জাঙ্গল!"
"জানি", মুচকি হাসে মধুরা, "এমন জ্ঞান দিচ্ছ, যেন যুদ্ধ করতে যাচ্ছি।"
"বাই!" স্টেশনের সিঁড়ির দিকে দৌড়য় দিয়া।
কৃশানু ড্রাইভারের সিটে চলে এসেছে। সিটবেল্ট লাগিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ধরে। এই জার্নিটা খুব উপভোগ্য। ফাঁকা ওয়ানওয়ে, হুটহাট জে ওয়াকার নেই, ক্রসিং বা রেড সিগনাল নেই। পলক ফেলার আগেই চলে এল এয়ারপোর্টের আড়াই নম্বর গেট। এখানে একটা ঘ্যানঘেনে, বিরক্তিকর ট্রাফিক জ্যাম হয়। সেটা পেরতে পারলে আর ঝামেলা নেই। ক্যাজুয়ালি ঘড়ি দেখে মধুরা। দশটা বাজতে দশ।
কলেজ মোড়ের সামনে ব্রেক কষতে বাধ্য হল কৃশানু। বলল, "আবার জ্যাম?"
ঢিল ছোড়া দূরত্বে দেখা যাচ্ছে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার গ্রিন ক্যাম্পাস। কোনও কারণে এখানে বেদম ট্রাফিক জ্যাম। সামনে পরপর দাঁড়িয়ে লরি, টেম্পো, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, সরকারি এবং বেসরকারি বাস। ট্রাফিক সিগনালের ডিসপ্লেতে ডিজিটাল অপেক্ষাঘড়ি ষাট সেকেন্ড কমতে-কমতে শূন্যের দিকে আসছে। এসি অফ করে জানলার কাচ খুলে দেয় মধুরা। মাথার উপরে খটখট করছে জুন মাসের রোদ। গাড়ির চাকার তলায় পিচ গলে যাচ্ছে চড়চড় করে। দুটো কুকুর নর্দমার জলে শুয়ে জিভ বের করে হাঁফাচ্ছে।
ট্যাক্সি ড্রাইভার লাল শালু দিয়ে মুছে নিচ্ছে কপাল, গলা, ঘাড়ের ঘাম। আর এসবের মধ্যে দিয়ে বিরিয়ানির গন্ধ আসছে!
চমকে ওঠে মধুরা! কী হল? সকালের স্বপ্নে সে এই দৃশ্যটাই পেয়েছিল না? ওই অপেক্ষাঘড়ি, ওই জ্যাম, ওই ড্রাইভার, ওই কুকুর, ওই লাল শালু এবং এই গন্ধসমেত?
একেই কি দেজাভু বলে? গন্ধের উৎস খুঁজতে এদিকওদিক তাকায় সে! বাঁদিকে, রাস্তার ধারে একটা ধাবা। বাঁশ ও দরমা দিয়ে তৈরি অস্থায়ী কাঠামো, নির্মাণে রুচির ছোঁয়া আছে। বাঁশের চিকের দরজা, পালিশ করা বাঁশের চেয়ার টেবিল, টবে এরিকা পাম। বাইরে বসার বেঞ্চি, বাঁশের চিকের এপারে রান্নাঘর, ওপারে ডাইনিং এরিয়া। দোকানের বাইরে বিশাল উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে বিরিয়ানি রান্না করছে মাঝবয়সি একজন লোক। পরনে জিন্স আর ফতুয়া। বুকে শেফের অ্যাপ্রন বাঁধা। পেটানো চেহারার ছয় ফুটিয়া লোকটার মাথার চুল নুন-মরিচ। দু'-একদিনের না কামানো দাড়িতে মুখটা সাদা কদমফুলের মতো হয়ে রয়েছে। জায়ফল, জয়ত্রি, কেওড়া, গোলাপজল, ঘি, গরমমশলা, আর

সেদ্ধ পাঁঠার গন্ধ-জলসা ওই হাঁড়ি থেকে আসছে। মধুরা অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে। পাশ থেকে কৃশানু হাঁক পাড়ে, "ও সুলতানদা! আজ বিরিয়ানি?" টেবিল ফ্যান উনুনে ফিট করতে-করতে বাঘডাকা গলায় লোকটা চেঁচাল, "কৃশ, কী খবর? অনেকদিন পরে দেখলাম।"

"পরে কথা হবে," পাল্টা চেঁচায় কৃশানু। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। মধুরা দেখল, ধাবার নাম, 'ক্যালকাটা ধাবা।'

ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় পার্কিংয়ে গাড়ি রেখে কৃশানু বোনকে বলে, "দশটা বাজে। রান!" গাড়ি থেকে নেমে মধুরা দৌড়য়।

২

"ধুর! ভাল্লাগে না!" কাজ করতে-করতে আপনমনে বলল মধুরা।

ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় তার আড়াই মাস চাকরি হয়ে গেল। ট্রেনিং পর্ব চুকিয়ে সে এখন পুরোদস্তুর স্যালারিড এমপ্লয়ি। কিন্তু কারণহীন ম্যানঘেনে একটা মনখারাপ তার পিছু ছাড়ছে না। বৃষ্টির জন্য মনটা ভিজে ব্লটিংপেপারের মতো স্যাঁতস্যাঁত করছে। কাল রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, থামার নাম নেই। রাতে মধুরা যখন বাবা-মা'র সঙ্গে খেতে বসেছে, সবিতা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বলেছিল, "চন্দ্রবেড়। বৃষ্টি হবে।"

"চন্দ্রবেড় আবার কী?" প্রশ্ন করেছিল মধুরা।

"চাঁদের চারদিকে একটা রুপোলি আভা তৈরি হয়। তার মানে বৃষ্টি হবে!" বলেছিল সবিতা।

সবিতার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি করে, শুতে যাওয়ার আগে চড়চড় করে ফুল ফোর্সে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাত একটার সময় যখন মধুরা শুতে গিয়েছিল, তখনও বৃষ্টির ফর্ম মারকাটারি।

এ বছর মনসুন এসেছে দেরিতে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর ঘোষণা করে দিয়েছিল, জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মৌসুমিদেবী আসছেন। তবে তিনি আসেননি। জুন পেরিয়ে জুলাই, জুলাই পেরিয়ে অগস্ট — পরিবেশ বিশারদ, টিভি অ্যাঙ্কর, কাগজের কলামনিস্ট — সকলের ফিল্ড ডে। ওজন স্তরে ফুটো, মার্কিনিদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট, এল নিনো, কিয়োটো প্রোটোকল, ব্যাখ্যার অন্ত নেই। মৌসুমিদেবী মিডিয়ার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে, এসেছেন অগস্টের প্রথম সপ্তাহে। দেরিতে আসা পুষিয়ে দিচ্ছেন মারমুখী ফর্ম দিয়ে!

অফিসের মধ্যে থেকে বোঝা সম্ভব নয় বাইরে কেমন আবহাওয়া। মধুরা তা-ও জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল। আকাশের চেহারা বিশ্রী। ভগবান নোংরা, ভিজে একটা ন্যাতা মেলে রেখেছে। সূর্যদেবের দেখা পাওয়ার ছিটেফোঁটা লক্ষণ নেই। প্রকৃতি ধূসররঙা। আজ কাজের চাপ নেই। মনিটরের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল মধুরা। তার ক্রাইসিসটা কী কারণে? বাড়ির জন্য? এটা ঠিক যে কৃশানু-দিয়া নাগেরবাজারে শিফ্‌ট করার পর ভৌমিক ভবনে একটা পরিবর্তন এসেছে। যুথিকার হাঁটুর ব্যথা বেড়েছে। মনোহর আজকাল সপ্তাহে দু'-তিনদিন বাংলু খাচ্ছে, বিড়ির পরিমাণও বেড়েছে। তিনতলা বাড়িটা তিনজন প্রাণী নিয়ে খাঁ-খাঁ করে। নেহাত সবিতা আছে, তাই টুকটাক চিৎকার শোনা যায়।

কৃশানু আর দিয়া প্রতি সপ্তাহে আসে। ওদের নিজস্ব একটা রুটিন আছে। এক সপ্তাহে কৃশানু একা আসে। পরের সপ্তাহে দিয়া একা আসে। তৃতীয় সপ্তাহে দু'জন একসঙ্গে আসে। এভাবে রুটিন ঘোরে। দিয়া আগের মতোই টেলিফোন বিল, ইলেকট্রিসিটি বিল ভরার কাজগুলো করে। তবে নেটব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। কিছুদিন হল দিয়া মনোহরকে ফুসলাচ্ছে ভৌমিক মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে কম্পিউটার বসানোর জন্য। কিন্তু এসবই সপ্তাহে একবেলার গপ্‌পো। সপ্তাহের বাকি তেরো বেলা ভৌমিকভবন আফিমখোর বাঘের মতো ঝিমোয়। বড়-বড় ঘর, ফাঁকা দালান, পায়রা ওড়া ছাদ মধুরার গলা টিপে ধরে।

সেই কারণেই কি মনখারাপ? নাকি অন্য কোনও কারণ আছে? মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে স্ট্রেচিং করতে গিয়ে গোটা অফিস একপলকে দেখে নেয় মধুরা।

এই অফিসটা তার মনখারাপের কারণ নয়তো? অফিস মানে, অফিসের লোকজন নয়। আরগোনমিক্যালি ডিজাইনড, আলুর গুদামের মতো বড়, অফিসের এই হলঘর। এখানকার আলো নিয়ন্ত্রিত, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত, চেয়ার-টেবিল-কম্পিউটারের উচ্চতা নিয়ন্ত্রিত, মানুষের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত। প্রতিটি মুহূর্ত রেকর্ডেড হচ্ছে ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশনে। এরকম পরিবেশ নাকি কাজের পক্ষে উপযুক্ত। হবে হয়তো! হাই তুলতে গিয়ে মুখে হাত চাপা দেয় মধুরা।

মধুরা কাজ শুরু করেছে যে প্রজেক্ট ম্যানেজারের আন্ডারে, তার নাম সন্দীপ পারেখ। অফিসের সকলে স্যান্ডি বলে ডাকে। বছর ত্রিশের ঝকঝকে যুবকটি অসম্ভব পরিশ্রমী। কথাবার্তায় চৌখস, সহকর্মী ও অধস্তনদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করায় ও করিয়ে নেওয়ায় নিপুণ। অফিসে তার হাঁটাচলা দেখলে মনে হয়, যেন জলের মধ্যে মাছ বিচরণ করছে। এই রুটিন, বোরিং কাজ কেন যে এত আনন্দ নিয়ে করে কে জানে? মধুরার তো ভাল লাগে না!

কেন তার কিছু ভাল লাগছে না! মাত্র আড়াই মাসেই সে চাকরিতে বোর হয়ে যাচ্ছে কেন? তার বয়সি অন্য সহকর্মীরা তো দিব্যি আছে। ওই তো! বাঁ পাশের ওয়ার্কস্টেশনে কাজ করছে অ্যানি ডি কুনহা। ডান পাশের ওয়ার্কস্টেশনে কাজ করছে যিশু সিন্‌হা। দু'জনেই তার মতো জুনিয়র প্রোগ্রামার। সামনের ওয়ার্কস্টেশনে ফোনে বকবক করছে শুভ্র দত্ত। তাদের টিম লিডার। কই, কারও চোখে মুখে তো অবসাদ বা বিষণ্ণতার কোনও ছোঁয়া নেই! মধুরার তবে কী হল? টি....তার মেশিনে পিং করেছে অ্যানি। অফিসের মেশিনের নিজস্ব কমিউনিকেটর আছে। জি টক বা চ্যাটের মতো লিখে-লিখে দরকারি কথা বলার ব্যবস্থা এখানকার স্বীকৃত পদ্ধতি। কে বারবার ওয়ার্কস্টেশন ছেড়ে উঠবে? ছোটখাটো দরকারি কথা এভাবেই আদানপ্রদান হয়ে যায়। সেভাবেই নিজের মনোবাসনা ব্যক্ত করেছে অ্যানি।

চা! আকাশের দিকে তাকায় মধুরা।

ভার্টিকাল ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ডের ফাঁক দিয়ে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতে ব্লটিং পেপার ভাবটা যায়নি। এই বিশ্রী ওয়েদারে চা খাওয়াই যায়। তবে সেটা অফিসের ভেন্ডিং মেশিনের রিসাইক্লেবল কাপে, মাপমতো পারকোলেটেড হওয়া স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় নয়। অফিসের বাইরের রাস্তার দোকানের ভাঁড়ের চা।

"ইয়াপ! টি!" দুটো শব্দ লিখে একটা স্মাইলি জুড়ে এন্টার মারে মধুরা। মেশিন থেকে লগ আউট করে। অ্যানিও চেয়ার ছেড়ে উঠছে।

অ্যানি ডি কুনহার বাড়ি ইলিয়ট রোডে। পড়াশুনো শেয়ারলদা লোরেটো স্কুলে। মধুরার মতোই সে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে কলকাতার প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছিল। অ্যানির অন্য কলেজ হলেও দু'জনেরই স্ট্রিম এক ছিল। অ্যানি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। অ্যানির বাড়িতে তার মা মেরি ছাড়া আর কেউ নেই। অ্যানির বাবা ভিক্টর কিছুদিন হল হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছে। ভিক্টর ডি কুনহার একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ছিল। নাম, 'ডিপ ফোকাস।' ভিক্টর মারা যাওয়ার পর মেরি ফার্মটা চালায়। অ্যানি নিয়মিত তার ফেসবুক প্রোফাইলে ডিপ ফোকাসের অর্গানাইজ করা নানা ইভেন্টের

ছবি আপলোড করে কোম্পানিকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চালায়। কোনও লাভ হয় কিনা, কে জানে! মধুরা দু'বার অ্যানির বাড়িতে গিয়েছে। মেরির সঙ্গেও তার আলাপ আছে।

অ্যানি দেখতে সুন্দর না হলেও, চটকদার। মধুরার চেয়ে অন্তত তিন ইঞ্চি লম্বা। হাই হিল পরে সেটাকে আরও ইঞ্চি দু'য়েক বাড়িয়ে রাখে। চুল কার্ল করা। অফিসে ফর্মাল পোশাক পরে এলেও রংচঙে টাই বা স্কার্ফ জড়িয়ে 'ফান লাভিং' ইমেজ মেনটেন করে। মেয়েটার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ওর নিখুঁত দাঁতের সারি। প্রাণ খুলে অথবা মুচকি হাসলে জুঁই ফুলের মতো সাদা দাঁতের পাটি দেখা যায়।

দু'জনে একসঙ্গে লিফ্‌টে উঠল। পিছন-পিছন ঢুকল শুভ্র।

"তুইও?" আঁতকে উঠে বলে মধুরা, "সবাই মিলে পিকনিক করতে যাচ্ছি নাকি?"

"আমি ওকেও পিং করেছিলাম," লিফ্‌টের বোতাম টিপে বলে অ্যানি, "এখন চাপ কম। পাঁচ মিনিট ঘুরে এলে কিস্‌সু হবে না। স্যান্ডিকে বলে এসেছি।"

"তুই নিউজ় চ্যানেলের অ্যাঙ্করদের মতো ওভার দা টপ চেঁচাচ্ছিস কেন?" শুভ্র বলে মধুরাকে, "মাথা ঠান্ডা রাখ। আর ভুরুটা ইস্তিরি কর। বড্ড কুঁচকে আছে।"

"ভ্যাট!" হেসে ফেলে মধুরা।

"অ্যান্ড প্লিজ় ড় লাফ! হাসলে কী সব ভাল-ভাল ব্যাপার হয়। পড়েছিলাম। ভুলে গেছি।"

"পড়েছিলি?" চোখ কপালে তুলে অ্যানি বলে, "ফেসবুকের অন্যদের স্টেটাস আপডেট ছাড়া তুই আর কিছু পড়িস?"

"চেতন ভগত পড়ি, ইংরেজি খবরের কাগজের হেডলাইন পড়ি আর খেলার পাতা পড়ি," লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে বলে শুভ্র, "তুই আর কিছু পড়তে বলিস না প্লিজ়, চাপ হয়ে যাবে!"

শুভ্রর কথা বলার ধরন দেখে মধুরা আর অ্যানি হেসে ফেলে।

শুভ্র দত্তর বাড়ি বাগবাজারে। ওদের জয়েন্ট ফ্যামিলি। সবাই এক ছাদের তলায় থাকলেও আলাদা-আলাদা ইউনিট।

শুভ্রর বাবা গুরুপদ দত্ত পুলিশ অফিসার। কাকারা সরকারি চাকরি করে। শুভ্রর চাকরিকে তারা ভাল বুঝতে পারে না। বুঝতে চায়ও না। মাইনের বহর শুনে গোপনে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগলেও সামনাসামনি নাক সিঁটকোয়। বাবা-মা'র এক ছেলে হওয়ার কারণে শুভ্র একটু আদুরে টাইপের। দেখতে-শুনতে চকচকে। লম্বা, শ্যামল ও সুপুরুষ। স্কুল লাইফের শেষ দিকে এবং গোটা কলেজ জুড়ে মেয়েদের অ্যাডমিরেশন পেয়ে-পেয়ে যথেষ্ট মেয়েবাজ ও খিলাড়ি টাইপ। নিখুঁত সাজপোশাক করে, পনেরো দিনে একবার পার্লারে গিয়ে চুল কেটে আর মুখ পালিশ করে আসে, টি-শার্টের সঙ্গে রং মিলিয়ে স্নিকার্স পরে। গমগমে গলার আওয়াজ, মেয়েদের তোল্লাই দেওয়ার ব্যাপারে পিএইচডি করেছে! যার ফলে কোনও মেয়েই শুভ্রকে ভরসা করতে পারে না। বেচারির তাতে কোনও হেলদোল নেই। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ক্যাম্পাসের ঠিক বাইরে একগাদা ঝুপড়ি বা ঝুপস। গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে একটা ঝুপসের দিকে হাঁক পাড়ে শুভ্র, "অ্যাই মন্টু, তিনটে চা।"

"এখানে দাঁড়িয়ে চা খাব? চল না, দোকানে যাই," আপত্তি করে মধুরা।

"না বস! আমার জুতো খারাপ হয়ে যাবে," ধোঁয়া ছেড়ে শুভ্র বলে, "বৃষ্টি বন্ধ হয়নি। আমি ভিজতে পারব না। তোর ইচ্ছে হলে যা।"

কথা কাটাকাটির মধ্যে মন্টু একটা প্লেটে তিন ভাঁড় চা নিয়ে দৌড়ে এসেছে। শুভ্র টপ করে একটা ভাঁড় তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বলল, "আঃ, ফাটাফাটি!"

অ্যানি চায়ের ভাঁড় মুখে ঠেকিয়ে মধুরার দিকে তাকিয়ে বলল, "ফাটাফাটি? ইজ় দিস টি অর সামথিং এলস?"

সন্তর্পণে চায়ে চুমুক দেয় মধুরা। বলে, "অ্যাই মন্টু, তোর দোকানে আদা নেই?"

"না!" বছর বারোর ছেলেটা বিরক্ত হয়ে ঘাড় নাড়ে। তার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মন্টুর প্লেটে আধ খাওয়া চায়ের ভাঁড় রাখে মধুরা। অ্যানিও রাখে। মধুরা শুভ্রর হাত থেকে ভাঁড় নিয়ে প্লেটের উপরে রেখে বলে, "পাঁচ মিনিট দাঁড়া। আমি আসছি।" তারপর বৃষ্টির মধ্যে মন্টুকে নিয়ে ঝুপসের দিকে দৌড় দেয়। মন্টু দোকানে ঢুকে যায়। মধুরা রাস্তা পেরিয়ে কলেজ মোড়ের ক্যালকাটা ধাবার সামনে এসে দাঁড়ায়। স্বপ্নে যে ধাবাকে সে দেখতে পেয়েছিল বিরিয়ানির গন্ধসহ।

গত আড়াই মাসে ক্যালকাটা ধাবা সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পেরেছে মধুরা। মালিকের নাম সুলতান। পদবি সিংহ। সকলের কাছে সে সুলতানদা। বাংলা এবং হিন্দি, দু'টো ভাষাই এত স্পষ্ট এবং জড়তাহীন বলে যে, বোঝা সম্ভব নয় বাঙালি না অবাঙালি। সুলতানদার বউয়ের নাম পারুল। গুটগুটে চেহারার কালোপানা মেয়েটি ছাপা শাড়ি পরে দিনরাত হেঁসেল সামলায়। ওদের একটাই ছেলে। মন্টু। তাকে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সামনে চায়ের ঝুপস করে দিয়েছে সুলতান।

একটু অদ্ভুত ব্যাপার মধুরা লক্ষ করেছে, ডিজিটাল ইন্ডিয়া বা আশেপাশের অফিসের ছেলেমেয়েরা কেউ এই ধাবায় খেতে আসে না। তাদের পছন্দ ঝুপসের চটজলদি খাবার। সহজপাচ্য, পকেটসই এবং কুইক সার্ভিস। ক্যালকাটা ধাবায় এই তিনটের কোনওটাই নেই। এদের ক্লায়েন্ট আলাদা। এই ধাবার একটা বড় কাজ হল হোম সার্ভিস এবং অফিস পার্টিতে খাবার পাঠানো। বাল্ক অর্ডার। তা ছাড়া সন্ধের পরে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পেল্লায়-পেল্লায় গাড়ি এসে ধাবার সামনে লাইন লাগায়। মটন বিরিয়ানি আর চিকেন চাঁপ কেনার জন্য ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকে। ধাবার ভিতরে বসার ব্যবস্থা আছে। সেখানে প্রায়ই ছোটখাটো পার্টি হয়। মোদ্দা কথা, দরমা ও বাঁশের তৈরি ধাবাটি যথেষ্ট আপমার্কেট এবং হেপ। ইংরেজি কাগজের মেট্রো সেকশনে এই ধাবার মটন বিরিয়ানি নিয়ে, অথবা ন্যাশনাল টেলিভিশনের খাওয়াদাওয়া সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে এই ধাবার চিকেন চাঁপ নিয়ে অনেক শব্দ এবং বাইট খরচ করা হয়। তবে সেসব শব্দ ও বাইট সুলতান বা পারুলের উপরে প্রভাব ফেলতে পারেনি।

সুলতান বাসন মাজছিল। তিনটে বড় হাঁড়ি আর ডেকচি থেকে পোড়া দাগ ওঠাতে-ওঠাতে এক পলক মধুরার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

"একটু আদাকুচি হবে? আপনার ছেলে এত বিশ্রী চা করেছে যে, মুখে তোলা যাচ্ছে না!" গড়গড় করে বলে মধুরা।

"মন্টু বাজে চা করেছে সেটা বলতে আমার কাছে আসতে হল কেন? ওর গালে একটা থাপ্পড় কষালেই তো পারতে! মেয়েছেলেদের কানভাঙানি স্বভাব আমার পছন্দ নয়।"

"কান ভাঙাতে আসিনি। একটু আদাকুচি চাইতে এসেছিলাম। বাই দ্য ওয়ে, 'মেয়েছেলে' শব্দটা খুব কানে লাগে। ওটা বলা বন্ধ করুন!" তেড়িয়া জবাব দেয় মধুরা। একটু আগের মনখারাপ তার মাথা থেকে উড়ে গেছে। এখন একটা ঝগড়া হলে খারাপ হয় না। চেঁচালে ডিপ্রেশন কাটবে।

"এটা কি সরকারি লঙ্গরখানা নাকি যে, যা চাইবে তাই পাওয়া যাবে?" তারের জালি দিয়ে পোড়া কার্বন তুলতে-তুলতে হুঙ্কার ছাড়ে সুলতান।

"না, আসলে আজ অফিসে ঢোকার সময় মাছ ম্যারিনেট করার গন্ধ পেলাম। তাতে আদা ছিল... তাই!" ঝগড়া ভুলে গিয়ে মুচকি হেসে বলে মধুরা।

"আর কীসের-কীসের গন্ধ পেলে?" বাসন মাজা বন্ধ রেখে মধুরাকে জেরা করে সুলতান।
"উমম্...." একটু ভাবে মধুরা, "হলুদ ছিল, লঙ্কা ছিল, পেঁয়াজ ছিল..."
"ওগুলো যে কোনওরকম ম্যারিনেট করার সময় দেওয়া হয়," আবার বাসন মাজা শুরু করেছে সুলতান। ভিতর থেকে পারুল বেরিয়ে এসে একটা কাগজের পুরিয়া মধুরার হাতে ধরিয়ে বলে, "তুমি যাও। অফিসের দেরি হয়ে যাবে। আমার বরের কথায় কিছু মনে কোরো না।"
পারুলকে পাত্তা না দিয়ে মধুরা বলে, "নারকেল ছিল আর, আর, আর..."
সুলতান বাসন মাজা বন্ধ করে মধুরার দিকে তাকিয়ে বলে, "বাকিটা বলতে না পারলে গালে এক থাবড়া কষাব!"
"ও আবার কী অলক্ষুণে কথা! অচেনা মেয়েকে কেউ এসব বলে?" পারুল মধুরার হাত ধরে টানতে-টানতে ধাবার বাইরে নিয়ে আসে, "তুমি যাও মা! অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে।"
অল্প-অল্প সূর্য উঠছে। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। লম্বা-লম্বা পদক্ষেপে রাস্তা পেরতে-পেরতে মধুরা চেঁচিয়ে বলল, "তেঁতুল ছিল! আপনি কোনও একটা সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশ বানাচ্ছেন। মোস্ট প্রোব্যাবলি মালাবার ফিশ কারি।"
মধুরা যদি পিছনে ফিরে তাকাত, তা হলে দেখতে পেত, বাসন মাজা বন্ধ রেখে সুলতান জ্বলজ্বলে চোখে উঠে দাঁড়িয়েছে!

মস্টর ঝুপসে এসে কাগজের পুরিয়া খুলল মধুরা। আদাকুচির সঙ্গে কাবাব চিনি রয়েছে। কেয়া বাত! এবারে চা জমে যাবে! মস্টকে সরিয়ে ফুটন্ত সসপ্যানে আদাকুচি আর কাবাব চিনি ঢেলে দেয় মধুরা। সামান্যক্ষণ ফোটার পর চেনা গন্ধটা নাকে আসে। সর্দিকাশি-জ্বর হলে মা আদা দিয়ে কড়া করে চা বানিয়ে দেয়। সেই চায়ের গন্ধ। ছাঁকনি দিয়ে তিনটে ভাঁড়ে চা ছেঁকে, একটা স্টিলের থালায় ভাঁড় তিনটে নিয়ে আবার গাড়িবারান্দায় ফিরে আসে মধুরা। শুভ্রর সিগারেট শেষ। সে মোবাইলে কথা বলছে। অ্যানি চিন্তিত মুখে ঘড়ি দেখছে।
"কোথায় গিয়েছিলি?" ফিসফিস করে বলে অ্যানি, "স্যান্ডি খোঁজ করছে।" শুভ্রর মোবাইলের দিকে আঙুল দেখায় সে।
"চা খা," একটা ভাঁড় অ্যানির দিকে এগিয়ে দেয় মধুরা।
ফোন কেটে শুভ্র বলল, "বসের আজ মুড ভাল। তাই ঝাড়ল না।"
"ফোন করেছিল কেন?" শেষ ভাঁড়টা শুভ্রর হাতে ধরিয়ে ইশারায় মস্টকে ডাকে মধুরা।
"টিটো ম্যাকাফেতে চান্স পেয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া ছেড়ে দিচ্ছে। ও আমাদের ফেয়ারওয়েল পার্টি দিতে চায়।"
"কবে?" প্রশ্ন করে মধুরা।
"স্যান্ডি সাজেস্ট করছে, আজ পার্টি করতে। কাল ১৫ অগস্ট। ন্যাশনাল হলিডে। হ্যাংওভার নিয়ে আফিসে আসার ঝামেলা থাকবে না।"
"আজ কীভাবে পসিবল?" ভীষণ বিরক্ত হয় অ্যানি, "অফিসওয়্যারে পার্টিতে যাব? সাজব না?"
শুভ্র বলে, "একটা গাড়ি সবক'টা মেয়েকে নিয়ে আগে বেরিয়ে তোর বাড়ি চলে যাবে। সেখান থেকে সাজুগুজু করে তোরা আসিস। ভেনু ইজ ট্যাংরা!"
"বুঝলাম," লিফটে উঠে বলে অ্যানি, "চল, এবার কিছুক্ষণ কাজ করা যাক। আমরা সাড়ে পাঁচটায় বেরব।"

অ্যানিদের ইলিয়ট রোডের ফ্ল্যাটে সন্ধে ছ'টার সময় পৌঁছল চারজন মেয়ে। অ্যানি, মধুরা ছাড়া মোনালি আর দেবশ্রী। এই দু'জন মধুরার সঙ্গেই ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় জয়েন করেছিল। ওরা অন্য মডিউলে কাজ করলেও মধুরাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। ইলিয়ট রোডে অ্যানিদের ফ্ল্যাটটা রোজ অ্যাপার্টমেন্টের তিন তলায়। দু'কামরার ফ্ল্যাট। কিচেন ও ডাইনিং স্পেস ছাড়া একটা হল আছে। ডিপ ফোকাসের অফিস রোজ অ্যাপার্টমেন্টের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। ঢোকার সময়ই অ্যানি সেখানে খোঁজ নিয়েছে। অফিস খোলা থাকলেও মেরি এখন উপরে।
মেরিকে মধুরা 'মেরি মাসি' বলে ডাকে। মেরি রান্নাঘরের সিঙ্কে বাসন মাজছিল। মধুরা তার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, "মেরি মাসি, হেল্প করব?"
"বাসন মাজায় হেল্প? মাথা খারাপ নাকি?" একগাল হাসে মেরি, "তোদের জন্য চা করব, দাঁড়া।"
"শুধু চা? আর কিছু নেই?" মেরির হাত থেকে চায়ের কেটলি নিয়ে মাজতে শুরু করেছে মধুরা।
"গ্রিল্ড ফিশ আছে। ভেটকি বা পমফ্রেট না পেয়ে অন্য একটা মাছ নিলাম। কী মাছ, কে জানে! ডি-বোনিংয়ের পর হাত থেকে মাছের গন্ধ যাচ্ছে না।"
"হাতে হলুদগুঁড়ো লাগিয়ে রাখো। একটু পরে গন্ধ চলে যাবে," কেটলি শুঁকে মধুরা বলে, "তোমার কেটলির ভিতরটা খুব নোংরা মেরি মাসি।"
"কী আর করি বল!" হাতে হলুদগুঁড়ো মাখতে-মাখতে মেরি বলে, "একা বুড়ি কত দিক সামলাব? তোমার বন্ধু বাড়ির কোনও কাজ করে? সে শুধু সাজতে ব্যস্ত! আমাকেই সব সামলাতে হয়।"
"ওরে তুই আমার মাকে জ্ঞান না দিয়ে এই ঘরে আয়। ওয়্যাক্সিং কবে করেছিস?" আবার হাঁক পাড়ে অ্যানি। দেবশ্রী আর মোনালি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।
"আমি জিন্স পরে থাকব। আমার পায়ের লোম নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না," অ্যানির ঘরে ঢুকে বলে মধুরা, "তুই আমাকে একটা শর্ট জ্যাকেট বা স্কার্ফ দে। ওতেই আমার হয়ে যাবে।"
"মাই-মাই!" খিলখিলিয়ে হেসে মোনালি বলে, "শুভ্র তোর জন্য সিগারেট খাওয়া বাড়িয়ে দিল। এই পার্টিটা টিটোর ঘাড়

ভেঙে অর্গানাইজ করল। আর তুই সাজবি না? তুই কী নিষ্ঠুর রে!"
"বাজে বকিস না তো!" মধুরা বলে।
"অনেস্টলি মধু!" মধুরার কনুই ধরে অ্যানি বলে, "শুভ্র তোর জন্য ফিদা! ভয়ের চোটে বলতে পারছে না। আমাকে অনেক দিন ধরে বলছে। আজ তোকে কনভে করে দিলাম।"
"শুভ্র?" অ্যানির জাঙ্ক জুয়েলারির বাক্স খুলে গয়না বাছতে বসে মধুরা, "ওয়েল, আমি এই নিয়ে কিছু ভাবিনি।"

৩

কয়েক বছর আগেও ট্যাংরায় এত রেস্তরাঁ ছিল না। এখন প্রতি বাড়িতে একটি চাইনিজ খাদ্যের ঠেক! তাদের নামগুলোও অভিনব। 'ফ্যাট নানিজ় কিচেন', 'আঙ্কল জো' 'জ় কেবিন', 'সুন-লি', 'চায়না স্কোয়ার', 'হট ওয়ক', 'ট্যাংরা কুইজ়িন!' 'হিন্দি চিনি ভাই-ভাই' তত্ত্ব মেনে নামের সাড়ে বত্রিশ ভাজার যাবতীয় এক্সপেরিমেন্টেশন সম্পূর্ণ।
মধুরাদের বরাবরের পছন্দ সুন-লি। এর কারণ, সুন-লির দোতলায় একটা হলঘর আছে। যেখানে তিনটে বড় টেবিল ঘিরে জনাবিশেক লোক বসা যায়। প্রাইভেট পার্টি অর্গানাইজ় করার পক্ষে আদর্শ জায়গা। হইহল্লা হলে কেউ বিরক্ত হওয়ার নেই। সুন-লিকে শুভ্র পছন্দ করে, তার কারণ, তাকে সিগারেট খেতে দেখলে মালকিন রিটা 'নো স্মোকিং' বোর্ড দেখিয়ে বলে, "অ্যাশট্রে দেব না। মেঝেতে ছাই ফেলুন। পুলিশ এলে আপনি আমাকে বাঁচাবেন।" বেশ কয়েকবার সুন-লিতে যাওয়ার সূত্রে রিটা জেনে গিয়েছে যে, শুভ্রর বাবা গুরুপদ পুলিশ অফিসার।
তিনটে গাড়ি চেপে ১৫ জন ছেলেমেয়েকে নামতে দেখে রিটা এগিয়ে এসে বলল, "ওয়েলকাম গার্লস। ওয়েলকাম বয়েজ।" ডিজিটাল ইন্ডিয়ার এই ছেলেমেয়েগুলো আগামী দু'তিন ঘণ্টায় ১০-১২ হাজার টাকার বিল করবে। একট্রা খাতির এদের প্রাপ্য। টিটো আগে থেকে রিটাকে ফোন করে হলঘর বুক করে রেখেছিল। ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস হিসেবে রিটা অনেকগুলো রংচঙে বেলুন ঝুলিয়েছে আর স্টিমার টাঙিয়েছে। এসি চালিয়ে ঘর ঠান্ডা করে রেখেছে। সে জানে, এরা গরম সহ্য করতে পারে না।
সকলে বসে পড়ার পরে মধুরা খেয়াল করল, কো-ইন্সিডেন্স হোক বা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, শুভ্র তার পাশে বসছে। অন্য পাশে অ্যানি আর যিশু। টিটো যে মডিউলে কাজ করে, সেখানে তার কোলিগ বিশাল আর রোহনদের গ্যাংটা বসেছে অন্য টেবিলে। তিন নম্বর টেবিলে বসেছে, মোনালি, দেবশ্রী এবং গ্যাং অফ গার্লসের একটা ভাগ। অন্য ভাগটা তার সামনে।
রিটা বলল, "কার কী বেভারেজ লাগবে, আগে অর্ডার করো।"
শুভ্র, বিশাল, রোহন, যিশু আর টিটো মিলে মিনিদাঙ্গা বাধিয়ে ফেলল। স্কচ না দেশি হুইস্কি, ভডকা না রাম, বিয়ার না ওয়াইন, এই নিয়ে মারামারি হওয়ার উপক্রম!
মধুরা চেয়ার থেকে উঠে রিটার হাত থেকে বেভারেজের মেনু নিয়ে চেঁচাল, "শাট আপ, ইউ বাঞ্চ অফ ইডিয়টস। আমি অর্ডার করছি।"
মধুরার চিৎকারে সব্বাই চুপ!
ছেলেদের জন্য সিঙ্গল মল্ট। মেয়েদের জন্য ওয়াইন। মধুরা আর বিশাল মদ্যপান করে না। নিজেদের জন্য মকটেল বলল মধুরা।
খাবারের অর্ডারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মধুরা। "খাবারের অর্ডার নিয়ে আমরা অন্যভাবে ভাবতে পারি," আবার নেত্রীর ভূমিকায় মধুরা, "প্রতিবার ইটিং আউটের সময় প্রচুর খাবার নষ্ট হয়। তোরা ড্রিঙ্ক করার পর খেতে পারিস না। স্টার্টার দিয়ে দু'-তিন পেগ উড়িয়ে মাতাল হয়ে যাস। তখন মেন কোর্স, সাইড ডিশ, ডেজ়ার্ট, সব নষ্ট হয়। আজ বরং শুধু মেন কোর্স আর সাইড ডিশ আগে অর্ডার করি। লেটস স্কিপ স্টার্টার অ্যান্ড ডেজ়ার্ট।"
১৫ জনের উপযোগী অর্ডার দেয় মধুরা। চিকেন, প্রন, ল্যাম, মাটন, সি-ফুডের কম্বিনেশন। রাইস এবং চাউমিন অর্ডার দেয় দশ প্লেট। রিটাকে বলে, "চিকেনের প্রিপারেশন আগে দিন। ওগুলো আপনাদের রেডি করা থাকে। বাকিগুলো পরে হলেও চলবে।"
ওয়েটার টেবিলে রেখে গিয়েছে হুইস্কির জন্য ক্রিস্টালের কাট গ্লাস এবং ওয়াইনের জন্য ডাঁটিওয়ালা ওয়াইন গ্লাস। মহার্ঘ সিঙ্গল মল্ট কাটগ্লাসে ঢালা হল। যারা অন দ্য রকস পান করবে, তারা শুধু বরফ নিল। বাকিরা বরফের সঙ্গে মিনারেল ওয়াটার।
সকলের হাতে হুইস্কি, ওয়াইন আর মকটেলের পাত্র পৌঁছনোর পরে মধুরা বলে, "টিটোর বেঙ্গালুরু যাত্রা উপলক্ষে..."
"চিয়ার্স!" সকলে চুমুক দেয়।
রিটার ফিঙ্গার ফুডের সাপ্লাই খুব ভাল। গল্পে-গল্পে কখন যে ছেলেরা প্রথম পেগ শেষ করে দিল, বোঝাই গেল না। মেয়েদের ওয়াইন গ্লাস অবশ্য ভর্তি।
দ্বিতীয় রাউন্ড স্কচ নিয়ে শুভ্র বলল, "টিটো, ম্যাকাফেতে তোর সিটিসি বেড়ে এখানকার দেড় গুণ হল। কিন্তু বেঙ্গালুরু কস্টলি সিটি। ওখানে বাবার হোটেল নেই। ম্যানেজ করবি কী করে?"
"কিছুই জান না বস!" বিশাল মুচকি হেসে বলে, "টিটো আর দেবশ্রী শিগগিরই বিয়ে করছে। দেবশ্রীর অরিজিনাল বাড়ি বেঙ্গালুরুতে। ওদের গুষ্টির সবাই লেক গার্ডেনসে থাকে। বেঙ্গালুরুর বাড়ি এখন তালা মারা আছে। মিয়াঁবিবি সেখানে সেটল করবে।"
"টিটো-দেবশ্রী জিন্দাবাদ!" মাতাল কণ্ঠে হাঁক পাড়ে রোহন।
মুখে হাসি ফুটিয়ে মকটেলে চুমুক দেয় মধুরা। ছেলেগুলো চার-পাঁচ পেগ করে খেয়ে এখন ভুল বকছে। মেন কোর্স আর সাইড ডিশ চলে এসেছে। প্রন আর সি-ফুডের প্ল্যাটার শেষ। চিকেন অনেকক্ষণ উড়ে গিয়েছে। মটন আর ল্যাম পড়ে রয়েছে। রয়েছে রাইস আর চাউমিন। প্লেটে সামান্য মিক্সড চাউমিন আর শ্রেডেড ল্যাম উইথ মাশরুম নেয় মধুরা। গ্রেভি মাখিয়ে চাউমিন মুখে দেয়। বেড়ে খেতে হয়েছে। কম তেলে সতে করা বলে আলাদা-আলাদা মশলার ফ্লেভার পাওয়া যাচ্ছে।
"টিটো অ্যান্ড দেবশ্রী বিয়ে করছে আর তুই একটা ছেলে জোটাতে পারলি না, এই জন্য মনখারাপ?" অ্যানির কৌতূহলের শেষ নেই।
মধুরা আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকায়। সোওয়া ন'টা বাজে। বাড়ি ঢুকতে রোজই রাত দশটা বাজে। আজও সেই সময়ের মধ্যে পৌঁছবে এরকম ভেবে বাড়িতে ফোন করেনি। মনোহর-যুথিকা খুব দরকার না থাকলে অফিস আওয়ারে ফোন করে না। আজ বাড়ি ঢুকতে এগারোটা বাজবে। মাকে ফোন করে বলে দেবে নাকি?
"ঘড়ি দেখছিস কেন?" আবার খোঁচাচ্ছে অ্যানি, "পাশেই তো বসে রয়েছে। হুক, বুক অ্যান্ড কুক।"
"আর একটু ওয়াইন দেব?" অ্যানিকে জিজ্ঞেস করে মধুরা। তারপর চোখ কটমট করে বলে, "ফারদার বাজে কথা বললে তোকে আমি মিন্সড মিট বানিয়ে দেব।"
"ওকে। নো প্রবলেম!" খাওয়ায় মন দেয় অ্যানি।
খাওয়া শেষ হতে-হতে দশটা বাজল। একটুও খাবার নষ্ট হয়নি। রিটা মধুরার মেনু সিলেকশনের প্রশংসা করে টিটোর হাতে বিল ধরিয়ে বলল, "ক্যাশ অর কার্ড?"
হিপ পকেটের পার্স থেকে ক্রেডিট কার্ড বের করে টিটো বলল, "কার্ড।"
"বল, ফেয়ারওয়েল মাই কী..." হাঁক পাড়ে বিশাল।
"জয়!" মেয়েরা একসঙ্গে ধরতাই দেয়।

"নেক্সট কোয়ার্টারে..."
"আবার হবে!"
চেঁচাতে-চেঁচাতে নীচে নেমে যে-যার গাড়িতে উঠে পড়ে। অফিসের গাড়ি ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া নেওয়া হয়েছে। ড্রাইভার পল্টুদা যিশু, রোহন, অ্যানি আর শুভ্রকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার পর লাস্টে মধুরাকে ড্রপ করবে।
মাকে ফোন করতে গিয়ে থেমে যায় মধুরা। বাকি চার জন নেমে যাক। এখন বাড়িতে খবর দিতে গেলে আওয়াজ খেতে হবে।
যিশু আর রোহনকে পার্ক সার্কাস ক্রসিংয়ে ড্রপ করার পর ইলিয়ট রোডের মুখে পৌঁছে একটা কেলেঙ্কারি হল। নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোর পাশে, বিকট ধাতব শব্দ করে, ফাঁকা ফুটপাথে ধাক্কা মারল গাড়ি। শব্দ এবং সংঘর্ষের অভিঘাতে সবাই চিৎকার করে উঠল।
"কেলো করেছে!" গাড়ি থেকে একলাফে বেরিয়ে বলল শুভ্র।
"একটা বিড়াল রাস্তা ক্রস করছিল। তখনই জানতাম, গন্ডগোল হবে। শালা!" বিরক্ত মুখে বলে পল্টুদা, "অ্যাক্সেল ভেঙেছে। এ গাড়ি আজ চলবে না।"
অ্যানি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "শুভ্র, তুই ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে যা। মধু, তুই বাড়িতে ফোন করে বলে দে যে, আমার বাড়িতে থাকছিস। মল্লিকবাজারে অনেক গাড়ি সারানোর দোকান আছে। ওখানে গাড়ি রেখে পল্টুদা বাড়ি চলে যাক।"
অ্যানি গাড়ি থেকে নামে। শুভ্র বলে, "কাল ছুটি। আমি বাইক নিয়ে সকাল সাতটার মধ্যে আসছি। মধুকে বাড়িতে ড্রপ করে দেব। কাকু-কাকিমা যদি রাগারাগি করেন, কনভিন্স করানোর দায়িত্ব আমার।"
"তার কোনও দরকার নেই," তড়বড় করে বলে মধুরা।
"তোর দরকার না থাকলেও, আমার আছে!" মধুরার চোখে চোখ রেখে বলে শুভ্র। তারপর শেয়ালদাগামী একটা খালি ট্যাক্সি দেখে দৌড় লাগায়।

এত রাতেও মেরি শুয়ে পড়েনি। ডাইনিং টেবিলে বসে খুটুর-খুটুর করছিল। কলিং বেলের শব্দ শুনে দরজা খুলে মধুরাকে দেখে বলল, "গাড়ি খারাপ?"
"হ্যাঁ," অ্যানির ঘরে ঢুকে খাটের উপর ব্যাগটা ফেলে ঘোষণা করল মধুরা।
অ্যানিও ঘরে ঢুকেছে। মোবাইল মধুরাকে ফেরত দিয়ে বলল, "আমি এঘরের বাথরুমে ঢুকছি। তুই মায়ের বাথরুমে যা। ফিলিং ডগ টায়ার্ড।"
মধুরাও ভীষণ ক্লান্ত। কিন্তু সে বাথরুমে না ঢুকে মেরির পাশে বসল। টেবিল ভর্তি নানা বাসনপত্র, মশলা, সবজি, চপিং বোর্ড, মাংস, মাছ। পেঁয়াজ কাটতে ব্যস্ত মেরিকে প্রশ্ন করল, "এত রাতে কার জন্য রান্না করছ মেরি মাসি?"
"প্রতি বছর ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে-তে আমি ডিপ ফোকাসের ছেলেমেয়েদের নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াই। আই প্রাউডলি ডিক্লেয়ার যে, ইন্ডিয়ার মধ্যে আমরাই একমাত্র এথনিক গ্রুপ, যাদের নামের মধ্যে 'ইন্ডিয়ান' শব্দটা রয়েছে। কি, তাই তো?" মধুরা ঘাড় নাড়লেও তার চোখ টেবিলে। অনুষঙ্গ দেখে আন্দাজ করার চেষ্টা করছে কী রান্না হবে। অনেক রকম কম্বিনেশন মাথায় এলেও পিন পয়েন্ট করতে পারল না। বলল, "কালকের মেনু কী?"
"টিপিক্যাল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেনু। রাইস, কলিফ্লাওয়ার ভাজি, গ্রিল্ড ফিশ, চিকেন কোকোনাট কারি, ল্যাম উইথ গ্রিন পেপার অ্যান্ড রেড চিলি। শেষ পাতে ব্রেড-বাটার পুডিং। সকালে ২৫ জনের রান্না করতে হবে। আজ তাই সব কেটেকুটে রাখছি। পুডিংটা বসিয়ে রাখব। ওটা ফ্রিজে ঢোকাতে হবে।
হাই তুলে অ্যানি বলে, "তুমি আজ কোথাও বেরিয়েছিলে? হেয়ার ড্র টা অন্যরকম লাগছে!"
"হ্যাঁ," কাটা আনাজপত্র এয়ারটাইট কন্টেনারে রাখতে-রাখতে মেরি বলল, "ক্লেনিথ হোটেলে গিয়েছিলাম। 'হাই লাইফ' নামের একটা ব্রিটিশ চ্যানেলের কোনও একটা শো-এর শুটিং হবে ইন্ডিয়া জুড়ে। শো'টার লাইন প্রোডিউসর মুম্বইয়ের প্রোডাকশন হাউস 'নৌটঙ্কি'। এর মালিক কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাহুল গোয়েঙ্কা বেসিকালি কলকাতার ছেলে। আমার সঙ্গে অনেকদিনের চেনাশোনা। ও কলকাতার একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট গ্রুপকে কোল চ্যাপ্টারের শুটিংয়ের জন্য খুঁজছে। ক্লেনিথ হোটেলে কলকাতার সব ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম গিয়েছিল।"
"কোন শো?" ঢকঢক করে আধবোতল জল খেয়ে বলে অ্যানি।
"জানি না। রাহুল খুব হাশ-হাশ। ওর রিকোয়্যারমেন্ট জানিয়ে বলল, 'কে ফুলফিল করতে পারবে?' সকলেই অবভিয়াসলি 'হ্যাঁ' বলল। তখন ও বলল, 'আপনারা নিজেদের প্রেজেন্টেশন এনেছেন?' অনেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে সব সময় তোর তৈরি করা ডিপ ফোকাসের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের সিডি থাকে। সেটা দেখিয়ে দিলাম। রাহুল ইমপ্রেস্‌ড হল। তবে ফাইনাল কথাবার্তা এখনও অনেক দূর।"
অ্যানি বলল, "মধু, আমি শুতে চললাম। তুই ফ্রেশ হবি না?"
"তুই শুতে যা। আমি মেরি মাসির সঙ্গে একটু গপ্পো করি," অ্যানিকে ভাগিয়ে দেয় মধুরা। মেরি এখন আড্ডা মারার মুডে রয়েছে। এই ফাঁকে দুটো রেসিপি যদি শিখে নেওয়া যায়।
অ্যানি শুতে চলে গেল।
মেরি বলল, "আমি একটু ওয়াইন নেব? তুই নিবি?"
মধুরা ঘাড় নাড়ল, "আমার চলে না।"
ফ্রিজ থেকে ওয়াইনের বোতল বের করে, গ্লাসে ঢেলে মেরি বলল, "মধু ইউ আর আ গুড কুক। ইউ উইল বি আ হ্যাপি ওয়াইফ।"
"ওয়াইফ?" মেরির কথা শুনে থমকে যায় মধুরা। রান্না করতে তার ভাল লাগে।

মশলাপাতি ঘাঁটতে ভাল লাগে। নুন আর চিনি, জিরে আর মরিচ, হলুদ আর লঙ্কাবাটা, আদা আর পেঁয়াজ নিয়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে! প্রতিদিনের ভাত রান্নার পিছনে কি অসম্ভব বিজ্ঞান আর শিল্প কাজ করছে, সেটা ভেবে প্রথম অন্নরন্ধনকারী পিতৃপুরুষ অথবা মাতৃনারীর প্রতি শ্রদ্ধায় তার মাথা নত হয়ে যায়। একই আনাজ জলে সেদ্ধ করলে একরকম, অল্প তেলে সাঁতলালে অন্যরকম, বেশি তেলে ডিপ ফ্রাই করলে আর এক রকম, কিছু না দিয়ে বেক বা গ্রিল করলে আরও অন্যরকম। অম্ল, মধুর, তিক্ত, কষায়, লবণাক্ত — এসব স্বাদ নিয়ে রন্ধনশিল্পী কী অপূর্ব সিম্ফনি গড়ে তোলে, তা ভাবতে-ভাবতে মধুরার অফিসের কাজে ভুল হয়ে যায়! স্বাদ ছাড়াও আছে টেক্সচার। বাংলায় চারটে সুন্দর শব্দ আছে। চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়। সামান্য কিছু দানাশস্য, গাছের পাতা, ফল ও শিকড়, প্রাণিজ প্রোটিন ও ফ্যাট। তাই নিয়ে কত না কম্বিনেশন ও পারমুটেশন! সে এসব ভালবাসে বলে সে একজন ভাল স্ত্রী হয়ে উঠবে? এই তার ভবিতব্য?

মেরি মাসি যখন বলছে, তখন তাই! ঘড়ির দিকে তাকায় মধুরা। সাড়ে এগারোটা বাজে। একবার দিয়াকে ফোন করবে নাকি? তখন ফোন ধরেনি। হয়তো ব্যস্ত ছিল। এতক্ষণে ভৌমিক ভবনে পৌঁছে শুয়ে পড়ার কথা। দিয়া কখনও মোবাইল অফ রাখে না।

ফোন করে মধুরা। দিয়ার ফোন বাজছে। একটা রিং, দুটো রিং...

আবার ফোন কেটে দেয় দিয়া।

৪

সকাল সাড়ে সাতটার সময় শুভ্র যখন কলিংবেল বাজাল, তখন মধুরা স্নান সেরে, পোশাক পরে রেডি। অ্যানি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মেরির ঘর থেকেও কোনও সাড়াশব্দ নেই। গতকাল রাতে মধুরা শুতে গিয়েছিল দেড়টার সময়। ওয়াইন পান করতে-করতে মেরি মজার-মজার গপপো বলছিল। পুডিং থেকে প্রাণকাড়া গন্ধ আসছিল। সেটাকে ঘরের তাপমাত্রায় এনে, ফ্রিজে ঢুকিয়ে মধুরা শুতে গিয়েছিল। মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়েছিল সকাল সাড়ে ছ'টার সময়।

স্বাধীনতা দিবসের সকালে শুভ্র ব্যাপক মাঞ্জা দিয়েছে। পায়ে গ্রিন কনভার্স শু, পরনে গেরুয়া টি-শার্ট আর সাদা ফেডেড জিনস। মূর্তিমান জাতীয় পতাকা সকাল বেলায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। দাড়ি কামিয়ে, চুলে জেল লাগিয়ে, চোখে কেতার সানগ্লাস পরে পুরো কার্তিক ঠাকুর! মধুরাকে দরজা খুলতে দেখে বলল, "কাল রাতে বাড়িতে কী বলল?"

"কিছু বলেনি। ভিতরে আয়", খাবার টেবিলে শুভ্রকে বসিয়ে অ্যানিকে ঘুম থেকে তোলে মধুরা, "শুভ্র এসেছে। আমি বেরচ্ছি। তুই দরজা বন্ধ করে দে।"

শুভ্রর একটা ৫০০ সিসির বাইক আছে। কালো আর জলপাই সবুজ রঙের কম্বিনেশন। বাইকটা খুব যত্নে রাখে শুভ্র। যে শুভ্রকে বিয়ে করবে সে বাইকটার সতীন হবে!

বাইকের পিলিয়নে বসে মধুরা বলল, "এক কাপ চা খাওয়া। সকালে উঠে চা না খেলে মনে হয় ঘুমটা ঠিকঠাক ভাঙেনি।"

"তোর পছন্দের চা মানে তো মন্টুর চা।"

বাইকে স্টার্ট দিয়ে গাঁ-গাঁ করে মল্লিকবাজার ক্রসিংয়ের দিকে এগোয় শুভ্র। নিউ পার্ক স্ট্রিট ধরে পৌঁছয় পার্ক সার্কাস সাত মাথার ক্রসিংয়ে। স্বাধীনতা দিবসের সকালে পার্ক সার্কাস কানেক্টর সুনসান। পরমা আইল্যান্ড হয়ে নিউ টাউনে আসতে সময় লাগল মিনিট পনেরো। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার গেটের বাইরে বাইক দাঁড় করিয়ে শুভ্র বলল, "মন্টু, দু' কাপ স্পেশ্যাল চা।"

গতকাল দুপুরে মন্টুর কেটলি টেনে নিয়ে মধুরা চা করতে শুরু করেছিল। মধুরাকে মন্টু বলল, "মায়ের কাছ থেকে এস্পেশাল মশলা নিয়ে এসো। আমি দুধ গরম করছি।"

রাস্তার ওপারে তাকায় মধুরা। গত কাল সুলতানের সঙ্গে ঝগড়া করার পর আজ আবার কাবাবচিনি আর আদা চাইতে যাবে? উল্টোপাল্টা কিছু বলে না দেয়! মধুরা বলে, "তোকে স্পেশ্যাল চা দিতে হবে না। এমনি চা দে।"

"তুমি যাও না," মধুরাকে ঠেলা দেয় মন্টু, "বাবা বকবে না।"

শুভ্র ভাঁড় দু'টো নিয়ে বলে, "সুলতানদা কাল তোকে কিছু আন-সান বলেছিল নাকি? তা হলে বাবাকে বলে আমি ওর চোদ্দোটা বাজিয়ে দেব।"

"ভাট বকিস না।" শুভ্রর হাত থেকে ভাঁড় নিয়ে রাস্তা পেরয় মধুরা, "চল ধাবায় বসে চা খাই।"

"ওখানে বসবি? হঠাৎ?" শুভ্রও রাস্তা পার হচ্ছে।

"ইচ্ছে হল, তাই! আজ অফিসে দৌড়নোর তাড়া নেই। একটু বসে-বসে চা খাব। তুই মন্টুর কাছ থেকে গোটাচারেক লেড়ো বিস্কুট কেন।"

এত সকালে পারুল একটা জামবাটিতে সবজি কেটে রাখছিল। মধুরা আর শুভ্রকে বসতে দেখে আড়চোখে তাকাল। মধুরাকে চিনতে পেরে বলল, "আজ এত সকাল-সকাল?"

"আজ অফিস ছুটি। সকালবেলা মন্টুর চা খেতে ইচ্ছে হল, তাই এলাম," সিগারেট ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলল শুভ্র। চায়ে চুমুক দিয়ে মধুরা বলল, "দাদাকে দেখছি না!"

"দই আর বেসন কিনতে করুণাময়ী গিয়েছে।"

বলতে না-বলতেই একটা ভাঙাচোরা স্কুটার চালিয়ে সুলতান হাজির। মধুরাকে দেখে স্থির চোখে তাকাল। পারুলের হাতে বেসনের ঠোঙা আর দইয়ের হাঁড়ি ধরিয়ে বলল, "সকালবেলা কী মনে করে?"

"এমনিই এসেছি!" হেসে বলে মধুরা, "মনে করাকরির কিছু নেই।"

"তোমরা ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় চাকরি করো?" বেঞ্চিতে বসে বলল সুলতান।

"হ্যাঁ," অবাক হয়ে বলে মধুরা, "আপনি কী করে আন্দাজ করলেন?"

"কৃশ বলেছে," গামছা দিয়ে কপাল মুছে আকাশের দিকে তাকিয়ে সুলতান বলে, "কাল পর্যন্ত জঘন্য ওয়েদার ছিল। আজ তা-ও আকাশ পরিষ্কার।"

"কৃশ আবার কে? হৃতিক রোশন ছাড়া আর কোনও কৃশকে আমি চিনি না!" মজা করে মধুরা।

"কৃশ মানে কৃশানু, তোর দাদা," মধুরাকে বলে শুভ্র। মধুরার হাত থেকে খালি ভাঁড় নিয়ে ট্র্যাশ বিনে ফেলে দেয়।

"তুমি কৃশানুর বোন?" গামছা পাশে রেখে সুলতান হাঁক পাড়ে, "হ্যাঁ গো, এদের আর এক কাপ করে চা খাওয়াও।"

"আপনি আমার দাদাকে কীভাবে চিনলেন?" গল্পের গন্ধ পেয়ে সুলতানকে চেপে ধরে মধুরা।

"তোমার দাদার মতো ভাল লোক এই দুনিয়ায় খুব কম আছে!" অন্যমনস্কভাবে বলে সুলতান, "ওর কাছে আমি সারা জীবন ঋণী থাকব।"

পারুল কাঠের ট্রেতে তিন কাপ চা নিয়ে এসেছে। মধুরা আর শুভ্রকে কাপ ধরিয়ে সুলতানকে বলল, "পুরনো গপ্‌পো ফাঁদতে বোসো না। সন্ধেবেলা ৩০ জনের রান্না আছে। সারাদিন মেলা কাজ।"

"তুই ভাগ!" ট্রে থেকে কাপ নিয়ে পারুলকে ধমক দেয় সুলতান। মধুরাকে বলে, "তুমি কি জান যে, ফুটপাথের আলফাল দোকানের মালিক সুলতান সিংহ এক সময় নাম করা শেফ ছিল? আমার বাবা পঞ্জাবের লোক। মা বাঙালি। ট্রান্সপোর্টের কাজে বাবা সারা দেশ ঘুরে বেড়ালেও প্রেমে পড়ল বাংলার মেয়ের।

পিলখানার নাম শুনেছ?"
ঘাড় নাড়ে মধুরা। ডোমিনিক লাপিয়েরের লেখা 'সিটি অব জয়' উপন্যাসটির পটভূমিকা কলকাতা শহর হলেও লেখকের অনুপ্রেরণা ছিল পিলখানা অঞ্চল।
সালকিয়া আর হাওড়া ময়দানের মাঝখানে, জি টি রোডের দু'পাশ বরাবর ভীষণ ঘিঞ্জি আর নোংরা একটা এলাকা।
"সে একটা অদ্ভুত জায়গা, বুঝলে? একসময় বাঙালিরা বসবাস করত। জলা জায়গায় নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত বাঙালির বাড়ি। নকশাল আমলে নকশালরা এই সব জায়গায় শেল্টার নিত। ফলে শুরু হল পুলিশি অত্যাচার। বাড়ি-বাড়ি ঢুকে কমবয়সি ছেলেদের টেনে জেলে ঢোকানো, মেয়ে-বউদের সঙ্গে অসভ্যতা করা, আসবাবপত্র ভাঙা, কী নয়! বাঙালিরা সম্পত্তির মায়া না করে সেখান থেকে পালাল। ফাঁকা জলা জায়গার দখল নিল লেবার ক্লাস। বিহার আর ইউ পি থেকে আসা ঠেলাওয়ালা, রিকশাওয়ালা, মুটে, মজুর, কুলি। হাওড়াকে 'কুলি টাউন' বলা হয় এটা নিশ্চয় জান?"
আবার নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ে মধুরা।
সুলতানের বর্ণনা শুনতে-শুনতে মধুরা সেই সময় আর সেই জায়গাটাকে দেখতে পাচ্ছে...সাতের দশকের শেষ থেকে এই অবাঙালি সম্প্রদায় ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। একের পর এক লাইসেন্সবিহীন বহুতল গজিয়ে উঠল জি টি রোডের দু'দিকে। ১০-১৫ তলা সরু-সরু অ্যাপার্টমেন্ট। তাতে লিফ্ট নেই, বাইরে সিমেন্টের পলেস্তারা নেই, রং নেই। বিহার-ইউ পির গুন্ডাগর্দি আর বাঙালি কেরানির ঘুষের টাকায় তৈরি এসব বহুতল কিনতে লাগল পঞ্জাব, গুজরাত, রাজস্থানের লোকেরা। এখানে শনি মন্দির আছে, মাজার আছে, শীতলা মন্দির আছে, চার্চ আছে, গুরুদ্বার আছে, এমনকী, মনাস্টিও আছে। সকালবেলা জি টি রোড ব্লক করে হাঁড়ি-হাঁড়ি বিরিয়ানি তৈরি হচ্ছে। লরি দাঁড়িয়ে গিয়েছে সার-সার। পঞ্জাবি ড্রাইভাররা ইঞ্জিন বন্ধ করে, লরি থেকে নেমে ঠান্ডা লস্যি খাচ্ছে। সঙ্গে সরসোঁ দা সাগ আর মক্কি দি রোটি। তাদের দিকে আড়ে-আড়ে তাকাচ্ছে পাহাড়ি মেয়ের দল। সকাল-সকাল তারা লিপস্টিক লাগিয়ে, লাল স্কার্ট পরে ধান্দার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাদের ঘর থেকে ভেসে আসছে মোমো আর থুকপার গন্ধ। পাশেই পাঁঠার দোকানের সামনে লম্বা লাইন। রেওয়াজি খাসি ভাল না কচি পাঁঠা, এই নিয়ে দুই বাঙালি মাস্টারের মধ্যে হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম! কসাই লিখে রেখেছে "পাঁঠি প্রমাণে দশ হাজার টাকা পুরস্কার।" পাঁঠিকে কী কায়দায় কসাইরা পাঁঠা বানায়, এই বিষয়ে সূক্ষ্ম মতভেদ দেখা যাচ্ছে। শুনতে-শুনতে পাশ থেকে মাঝবয়সি মেছুনি হাঁক পাড়ল, "আমার কাছে আঁশবটি আছে। বাজে কথা বললে, পাঁঠাকে পাঁঠি বানাতে আমার দু'মিনিটও লাগবে না।" মেছুনির সামনের ড্রামে খলবল করছে জিয়ল মাছ। পাশে বরফের উপরে ফেলা রয়েছে রুই, কাতলা, ট্যাংরা, মিরগেল, জাপানি পুঁটি।
সুলতানের বাবা ছিল খাউস্তে পাবলিক। যখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেত, বাড়ি শান্ত থাকত। ১০-১৫ দিন, কী একমাস বাদে বাড়ি ফিরে, একগাদা স্যাঙাত জুটিয়ে তুমুল হইহল্লা জুড়ে দিত। সুলতানের মাকে বলত, "আজ বংগালি খানা বনাও।" সুলতানের মা অমনই ভাত, সোনা মুগের ডাল, আলুপোস্ত, রুই মাছের কালিয়া, খেজুর-আমসত্ত্ব-জলপাই-এর চাটনি বানিয়ে ফেলত চট করে। হেল্পিং হ্যান্ড সুলতান। আর একদিন সুলতানের বাবা এসে বলল, "ওয়ে! পঞ্জাবি খানা বনা! ফটাফট।" সুলতানের মা তুরন্ত বানিয়ে ফেলত আলু পরাঠা, মালাই কোফ্তা, পনির বাটার মসালা এবং লস্যি। হেল্পিং হ্যান্ড, সুলতান। ছট পুজোর সময় পাশের বস্তি থেকে চৌধুরী চাচি বলত, "সুলতান, থোড়া হাত লগানা মেরে বাপ।" সুলতান লাফাতে-লাফাতে চলে যেত। লিট্টি, সুখা রোটি, আলু চোখা, ছাতুর শরবত বানানোয় সাহায্য করত। মিউনিসিপ্যালিটির ইস্কুলে পড়তে যাচ্ছে, রাজু চাচা বলল, "ওরে কচি, বিরিয়ানির ভাতটা শুকায়ে দিয়ে যা।" সুলতান দাঁড়িয়ে যেত। ইস্কুল যাওয়া হত না। এই করে কোনও রকমে ক্লাস টেনের গণ্ডিটা টপকেছিল। তবে সুলতানের আসল পড়াশোনা লোকের বাড়ির হেঁসেলে! কোনও দিন চলে গেল মারোয়াড়ির বাড়ির পার্টিতে। রান্নার ঠাকুরকে মারোয়াড়িরা 'মহারাজ' বলে। মহারাজের মেনু হল, দাল-বাটি-চুরমা, রোটি, সাংরি কী সবজি, গট্টে কী সবজি, গুলাব জামুন, মালপুয়া। সুলতান কখনও সাংরি কাটছে, কখনও বেসন দিয়ে গট্টে বানাচ্ছে, কখনও ফুটন্ত জলে চিনি ঢেলে সিরা বানাচ্ছে। এসব করতে-করতে পিলখানায় সুলতানের নাম ছড়াতে লাগল। লোকে বলতে লাগল, 'সুলতান মহারাজ।' বাবা বাড়ি থাকত না। মা আনপড়। ছেলে সারাদিন কোথায় যায়, কী করে, খবরই রাখত না। সুলতান স্কুলে না গিয়ে ভোরবেলা হকারি করত। তারপর বিরিয়ানির দোকান, পাঁঠার দোকান, মাছের বাজার, মন্দির, পাহাড়ি মেয়েদের ডেরা ঘুরে বেড়াত রান্না শেখার লোভে।
লোকের বাড়িতে কাজ করে সামান্য কিছু টাকা জমেছিল। সেই টাকায় পিলখানায় নিজের বাড়িতে ক্যাটারিংয়ের ব্যবসা ফাঁদল সুলতান। নাম দিল, "সুলতান মহারাজ!" পুরোটাই ধারে কারবার। বাসনকোসন, উনুন, কাপ-প্লেট, ডেকরেটরদের কাছ থেকে নিত। পাশেই ঘাসবাগানে উৎকল ঠাকুরদের বাস। তাদের ডেকে নিত। মেনু ঠিক করা, দাম ঠিক করা, অনুষ্ঠানের দিন বাজারহাট করা এগুলো নিজের হাতে করত। প্রথম কাজ পেল পাশের বাড়িতে। চৌধুরী চাচির ছেলের জন্মদিনে। সুলতানের তৈরি লিট্টি, ঠেকুয়া, লসুন কী চাটনি, ধনিয়া কা আচার খেয়ে দেশোওয়ালি ভাইয়েরা এত খুশি হল যে, যাওয়ার আগে সকলে মাথায় হাত বুলিয়ে, গাল টিপে, আশীর্বাদ করে গেল! সুলতানের বয়স তখন আঠেরো। সবাইকে পয়সাকড়ি মিটিয়ে হাতে এসেছিল ১০ টাকা। জীবনের প্রথম রোজগার!
১০ টাকার ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে পরের অনুষ্ঠান। আবার জন্মদিনের পার্টি। চৌধুরীর আত্মীয়র বাড়িতে। ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস হিসেবে সব বাচ্চাকে বার্থডে গিফ্ট হিসেবে একটা পেনসিল আর একটা ইরেজার দিল। তারা নাচতে-নাচতে বাড়ি গেল। এর পর ওখানকার সব বিহারি ক্লায়েন্ট সুলতানের হাতের মুঠোয় চলে আসে। শাদি, হোলি, দিওয়ালি, ছটপুজো, শ্রাদ্ধ, সবেতে সুলতান মহারাজ! বাজার তৈরি হল। তবে সেটা আপমার্কেট না। কম পয়সার কাজ, কম মার্জিন। ভলিউমের জন্য পুষিয়ে যেত। পরিশ্রম হত প্রচুর।
সিচুয়েশন বদলাল একটা কার্তিক পুজোর অনুষ্ঠানে। পিলখানার রেডলাইট এরিয়ার মেয়েরা পুজোটা করে। সুলতান ভোগ রান্না করেছিল, সেই ভোগ খেয়ে কলকাতার একজন জানতে চাইলেন, এত ভাল গুলাবজামুন কে বানিয়েছে? ওখানকার মেয়েরা একটা ১৯ বছরের ছেলেকে টানতে-টানতে একটা ৬০ বছরের বুড়োর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। ভদ্রলোক সুলতানকে বললেন, "একটা ফোন নম্বর জোগাড় কর। দরকার হলে আমার মেয়েছেলেটার ফোন ইউজ় কর। আর একটা ভিজিটিং কার্ড ছাপা। মারোয়াড়ি রান্না পারিস?" সুলতান টক করে ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।" ভদ্রলোক বললেন, "আগলা রবিবার মেরে ঘর মেঁ আকে খানা বনাকে জানা। অওর ইয়ে মত বোলনা, কহাঁসে তেরেকো উঠায়া ম্যায়ঁনে। সমঝা?"
"না বোঝার কিছু নেই। সব জলের মতো পরিষ্কার!" মধুরাকে নিজের কথা বলছে

সুলতান। মধুরা হাঁ করে শুনছে।
"তিন-চারদিনের মধ্যে কার্ড ছাপিয়ে ফেললাম। বাড়িতে একটা ফোন নিলাম। ভদ্রলোকের নিউ আলিপুরের বাড়িতে গিয়ে রান্না করে খাইয়ে সকলকে এত খুশি করে দিলাম যে, আমার ব্যবসার স্টেটাস বেড়ে গেল! ভদ্রলোক হোটেল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। উনি আমাকে কলকাতায় অফিস ঘর ভাড়া দিলেন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দিলেন, খাতা মেনটেন করা শেখালেন, অফিস চালানো শেখালেন। ওঁর জন্যই 'সুলতান মহারাজ' একদিন কলকাতার এক নম্বর কেটারিং এজেন্সি হয়েছিল।"
"হয়েছিল? পাস্ট টেন্স কেন?" শুভ্র আলতো করে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে।
"হাই প্রোফাইল বিয়ের খাবার রেঁধে-রেঁধে নিজেকে হিরো মনে করতে শুরু করলাম। কাগজে ছবি বেরচ্ছে, টিভিতে ইন্টারভিউ দিচ্ছি। এই সময় ডাক এল কর্পোরেট সেক্টর থেকে। সেক্টর ফাইভে গজিয়ে ওঠা অফিসে ক্যান্টিন চালানোর ডাক। কম কাজ, বেশি রোজগার। লোভ সামলাতে না পেরে ঢুকলাম। এবং নানা ঘাটের জল খেতে-খেতে আলাপ হল ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সন্দীপ পারেখের সঙ্গে।"
"স্যান্ডি?"
"হ্যাঁ, তোমাদের স্যান্ডি। ও তখন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মেনটেন্যান্স ডিভিশনের হেড ছিল। মেনটেন্যান্স ডিভিশন সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে?"
মধুরার খুব ভাল ধারণা আছে। অফিস স্টেশনারি ফুরোলে, কম্পিউটার খারাপ হলে, এসি মেশিন গন্ডগোল করলে, বাথরুমে টিসু পেপার না থাকলে, চা-কফি ভেন্ডিং মেশিন বেগড়বাঁই করলে, ক্যান্টিনের দুধের কোয়ালিটি পছন্দ না হলে, সবাই যেখানে ফোন বা মেল করে, সেটা মেনটেন্যান্স ডিভিশন। বাড়িতে সবিতাদি, অফিসে মেনটেন্যান্স ডিভিশন!
"সব্বাই সরকারি অফিসে দুর্নীতি আর পলিটিক্সের কথা বলে। কর্পোরেট সেক্টরে দুর্নীতি আর পলিটিক্স সরকারি অফিসের চেয়ে হাজার গুণ মারাত্মক! কারণ, এর ফলে একজনের কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যায়। সেই নোংরামোর মূর্তিমান প্রতীক তোমাদের স্যান্ডি! কোনও টেন্ডার ছাড়া আমাকে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ক্যান্টিনে কাজ পাইয়ে দিয়েছিল। দেখিয়েছিল, ১০জন বিডার আছে, তার মধ্যে আমি সবচেয়ে স্টিং। আর লোয়েস্ট বিডারের চেয়ে এক ধাপ উঁচুতে। অ্যাডমিন থেকে কাগজপত্র ক্লিয়ার করিয়ে আনল। আমি সব ফ্লোরে ক্যান্টিন খুলে বসলাম," ঘৃণাভরে ডিজিটাল ইন্ডিয়া বিল্ডিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে সুলতান।
"তারপর?" শুভ্র ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করে।
"তখন ও লেক গার্ডেন্সে থাকত। লেক গার্ডেন্সের বাড়ির রান্নাবান্না এবং ধোওয়া-মোছার জন্য দুটো কাজের লোক দিতে হল। তাদের মাইনের দায়িত্ব আমার। প্রাত্যহিক বাজার খরচ, মাসকাবারির খরচ আমার। বাড়ির যাবতীয় কাপড়জামা, শাড়ি, সালোয়ার-সুট, কুর্তা-পায়জামার খরচ আমার!"
মধুরা চুপ করে থাকে।
"অত্যাচার সহ্য করেও কাজ চালাচ্ছিলাম। কারণ, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কানেকশনের সূত্রে আমার কেটারিং ব্যবসায় একটা ঝাঁ-চকচকে চেহারা আসছিল। সুলতান মহারাজ, সুলতান ঠাকুর, সুলতান হালুইকর...এসবই ঠিক আছে। কিন্তু নতুন সময়ের নতুন শব্দ, 'শেফ সুলতান' আমাকে টানছিল! ভারতের অন্য প্রদেশের মন্ত্রী, আমলা, শিল্পপতির ছেলেমেয়ের বিয়েতে রান্নার বরাত পাচ্ছিলাম। এমন সময় তোমাদের স্যান্ডি আমাকে ঝাড়টা দিল!"
"ঝাড় মানে?"
"ওর বউ বিলেত থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাশ করে ফেরার পর আমাকে ডেকে বলল, ক্যান্টিনের কনট্রাক্ট রিনিউ করবে না। ওটা ওর বউকে দেবে। এই নিয়ে আমার সঙ্গে বিরাট ঝামেলা হয়। আমি ওকে মারতেও গিয়েছিলাম। পরদিন বাড়িতে পুলিশ! আমার কোনও কথা না শুনে আমাকে ছ'মাস পুলিশ কাস্টডিতে রাখল। তোমাদের স্যান্ডিকে মৃত্যুভয় দেখানো, টেন্ডার নিয়ে কাগজপত্রে দু'নম্বরি করা, অন্য বিডারদের চমকানো — একগাদা অফেন্স। বেল পাওয়া গেল না। ছ'মাস বাদে জেল থেকে যখন ছাড়া পেলাম, তখন 'শেফ সুলতান'কে সবাই ভুলে গেছে। সালকিয়ায় একটা দোতলা বাড়ি করেছিলাম। সেই বাড়ি বিক্রি করে এই মেয়েটা উকিলের খরচ জুটিয়েছে..."
পারুলের দিকে আঙুল দেখায় সুলতান, "তারপর আর কী? আবার পিলখানার বস্তিতে ফেরত। আবার নতুন করে শুরু। ফুটপাথে যখন দোকান দিতেই হবে, তখন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সামনেই দেব। রোজ ওই বাড়িটা দেখি, আর কাজের ইচ্ছে দ্বিগুণ হয়। নিজে পড়াশোনা করতে পারিনি। ছেলেটাকেও পড়াতে পারছি না। ইচ্ছে ছিল, ছেলেটাকে ইন্ডিয়ার এক নম্বর শেফ বানাব। সারা জীবন ধরে যা কিছু শিখেছি, ওকে শিখিয়ে যাব। কিন্তু ওকে দিয়ে হবে না। ওর মধ্যে সেই ব্যাপারটা নেই। করুক শালা, দোকানদারি করে খাক। গায়ে ধুলো না লাগলে মানুষ হওয়া যায় না!" মাথা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে ফুটপাথের দিকে তাকায় সুলতান।
পারুল নরম গলায় বলে, "এখনও অনেক কাজ বাকি! রান্না চাপাবে কখন?"
"হিরো কাকে বলে জানিস?" আগুনঝরা চোখে মধুরাকে বলে সুলতান, "সারাক্ষণ মার খেতে-খেতে, ক্রমাগত লাথ খেতে-খেতে, সমানে বদনাম হতে-হতে একজন হেরোও শেষবারের মতো ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। ওই চেষ্টার জন্যই লোকটা হেরো থেকে হিরো হয়ে যায়! আমি সেই চেষ্টা চালাচ্ছি। পারব না, বল?"
"আ...আমি কী বলব বলুন! আপনার লড়াই আপনাকেই লড়তে হবে। আমরা বড়জোর ইন্সপায়ার করতে পারি..." তো-তো করে মধুরা।
"ওর ওপরে যে টর্চার হয়েছে, সেটা সকলকে বলে উনি হালকা হন। এক ধরনের ক্যাথারসিস হয়", মধুরাকে বুঝিয়ে বলে শুভ্র।
"না হে ছোকরা!" গর্জে ওঠে সুলতান, "সুলতান সিংহ কাঁদুনি গাওয়ার লোক নয়! আমার এই অবস্থার কথা আমার ফ্যামিলির বাইরে যদি কেউ জেনে থাকে, তা হলে কৃশ জানে। আজ এই মেয়েটাকে কেন বললাম জান?"
"আমাকেও তো বললেন!" শ্রাগ করে শুভ্র।
"তুমি সঙ্গে ছিলে, তাই। উঠে যেতে তো আর বলতে পারি না," পাল্টা শ্রাগ করে সুলতান, "তোমার আর এই মেয়েটার মধ্যে একটা ব্যাপারে আকাশপাতাল তফাত। কী ব্যাপারে জান?"
"কী?" আঁতকে উঠে প্রশ্ন করে মধুরা।
তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে সুলতান বলে, "আজ ধাবাতে কী মেনু?"
"ওঃ! এ তো সোজা ব্যাপার। আমরা যখন এলাম, তখন বউদি সাংরি কাটছিল। পরে আপনি করুণাময়ী থেকে বেসন আর দই নিয়ে এলেন। আজ এখানে রাজস্থানি থালি হচ্ছে। বাজরা যখন দেখতে পাচ্ছি, তখন মেনু হল বাজরা কি রোটি, কড়ি, সাংরে কি সবজি।"
শুভ্র আর পারুল অবাক হয়ে মধুরার দিকে তাকিয়ে থাকে!
সুলতান জ্বলজ্বলে চোখে বলে, "অনেক বেলা হল। এবার বাড়ি যা। আর যাওয়ার আগে তোর নামটা বলে যা।"
শুভ্র বাইকে স্টার্ট দিয়েছে। পিলিয়নে উঠে সুলতানের দিকে তাকিয়ে মধুরা বলে, "মধুরা। সবাই আমাকে মধু বলে ডাকে।"
বেসন গুলতে-গুলতে সুলতান বলল,

"পটের বিবি! আমাকে 'আপনি' বলিস না। আর আগামীকাল একবার আসিস।"

৫

"কাল রাতে তোমাকে দু'বার ফোন করেছিলাম। ধরোনি কেন?"
"আর বলিস না! আমি তখন তোর দাদার সঙ্গে ঝগড়া করছিলাম।"
"অতক্ষণ ধরে ঝগড়া? আমি কিন্তু বেশ গ্যাপ দিয়ে ফোন করেছিলাম।"
"প্রথম ফোনটা যখন করেছিলি, তখন অফিসের কাজের মধ্যে ছিলাম। জেনিথ হোটেলে একটা প্রেস-কন চলছিল। তার মধ্যে ফোন ধরা আনএথিক্যাল। পরের ফোনটা যখন করেছিলি, তখন কৃশানু আমাকে ঝাড় দিচ্ছিল।"
"ঝাড় দিচ্ছিল? কোন ইসুতে?"
"ফ্যাশন ম্যাগাজিনের ওয়র্ক স্কেডিউল কখনওই রাত এগারোটা পর্যন্ত চলতে পারে না! এত রাত অবধি আমি কোথায় ছিলাম..."
"তুমি বললে না কেন, তিনটে ছেলে নিয়ে রিসর্টে ফুর্তি করতে গিয়েছিলে!"
"সেটা বলেছিলাম বলেই ঝগড়া! ঝগড়ার মধ্যে তোর ফোন আসায় কেটে দিয়েছিলাম। শান্তি হল? ফোন না ধরার রাগ পড়ল?" মধুরার মাথায় চাঁটি কষিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় দিয়া।
মধুরা সালোয়ার-কামিজ নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যায়। বাসি জিন্স ছেড়ে ফেলতে হবে।
কলেজ মোড় থেকে বাইকে রাজচন্দ্রপুরে আসতে সময় লাগল ২০ মিনিট। কংক্রিটের চাদর উঠে গিয়ে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে টিন এজারদের গালের মতো এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে। জোরে গাড়ি চালানো বিপদ। তাই মিনিটপাঁচেক বেশি লাগল। তা না হলে, জাতীয় ছুটির দিনে রাস্তা একদম সুনসান।
শুভ্র ভৌমিক ভবনের বাইরে থেকেই চলে যেতে চেয়েছিল। মধুরাই টানতে-টানতে ঢুকিয়ে বলেছে, "সকাল সাড়ে দশটা বাজে। এখন বাড়িতে জলখাবার হচ্ছে। এই সময় অতিথিকে ভাগিয়ে দিলে ভারতমাতা অভিশাপ দেবে।"
বসার ঘরে কৃশানু বাংলা কাগজ খুলে অরণ্যদেব পড়ছিল। শুভ্রকে দেখে বলল, "আরেব্বাস! পুরো ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ!" চেয়ার টেনে বসে শুভ্র বলে, "তুমি কখন এলে?"
"আমি আর দিয়া গতকাল রাতে এসেছি। মধু কাল রাতে অ্যানির বাড়িতে ছিল। ভাবছিলাম কতক্ষণে আসবে। তুই নিয়ে আসবি এটা এক্সপেক্ট করিনি।"
"শুভ্র, ব্রেকফাস্ট রেডি!" পিতলের থালায় লুচি আর বাটিতে ছোলার ডাল দিয়ে বলল মধুরা।
"গতকাল রাতে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার পরে মধুরাকে অ্যানির বাড়ি ছেড়ে এসেছিলাম। তাই একটা রেসপনসিবিলিটি ছিল..." থালা টেনে নিয়ে খেতে শুরু করেছে শুভ্র।
খেতে খেতে সে যুথিকার সঙ্গে গপ্পো জুড়েছে। হাঁটুর ব্যথার কথা শুনে নিজের ঠাকুরমার কোমরে ব্যথা থেকে চমকপ্রদ আরোগ্যলাভের কাহিনি শোনাল। লছমনঝুলার এক সাধু তার ঠাকুরমাকে স্বপ্নাদ্য শিকড় দিয়েছিল। সেই শিকড় মাদুলি করে কোমরে বাঁধতে ব্যথা এক্কেবারে গায়েব! তবে সাধুকে সব সময় পাওয়া যায় না। গঙ্গাসাগরের মেলার পাঁচদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে আবির্ভূত হয়ে তিনি শুভদের বাড়িতে একদিনের জন্য পদধূলি দেন। জানুয়ারি মাসের ওই একদিনের জন্য নাকি প্রচুর লোক তক্কে-তক্কে থাকে! তবে মাসিমার চিন্তা নেই। (হ্যাঁ, যুথিকা এর মধ্যে শুভ্রর মাসিমা হয়ে গিয়েছে!) শুভ্র সব ব্যবস্থা করে দেবে। দিয়ার সঙ্গে কলকাতার পেজ-থ্রি কালচার নিয়ে আলোচনা করে, মনোহরের সঙ্গে ছাদে গিয়ে বিড়ি ফুঁকে, ভৌমিক ভবন থেকে শুভ্র বেরল বেলা বারোটা নাগাদ। যাওয়ার আগে ভৌমিক মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে দু'শো টাকার কমলাকান্ত আর আশাপূর্ণা নিল। বিমলের মতো হালুইকরের তিনবার নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত, রবীন্দ্রনাথ বা উত্তমকুমার যে বিমলকাকার কাছে নস্যি, একথা সবিতাকে জানাতে ভুলল না। ডিক-ডিক করে বাইক চালিয়ে শুভ্র চলে যাওয়ার পরে সবিতা বলল, "ছোকরা দেখি শারুখ খানের কায়দায় খেলছে!" তারপর কৃশানু, দিয়া আর মধুরাকে খেতে দিল।
"মানে?" লুচি খেতে-খেতে নিষ্পাপ চোখে সবিতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে দিয়া। মধুরার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসে। হঠাৎ মধুরা খেয়াল করে, তার কান গরম হয়ে যাচ্ছে। গাল আর চোয়ালের কাছে গরম লাগছে। কেন রে বাবা!
"দিলোয়ালে দুলানিয়াতে ছিল, রাজ সিমরনের বাড়ির লোকজনকে আগে বশ করল! ওই কায়দা এখন সব ছেলে করে। শ্বশুর-শাশুড়িকে আগে হাতের মুঠোর মধ্যে নেয়। তা না হলে কত্তাবাবুর সঙ্গে বিড়ি ফোঁকা, তোমার শাউড়িকে বাতের শেকড় দেওয়া... আমি কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি?"
মধুরা কী বলবে অথবা আদৌ কিছু বলবে কি না, বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। গতকাল শুভ্রর ব্যাপারে অ্যানি কথা বলেছিল। মধুরা পাত্তা দেয়নি। শুভ্র সব্বার সঙ্গে এভাবে ফ্লার্ট করে। কাল ডিনারের সময় তার পাশে বসা, রাতে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার পরে ভোরবেলা বাইকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া, এই ঘটনাগুলো জুড়ে আলাদা কিছু মনে হয়নি। এখন সবিতার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ভৌমিক ভবনে এসে শুভ্র জোর করেই সবার সঙ্গে ফ্রেন্ডলি হওয়ার চেষ্টা করছিল।
"হ্যাঁ রে মধু, শুভ্র কি কোনও অ্যাজেন্ডা নিয়ে এসেছিল?" জানতে চাইল কৃশানু। বাংলা কাগজ শেষ করে এবার সে ইংরেজি কাগজে হাত দিয়েছে।
"হতে পারে!" লুচির জাবর কাটতে-কাটতে বলে মধুরা।
"তুই এই বিষয়ে কিছুই জানিস না?" সরু চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইছে যুথিকা।
"কোন বিষয়ে? সাধুবাবার শিকড়ের বিষয়ে?" মিষ্টি হাসে মধুরা, "আমার দৃঢ় ধারণা, ওটা শুভ্র বানিয়ে বলেছে।"
"শিকড়ের কথা আমি বলছি না," ঝাঙ্কার দিয়ে ওঠে যুথিকা, "তুই খুব ভাল করেই জানিস, আমি কীসের কথা বলছি! তোর সঙ্গে কি শুভ্রর ভাব আছে?"

তুই খুব ভাল করেই জানিস, আমি কীসের কথা বলছি! তোর সঙ্গে কি শুভ্রর ভাব আছে?

"ভাব?" হাসিতে ফেটে পড়ে মধুরা বলে, "সে তো অনেক দিন ধরে আছে। এক অফিসে চাকরি করি, ও আমার টিম লিডার, ভাব না থাকলে কাজ করা যায়? তুমি বোধ হয় 'ভাব' বলতে 'অ্যাফেয়ার' মিন করছ! শুভ্রর প্রতি আমার কোনও রকম ভাব বা ভালবাসা নেই। শুভ্রর আমার প্রতি থাকতে পারে। সেটা ওর হেডেক, আমার নয়।"

মধুরা খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়ে। সামনে আস্ত একটা ছুটির দিন। কী করা যায় ভাবতে-ভাবতে মধুরা তিনতলায় নিজের আলমারি নিয়ে পড়ে। বর্ষাকালে পরার উপযোগী পোশাক আর অ্যাকসেসরি সামনে রেখে বাকি সব ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। ছাদে একপ্রস্থ ঝাড়ু মারে। সবিতা রোজ ছাদ ঝাঁট দেয়, তা-ও। আসলে অনেকটা ফাঁকা সময় পেলে কী করবে, বুঝতে পারে না মধুরা। নিজেকে নিয়ে টেনশন হয়। বই পড়তে ভালবাসে না, গান শোনার অভ্যেস নেই, টিভি ব্যাপারটা মহা বোরিং, কম্পিউটারে সিনেমা দেখা একটা অপশন। এখন সেটাও ভাল লাগছে না। আবার তাকে মন খারাপের রোগে ধরল নাকি? কী টেনশন রে বাবা! একা-একা থাকার বদলে কারও সঙ্গে বকবক করা ভাল। মধুরা দোতলায় নামে। দিয়ার সঙ্গে আড্ডা মারা যাক। কৃশানু ঘুমোচ্ছে আর দিয়া ল্যাপটপে ডেটাকার্ড গুঁজে ইলেকট্রিসিটির বিল ভরছে। পাশে বসে রয়েছে মনোহর। তার হাতে একগাদা ফাইল। মেয়েকে দেখে মনোহর বলল, "এগুলো তুই শিখে নিতে পারিস তো! তা হলে আমাকে আর বউমার জন্য বসে থাকতে হয় না। ইলেকট্রিক অফিসে না গিয়ে-গিয়ে যাওয়ার অভ্যেস নষ্ট হয়ে গেছে। এখন লাইনে দাঁড়াতে বিরক্ত লাগে।"

"ওটা আবার শেখার কী আছে?" হাসতে-হাসতে বলে মধুরা, "আমাকে বললেই করে দিই।"

"তুই জানিস তা হলে?" বিজ্ঞের ভাব করে মনোহর।

বাবার কথায় পাত্তা না দিয়ে মধুরা দিয়াকে বলে, "গতকাল হোটেল ক্লেনিথে কীসের প্রেস-কন ছিল? মেরি মাসিও গতকাল জেনিথে গিয়েছিল। একটা প্রোডাকশন হাউজ় ইভেন্ট ম্যানেজারদের ডেকেছিল।" ইলেকট্রিসিটির বিল ভরার কাজ শেষ করে লগ আউট করে দিয়া। মনোহরের হাতে ফাইল তুলে দিয়ে বলে, "যত্ন করে রেখে দিন। টেলিফোন বিল ভরার সময় আবার নেব," তারপর মধুরার দিকে ফিরে বলে, "'নৌটঙ্কি'-র প্রেস কন। আমাদের ম্যাগাজ়িনের ক্ষেত্রে এগুলো জুনিয়র সাব-এডরা দেখে। দু'টো ছেলে ছুটি নেওয়ায় আমাকে যেতে হয়েছিল। হাই লাইফ চ্যানেল একটা রিয়্যালিটি শো নামাচ্ছে। ওদের হয়ে রাহুল গোয়েঙ্কা অনেক কথা বলল, কিন্তু আসল কথাটা বলল না। শো-এর নাম কী, কী কনসেপ্ট, অ্যাঙ্কর কে, নাথিং! শুধু মাদার অফ অল শো, নানি ইয়ার আ জায়েগি, খট্টা মিঠা রোড শো — এসব প্যাঁচানো কথা বলে কেটে পড়ল। শোয়ের সাবজেক্ট বলতে না পারার জন্য আমি এডিটরের ঝাড় খাচ্ছি। তোর মেরি মাসিকে জিজ্ঞেস করে কিছু জানা যাবে?"

"মেরি মাসিও কিছু জানতে পারেনি। মেরি মাসির কোম্পানি ডিপ ফোকাস বরাত পেলে তুমি জেনে যাবে।"

মনোহর ফাইল নিয়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। শ্বশুরের বেরনো পর্যন্ত অপেক্ষা করে দিয়া। তারপর মধুরাকে বলে, "শুভ্র যে তোর প্রতি ইন্টারেস্টেড, এটা তুই আগে খেয়াল করিসনি?"

"আম্ম..." সামান্যভাবে মধুরা, "কাল সন্ধে থেকে খেয়াল করছি। এ নিয়ে আমি কিছু ভাবিনি।"

"ও আবার কীরকম উত্তর হল? এটা কি কোনও টাস্ক নাকি যে, অনুভূতিহীনভাবে উত্তরে দিবি?"

"আচ্ছা, আমার মধ্যে অনুভূতি না এলে কি অ্যাক্টিং করে দেখাব?" হেসে ফেলে মধুরা। কৃশানুর নাকডাকা বন্ধ হয়েছে। সে শুয়ে-শুয়ে বলল, "ছেলেটার স্বভাব-চরিত্র খারাপ নয়। মেয়েদের সঙ্গে প্যাথোলজিক্যাল ফ্লার্ট করে, তবে কোনও সিরিয়াস লটঘট করেছে বলে শুনিনি। কেরিয়ার প্রসপেক্টও ভাল। মধু, টাই করতে পারিস!"

"দেশের কী অবস্থা!" কপাল চাপড়ায় মধুরা, "কিছুদিন আগেও মেয়েরা প্রেম করলে বাড়ি থেকে আচ্ছা সে ঝাড় দিত! আর এখন প্রেম না করার জন্য ঝাড় খাচ্ছে!"

কৃশানু-দিয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে মধুরা। এদিকওদিক ঘুরঘুর করে। কিছু ভাল লাগছে না। নিজেকে রাডারলেস জাহাজের মতো লাগছে। লাইফে কোনও ফ্রিকশন নেই, কোনও টেনশন নেই, কোনও গন্ডগোল নেই। নিউ টাউনের রাস্তার মতো চকচকে একটা জীবন! এই জীবন নিয়ে মধুরা কী করবে?

বাবা ঝিমোচ্ছে, মা আর সবিতা ঝগড়া করছে, বউদি রান্নাঘরে ব্যস্ত, দাদা আবার ঘুমছে। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে অযথা চলে যাচ্ছে একটা-দুটো সাইকেল, স্কুলের পতাকা উত্তোলন সেরে ফিরছে ছেলেমেয়ের দঙ্গল, ইলেকট্রিকের তারে বসে এক ঝাঁক কাক মিটিং করছে! দুপুরের রাজচন্দ্রপুর আরও দুপুরের দিকে ঢলছে। সময় বয়ে যাচ্ছে টিকটিক করে। এভাবে একদিন থেকে দু'দিন চলে যাবে, এক সপ্তাহ থেকে দু' সপ্তাহ...মধুরার বয়স বাড়তে থাকবে...

ধুস! এসব ভাবার কোনও মানে হয় না। তিনতলায় উঠে ডেস্কটপ অন করে মধুরা। ফেসবুক খুলে বসে। সময় কাটানোর এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কিছু নেই। মধুরার ভার্চুয়াল ফ্রেন্ডরা সকলেই রিয়্যাল। স্কুলের বন্ধু, কলেজের বন্ধু আর অফিস কলিগ। রোজ গাদা-গাদা অচেনা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসে। মধুরা অ্যাকসেপ্ট করে না। বন্ধুদের

স্টেটাস আপডেট, আপলোড করা ছবি দেখছে মধুরা, এমন সময় পিং...'হাই' শুভ্র!

"হ্যালো!" ক্যাজুয়ালি লিখল মধুরা।

একটু বাদে আবার, "অ্যাংরি কেয়া?"

মধুরা সংক্ষিপ্ত জবাব লিখল, "রাগ করার কোনও কারণ আছে কি?"

মনিটর দেখাচ্ছে, 'শুভ্র ইজ টাইপিং...'

বিশাল ট্যাংরার পার্টির ছবি আপলোড করছে। ছবিগুলো দেখছে মধুরা, এমন সময় আবার পিং..."নেমন্তন্ন খেতে তোর কেমন লাগে?"

এই মন্তব্যে উৎসাহিত হল মধুরা। নেমন্তন্ন নিয়ে আলোচনা সব সময়ে বেটার। সে লিখল, "চমৎকার লাগে। কীসের নেমন্তন্ন পেলি রে?"

"সেটাই জানতে চাইছি। কোন নেমন্তন্ন ভাল লাগে? অন্নপ্রাশন, জন্মদিন, পইতে, বিয়ে, না শ্রাদ্ধ?"

"বাবা! তুই তো জন্ম থেকে মৃত্যু, পুরো রেঞ্জটা কভার করলি! সাধভক্ষণটা বাদ পড়েছে।"

"সাধে ছেলেরা অ্যালাওড নয়। কাম টু দ্য পয়েন্ট।"

"বিয়ের নেমন্তন্ন। তবে ওই পাঁচমিশেলি খাবার নয়, যেখানে বাঙালি, পঞ্জাবি, চাইনিজ, সব কিছুর চচ্চড়ি হয়।"

"গ্রেট! আমারও বিয়ের নেমন্তন্ন বেস্ট লাগে!" শুভ্র হঠাৎ চুপ করে গেল।

বিশালের প্রোফাইল দেখা শেষ করে শুভ্রর প্রোফাইলে ঢুকল মধুরা। কোনও ছবি বা আপডেট নেই দীর্ঘদিন ধরে।

অনেকক্ষণ শুভ্র কোনও উত্তর লিখছে না। মধুরা পিং করে..."কী রে, চুপ কেন? কোথাও গেলি নাকি?"

জবাব এল তুরন্ত। প্রথমে কয়েকটা স্মাইলি। তারপর কমেন্ট..."বিয়ে নিয়ে রিসার্চ করছিলাম।"

"তোর রিসার্চ মানে তো গুগল করা!"

"ওটাও রিসার্চ।"

"রিসার্চ করে কী জানতে পারলি? বাই দ্য ওয়ে, স্যান্ডির নেক্সট প্রোজেক্ট কি ম্যারেজ নিয়ে?"

"স্যান্ডি আমায় কোনও কাজ দেয়নি। নিজেই ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম। অনেক ইন্টারেস্টিং ইনফো পেলাম। বলতো, মানুষই কেন বিয়ে করে? জন্তু-জানোয়াররা করে না কেন?"

"ওদের কেটারিং সার্ভিস নেই, তাই।"

"পি জে! কারণটা জানিস কি?"

"সম্পত্তির অধিকার নিয়ে ঝামেলা এড়াতে। মেল স্পিসিজের ডেথ হলে তার অ্যাকোয়ার করা প্রপার্টি কে পাবে? ফিমেল স্পিসিজ নাম্বার ওয়ানের অফস্প্রিং, না ফিমেল স্পিসিজ নাম্বার টুয়ের অফস্প্রিং, এই ঝামেলা মেটাতে।"

"ব্যাং অন!"

"কাটছি। বাই!"

"দাঁড়া, দাঁড়া। বিয়ের কোন পার্টটা তোর সবচেয়ে ইনট্রিগিং লাগে?"

"ইনট্রিগিং? উম.... খাওয়া দাওয়া।"

"সে সামথিং এলস।"

"রিচুয়ালস। গায়ে হলুদ, সাত পাকস অ্যান্ড অল দ্যাট! অসাম!"

"রেজিষ্ট্রি বিয়ে ভাল লাগে না?"

"নট অ্যাট অল! রসকষহীন!"

"ওকে! হুইচ ওয়ান ইজ বেটার? লাভ অর অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ?"

"নেভার গেভ ইট আ থট! বোথ আর গুড, আই প্রিজিউম।"

"আই প্রেফার অ্যারেঞ্জড লাভ ম্যারেজ।"

"দ্যাট্স গুড। তোর বাবা কোনও মেয়ে দেখেছে?"

"না। আমি দেখেছি।"

মধুরা থমকাল! এতক্ষণ সে আপনমনে চ্যাট করছিল। ভাবনাচিন্তা না করে, ক্যারেক্টরের পর ক্যারেক্টর, অক্ষরের পর অক্ষর, স্মাইলির পর স্মাইলি সাজিয়ে। হঠাৎ তার মনে হল, শুভ্রর চ্যাটের মধ্যে একটা পরিকল্পনা ছিল, একটা প্রি-প্ল্যানড বদমাইশি ছিল, একটা ফাঁদ ছিল। নিজের অজান্তে মধুরা সেই ফাঁদে পা দিয়েছে!

ফোন বাজছে। মধুরার মোবাইলের স্ক্রিনে দপদপ করছে, "শুভ্র কলিং।" ফোন না ধরে মধুরা লেখে, "চ্যাট করতে-করতে আবার ফোন কেন? এখানেই কথা হোক না।"

শুভ্রর নামের পাশে সবুজ বিন্দু ঝপাং করে অদৃশ্য হয়ে যায়! সে অফ লাইন হয়ে গিয়েছে।

ফোন বেজে-বেজে থেমে গেল। নিজেও অফলাইন হল মধুরা। লগ আউট করল কম্পিউটার থেকে। আবার ফোন বাজছে। আবার "শুভ্র কলিং..."

"বল।"

"ছেলে হিসেবে আমি দেখতে কেমন? দশে কত দিবি?"

"আ... সাত। না, সাড়ে সাত।"

"ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডে কত পাব?"

"আট।"

"কোলিগ হিসেবে?"

"এটা কি অ্যাপ্রাইজাল হচ্ছে? যার উপরে আমাদের ইনক্রিমেন্ট নির্ভর করে?"

"হ্যাঁ। কত?"

"ছয়।"

"মানুষ হিসেবে?"

"ও বাবা! এটা টাফ কেস। চিনি না, শুনি না... কী করে নম্বর দেব?"

"হাজব্যান্ড মেটিরিয়াল হিসেবে?"

মধুরা চুপ করে থাকে। তার হাত ঘামছে। মুঠোর মধ্যে ভিজছে মুঠোফোন। বুক ধড়াস-ধড়াস করছে। একেই কি প্রোপোজ় করা বলে? তাকে তো আজ পর্যন্ত কেউ প্রোপোজ় করেনি। ইংরেজি ছবির নাইট ইন শাইনিং আর্মার, হিন্দি ছবির লাল গোলাপের তোড়া, মায় ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র কায়দায় চকোলেট...কিছু হল না; আর একদম হাজ়ব্যান্ড অবধি গপ্পো চলে গেল?

"কী রে, চুপ কেন?"

"একেই কি প্রোপোজ় করা বলে?"

"আমি কী করে জানব? আমি কি কখনও কাউকে প্রোপোজ় করেছি নাকি?"

"ও।"

"ও মানে? নম্বর দে। দশে কত?"

মধুরা অনেকক্ষণ ভাবে। অবশেষে বলে, "আমাকে একটু ভাবতে দে। এগুলো ছেলেখেলা নয়। সিরিয়াস বিষয়।"

"থ্যাঙ্ক গড। অ্যাটলিস্ট ঝাড় নামালি না! তার মানে চান্স আছে। কাল অফিসে দেখা হচ্ছে। বাই," ফট করে ফোন কেটে দেয় শুভ্র।

ফোন খাটে ফেলে রেখে মধুরা থম মেরে বসে থাকে। এটা কি প্রেম হল? তার জীবনে কি ভালবাসা এল? সেসব হলে তো শরীর-মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এখান-ওখান থেকে নানা হরমোন বেরোয়, মন খুশিতে উথলে ওঠে, প্রাণে খুশির তুফান না সুনামি...কী যেন একটা ছোটে! তার কিছু হচ্ছে না তো! মনটা আকাশের মতো ম্যাদা মেরে আছে।

জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকায় মধুরা। সেখানে আবার মেঘ জমছে।

৬

সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখ। আর চারদিন বাদে পুজো। বর্ষা এ বছর দেরিতে এসে কোটা কমপ্লিট করার জন্য আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছে! সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ একটানা পাঁচদিন বৃষ্টি হওয়ার ফলে দক্ষিণবঙ্গের পাঁচ ও উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলাকে সরকারিভাবে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কলকাতা টানা দু'দিন জলের তলায় রইল। দেওয়াল চাপা পড়ে, জলে ডুবে, ড্রেনে পড়ে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। টিভি চ্যানেলের ফুরসত নেই। প্রতি আধঘণ্টায় একটা ব্রেকিং নিউজ়। কেন্দ্রের এক মন্ত্রী বন্যা কবলিত এলাকা দেখতে গিয়েছিলেন হেলিকপ্টার চেপে, তাঁকে গ্রামবাসীরা চটি ছুড়ে মেরেছে! ওদিকে হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া ঢিড়ের

বস্তা মাথায় পড়ে এক গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে। তার জন্য কলকাতায় মোমবাতি মিছিলের আয়োজন করা হল। বৃষ্টির জন্য সেটা ভেস্তে যায়...নিউজ চ্যানেল খুলে হাসবে না কাঁদবে, বুঝতে পারে না মধুরা। তার জীবন চলছে পুরনো ছন্দে। সকালে ঘুম থেকে ওঠা, অফিস যাওয়া, অফিস থেকে ফেরা, টুকটাক কাজ সেরে ঘুমিয়ে পড়া। শুভ্রর জোরাজুরিতে দুটো এলআইসি করিয়েছে, একটা মেডিক্লেম। শুভ্রর পরামর্শে গাড়ি কেনার জন্য টাকা জমাচ্ছে। শুভ্রর সঙ্গে একটা সম্পর্কের মতো ব্যাপার দানা বাঁধছে বলে মনে হয় মধুরার। পরস্পরকে তুই-তোকারি করা বন্ধ করেছে। অফিসের সকলের কাছে তারা এখন 'আইটেম।' কৃশানুর সূত্রে যুথিকা, মনোহর, দিয়া বা সবিতাও সেটা জানে। সবিতা বলেছে, "বলেছিলুম, ছোঁড়া শারুখ খানের কায়দায় খেলবে। গরিবের কথা বাসি হলে ফলে!"

স্বাধীনতা দিবসের পরে আর ক্যালকাটা ধাবায় যায়নি মধুরা। সুলতানকে নিয়ে শুভ্রর একটা সূক্ষ্ম ইনহিবিশন আছে। সেই কারণে ধাবাটা অ্যাভয়েড করে মধুরা। তিনদিন আগে, ২৭ তারিখে, অফিস ছাড়ার ঠিক আগে শুভ্র বলেছিল, "বসের ফোন। জরুরি মিটিং হ্যাজ।"

বস মানে স্যান্ডি।

এরকম মিটিং রুটিন ব্যাপার। নতুন কোনও প্রজেক্ট হাতে এলে প্রজেক্ট ম্যানেজার টিমের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একবার আলোচনা করে নেয়। তবে মিটিংগুলো সাধারণত ফার্স্ট আওয়ারে হয়। প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে স্যান্ডির আলাদা গ্লাস কিউবিক্ল আছে। মধুরা সেটার নাম দিয়েছে, কাচের কফিন। স্যান্ডি একদিন ওই ঘরেই মরবে বলে তার বিশ্বাস! সেখানে ও ছিল না। মিটিং করার জন্য আলাদা যে কনফারেন্স রুম আছে, সেখানে বসে রয়েছে। শুভ্র, মধুরা, অ্যানি, আর যিশু ঢোকার পরে বলল, "আধঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দেব।"

কাজের জন্য অনেক রাত অফিসে কাটাতে হয়েছে। এসব আর গায়ে লাগে না। তবে আধ ঘণ্টার মিটিং শুনে ভরসা পাওয়া গেল।

"নিউ প্রজেক্ট ফ্রম আ ব্রিটিশ লাইফস্টাইল টিভি চ্যানেল, শুরু করে স্যান্ডি, নাম 'হাই লাইফ'। সংক্ষেপে 'হাই।' এত দিন এরা ইন্ডিয়াতে অপারেট করেনি। তাই এদের সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। নেট ঘেঁটে যা পাওয়া যাচ্ছে, তা হল, ইউ কে'র মিডিয়া ব্যারন রবার্ট বয়কট হলেন এর মালিক। ওঁর স্টেবলে নিউজ চ্যানেল, জেনারেল এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেল, কার্টুন চ্যানেল, উইমেনস চ্যানেল —সব আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে কম জনপ্রিয় চ্যানেল, হাই। ওদের মার্কেট রিসার্চ বলছে চ্যানেলটা ইউ কে-তে না চললেও ইন্ডিয়ায় চলার সম্ভাবনা আছে। সো, বেসিক্যালি দে আর ট্যাপিং নিউ মার্কেট। তার আগে নাম্বার ক্রাঞ্চিং করতে চাইছে। ক্লিয়ার?"

অ্যানি বলে, "আমার একটা প্রশ্ন আছে।"

"বলে ফ্যালো।"

"ওরা কি ডিজিটাল ইন্ডিয়া ছাড়া আর কোনও ফার্মের সঙ্গে নেগোশিয়েট করছে?"

"করছে। আর সেই কারণেই আমার প্রেজেন্টেশনটা এমন হতে হবে, যেন অন্য কোম্পানি স্কোপ না পায়। এখানে একটা প্যাচ আছে। সেটা হল, ওদের ইন্ডিয়ার অপারেশন দেখছেন এলিজাবেথ আর্চার নামের এক মহিলা। শি ইজ় বেসিক্যালি এগজ়িকিউটিভ প্রোডিউসর অ্যান্ড কনটেন্ট ডেভেলপার অফ শো-জ়। লিঙ্কে হেল্প করছে 'নৌটঙ্কি' নামে মুম্বইয়ের একটি প্রোডাকশন হাউজ়। 'নৌটঙ্কি'-র এম ডি রাহুল গোয়েঙ্কা আমাদের ক্লায়েন্ট। রাহুল আমাকে কিছু ডেটা দিয়েছে। রিগার্ডিং স্পেন্ডিং প্যাটার্ন অব মিড়ল ক্লাস ইন্ডিয়ানস ইন ফাইভ মেট্রোজ়। মুম্বই, দিল্লি, কলকাতা, বেঙ্গালুরু এবং সুরাত। ডেটাগুলো ইউজ়য়াল প্যারামিটারে ফেলে একটা প্রেজেন্টেশন করতে হবে। সিম্পল কাজ। শুভ্র, ইট্স ইওর রেসপনসিবিলিটি নাউ। তোমার মেশিনে আমি ডেটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল থেকে কাজ শুরু করে দাও। প্রেজেন্টেশন আছে ৩০ সেপ্টেম্বর, সেকেন্ড হাফে। সেদিন ফার্স্ট হাফের মধ্যে সব কিছু রেডি চাই। ক্লিয়ার?"

"মধুরার স্ট্যাটিস্টিক্সের ব্যাকগ্রাউন্ড। ও নাম্বার ক্রাঞ্চিং করুক," বস ডিক্টিবিউশন করে দেয় শুভ্র, "সেটা হয়ে গেলে স্লাইড তৈরির কাজটা যে কেউ করে দিতে পারবে।"

"তা হলে মধুই পুরোটা করুক। ছোট কাজে অন্যদের ইনভল্ভ করার মানে হয় না। ওকে, দ্য মিটিং ইজ় ওভার। বেস্ট অফ লাক।"

পরদিন সকালে অফিসে ঢোকামাত্র শুভ্র মধুরাকে নিয়ে আলাদা করে বসেছিল। একটা সিডি ধরিয়ে বলেছিল, "পাঁচ হাজার কনজিউমারের ডেটা আছে। প্যারামিটার আছে দশটা করে। এক্সেল স্প্রেড শিটে ফেলে টি টেস্ট করলে স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিগনিফিক্যান্স বেরিয়ে যাবে। তারপর পাই চার্ট বা বার ডায়াগ্রাম বানিয়ে নিও। এখন আমাকে দেখাতে হবে না। প্রেজেন্টেশন তৈরির আগে ডেকো।"

পাঁচহাজার কনজিউমারের তথ্য নিয়ে মধুরা ২৮ তারিখ থেকে যুদ্ধ চালাচ্ছে! মুশকিলের কথা, তথ্যগুলো এমএস ওয়ার্ডে তৈরি রয়েছে বলে সরাসরি স্প্রেড শিটে ফেলা যাচ্ছে না। নতুন ডেটা এন্ট্রি করতে হচ্ছে। বিরক্তিকর কাজ! ডেটা এন্ট্রির কাজ শেষ হল আজ দুপুর বারোটার সময়। এত আগে হত না, যদি না মধুরা শুভ্রকে বলে অ্যানিকে ডেটা এন্ট্রির কাজে লাগাত। অ্যানি অনেকটা কাজ উতরে দিয়েছে। স্টুডেন্টস টি টেস্ট করতে হবে এবার। দু'টো গ্রুপের ডেটার মধ্যে তুলনা করে বলতে হবে, কোনও সিগনিফিক্যান্স আছে, না নেই। সমস্ত কাজটাই মেশিন

করবে। মধুরার কাজ গ্রুপগুলোকে সিলেক্ট করে ঠিকঠাক প্রসেস ফলো করা। হিসেব কষতে-কষতে পাগল হয়ে যাওয়ার অবস্থা! এক একটা প্যারামিটারের 'পি ভ্যালু' কষছে, অন্য একটা পেজে সেটা পেস্ট করছে। এই করতে-করতে দুটো বেজে গেল।

"কী রে, খাবি না?" পাশের কিউবিকল থেকে পিং করে জানতে চাইল অ্যানি, "শুভ্র নীচে যাওয়ার আগে বলে গেল, তোকে নিয়ে যেতে।"

কম্পিউটারের বিম ব্যান্ডে সময় দেখে মধুরা। দুটো দশ। একটানা অনেকক্ষণ কাজ করেছে। ১০ মিনিটের একটা ব্রেক তার প্রাপ্য।

মস্টুর চায়ে চুমুক দিয়ে শুভ্র বলল, "কাজ কমপ্লিট?"

আর চারদিনবাদে পুজো। কিন্তু এখনও আকাশের রং ন্যাতার মতো। আবহাওয়া গুম মেরে আছে। এই রকম সময়ে মধুরার মনখারাপ বেড়ে যায়। সে চায়ে চুমুক দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বলল, "প্রায়।"

"প্রায় বললে হবে? আজ ফার্স্ট হাফের মধ্যে প্রেজেন্টেশনটা স্যান্ডিকে দেওয়ার কথা ছিল। আমি বলে-কয়ে সেকেন্ড হাফ পর্যন্ত টেনেছি। সন্ধে সাতটায় রাহুল গোয়েঙ্কার সঙ্গে মিটিং। প্রিপারেশনের টাইম পাবে না বলে স্যান্ডি খচে আছে!"

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে ভাঁড় ডাস্টবিনে ফেলে মধুরা বলে, "বার ডায়াগ্রাম আর পাই চার্ট তৈরি বাকি আছে। ঘণ্টাখানেক লাগবে। তারপর তোমাকে ডেকে নেব। দু'জনে মিলে একটা পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি করতে ম্যাক্স আধঘণ্টা লাগবে। সেকেন্ড হাফের গোড়ায় স্যান্ডিকে প্রেজেন্টেশন ধরিয়ে দেব।"

"গুড গার্ল!" মধুরার পিঠ থাবড়ে সিগারেট ধরায় শুভ্র। অ্যানি আর শুভ্রকে মস্টুর দোকানে রেখে মধুরা ওয়র্কস্টেশনে ফেরত আসে। চোখ-কান বুজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে কাজটা তুলে দিয়ে কমিউনিকেটরে শুভ্রকে লিখল, "আমি তোমার ওখানে যাব? না তুমি আমার এখানে আসবে?"

শুভ্র লিখে পাঠাল, "নিজে বানিয়ে নাও।" তথাস্তু। আবার মেশিনে বসে মধুরা। একগাদা ডেটার থেকে ঝাড়াই-বাছাই করে শুধু স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট ডেটা নিয়ে প্রেজেন্টেশন তৈরি করা শক্ত কাজ নয়। তা ছাড়া শুভ্র এবং স্যান্ডি এটা ক্রসচেক করবে। মোট ৩০টা স্লাইড লাগল সবটা এক্সপ্লেন করতে। কাজ শেষ হল পাঁচটার সময়। প্রেজেন্টেশনটা সিডিতে বার্ন করে শুভ্রর হাতে ধরিয়ে মধুরা বলল, "একবার চেক করে বসকে দিয়ে এসো।"

দায়িত্ব ঘাড় থেকে নামিয়ে খুশি হল মধুরা। বেঙ্গলুরু থেকে ফেসবুকে আপলোড করা টিটো-দেবশ্রীর বিয়ের ছবিগুলো দেখতে লাগল। গতকাল বিয়ে করেছে। আজই ৫০টা ছবি আপলোড করা কমপ্লিট। বিয়েটা মুখ্য, না ছবি শেয়ার করা, কে জানে! কিছুক্ষণ ছবি দেখে পুরনো কাজ শুরু করে মধুরা। পৌনে সাতটা অবধি ঘাড় গুঁজে কাজ করার পরে মেশিন শাট ডাউন করে। অ্যানি চেয়ারে বসে স্ট্রেচিং করছে। সিট থেকে উঠে মধুরা বলল, "অনেক দেশোদ্ধার করেছিস। এবার বাড়ি চল।"

অ্যানি উঠে দাঁড়ায়, "তোর হাবি কোথায় গেল?"

"হাবিজবি বকিস না তো!" বিরক্ত হয়ে বলে মধুরা, "গেছে কোনও চুলোয়। কাম, লেট্স গেট আউট অফ হিয়ার!"

করিডরে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে দু'জনে, এমন সময় পিছন থেকে শুভ্রর হাঁক, "মধুরা, বস ইজ ওয়েটিং ফর ইউ।"

অফিসের মধ্যে কেউ উঁচু গলায় কথা বলে না। অবাক হয়ে অ্যানির দিকে তাকায় মধুরা। শুভ্র দাঁড়িয়ে রয়েছে কনফারেন্স রুমের বাইরে, দরজায় হাত রেখে সে আবার চেঁচাল, "মধুরা, কুইক! অ্যানি,

তুইও আয়!"
সন্ধে সাতটার সময় কনফারেন্স রুমে তলব? এখন তো ওখানে স্যান্ডির রাহুল গোয়েঙ্কাকে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার কথা। মধুরা আর অ্যানি করিডর বরাবর দৌড়োয়। ঠান্ডা ঘরের মধ্যে বসে রয়েছে জিন্স আর ফ্লোরাল প্রিন্টের হাফ শার্ট পরা বছর ষাটেকের এক ব্যক্তি। চামড়ার রং টিপিক্যাল দুধে-আলতা। মাথার চুল শেভ করা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, মুখে বয়সোপযোগী বলিরেখা। তবে চেহারাটি যুবকোচিত। ঠোঁটের কোণে স্মিত হাসি নিয়ে রাহুল স্যান্ডির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।
স্যান্ডির অবস্থা দেখার মতো। ঠান্ডা ঘরেও সে দরদর করে ঘামছে। এলসিডি প্রোজেক্টরে কোনও স্লাইডের ছবি নেই। আছে দু'টো শব্দ, "ইনকমপ্যাটিবল ফরম্যাট।"
"কী হল?" ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করে মধুরা। স্যান্ডি নিজের ল্যাপটপের কি বোর্ড টেপাটেপি করছিল। মধুরার গলার আওয়াজ শুনে উঠে দাঁড়াল।
ওয়েল টেলরড সুট, জেল দিয়ে ব্যাকব্রাশ করা চুল, রিমলেস চশমা দিয়ে তৈরি স্যান্ডির কুল ইমেজ। অনেক দিনের সচেতন নির্মাণ। কাজপাগল, অফিসের জন্য নিবেদিত প্রাণ, গো-গেটার, অ্যাচিভার, সহকর্মীদের জন্য অনুভূতিপ্রবণ যে ভাবমূর্তি, তাতে চিড় ধরছে! কুঁচকানো কপালের রেখায়, ভ্রূ ভঙ্গিতে, শক্ত জ-লাইনে ফুটে উঠেছে ক্রুর ভিলেনি। দাঁতে দাঁত চেপে, মোলায়েম কণ্ঠে সে বলল, "এটা খুলছে না কেন মধুরা? টেস্ট রান করোনি?"
ল্যাপটপের পাশের বোতাম চাপ দিয়ে সে সিডি বের করে আনে। তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে সিডি নিয়ে অফিসের হায়ারার্কি মেনে তুলে দেয় শুভ্রর হাতে। মধুরার দিকে তাকিয়ে বলে, "আই নিড ইট উইদিন ফিফটিন মিনিটস ম্যাক্স।" তারপর চেয়ারে বসে রাহুলের দিকে তাকিয়ে বলে, "কফি?"
"তুমি টেস্ট রান করাওনি?" করিডর দিয়ে দৌড়ে ওয়র্কস্টেশনের দিকে যেতে-যেতে বলে মধুরা।
"না। তুমি যে ছড়াবে, সেটা আমি কী করে জানব?" রাগ-রাগ গলায় বলে শুভ্র। নিজের মেশিনে সিডি ঢোকায় মধুরা। প্লে করে। পর্দায় আবার ফুটে ওঠে, "ইমকমপ্যাটিবল ফরম্যাট!"
মধুরার বুক ধড়ফড় করছে! ফুসফুস দু'টো গলার কাছে গজগজ করছে, পেটের মধ্যে ঘাই মারছে হাঙর! শ্যাসফ্যাসে গলায় সে বলল, "কেন এইরকম হচ্ছে?"
"তুই ওঠ!" এক ধাক্কায় মধুরাকে চেয়ার থেকে তুলে দেয় অ্যানি, "কোন ড্রাইভে সফট কপি স্টোর করেছিস?"
"ই ড্রাইভ," অ্যানির পিছনে দাঁড়িয়ে বলে মধুরা।
ফটাফট মাউস টিপে ই ড্রাইভে ঢোকে অ্যানি। বলে, "ফোল্ডার নেম?"
"প্রেজেন্টেশন আন্ডারস্কোর হাই লাইফ...ওই-ওইটা..." আঙুল দিয়ে মনিটর দেখায় মধুরা।
অ্যানি মাউসে রাইট ক্লিক করে, "ওপেন"! এবার অপেক্ষা! এক সেকেন্ড, দু'সেকেন্ড, তিন সেকেন্ড...
যদি না খোলে? মধুরার পায়ের নীচের মেঝে ময়দামাখার মতো নরম হয়ে যাচ্ছে! মনে হচ্ছে, সে ঢুকে যাবে চোরাবালির গভীরে। যেখান থেকে বেরনোর কোনও পথ নেই। আজ, এখনই তার চাকরি যাবে! ইনএফিশিয়েন্সির জন্য চাকরি গেলে সার্কিটে সেটা খবর হয়ে যায়। সারা জীবনের জন্য কেরিয়ারে ব্যাড প্যাচ পড়ে যাবে। কেন এমন হল? সে তো সব ঠিকঠাকই করেছিল। অন্য কোনও কাজে তার ভুল হয় না। রান্নায় নুন দিতে ভুল হয় না। লুচি ফোলাতে ভুল হয় না। চাটনিতে চিনির মাত্রা ঠিকঠাক হয়। অফিসের কাজে সে কেন অন্যমনস্ক? কেন?
"খুলেছে!" একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল অ্যানি আর শুভ্র!
মধুরা কান্না চাপতে-চাপতে ভাবল, এই ক্রুশিয়াল মোমেন্টেও সে কেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল? কাজকে সে ভালবাসে না? ডেস্ক থেকে নতুন সিডি বের করে সে সিপিইউতে ঢোকায়।
"দাঁড়াও! তোমাকে পাকামো মারতে হবে না। আগে আমাকে সবটা দেখতে দাও," শুভ্র কি বোর্ডের উপরে হামলে পড়ে ঝড়ের গতিতে সব ক'টা স্লাইড চেক করে, যাতে কোনও গ্রামারের ভুল বা বানানের গন্ডগোল না থাকে। অবশ্য থাকলেও কী করত, কে জানে? হাতে সময় মাত্র সাত মিনিট। দেখা শেষ করে মধুরার হাত থেকে সিডি নিয়ে বার্ন শুরু করে।
অপেক্ষা! ঘড়ির দিকে তাকায় মধুরা। আর চার মিনিট।
সিডি কপি করা হয়ে গিয়েছে। সিপিইউ থেকে সিডি বের করে শুভ্র একছুটে নিজের ওয়ার্কস্টেশনে যায়। নিজের মেশিনে সিডি ঢুকিয়ে টেস্ট রান করে। "ইনকমপ্যাটিবল ফরম্যাট"-এর চোখরাঙানি উধাও! দিব্যি দেখা যাচ্ছে। মধুরার ঘড়ি বলছে আর দেড় মিনিট সময় আছে।
মেশিন থেকে সিডি বের করে মধুরার হাতে তুলে দিয়ে শুভ্র বলল, "রান ফর ইওর লাইফ!"
বলার প্রয়োজন ছিল না। ওয়র্কস্টেশনের গোলকধাঁধা টপকে, কাচের দরজা এক ধাক্কায় ঠেলে করিডরে পৌঁছয় মধুরা। লম্বা করিডোর টপকে কনফারেন্স রুমের হাতলে টান দেয়। মুখ গলিয়ে বলে, "মে আই কাম ইন?"
"এসো", কফির কাপ সরিয়ে বলে রাহুল, "শুরুটা তুমিই করো।"
দৌড়নোর জন্য শ্বাস এখনও দ্রুত। পেটের মধ্যে এখনও ঘাই মারছে হাঙর! ফুসফুস দু'টো এখনও গজগজ করছে গলার কাছে। স্যান্ডির ল্যাপটপ টেনে নিয়ে সিডি ঢোকায় মধুরা। তারপর রিমুভেবল ডিস্ক ফোল্ডারে গিয়ে রাইট ক্লিক করে সিডি ওপেন করে। অপেক্ষার বালিঘড়ি ঘুরছে। এক পাক, দু'পাক, তিন পাক...
মধুরার মাথাও আস্তে-আস্তে ঘুরছে। সিকিপাক, আধপাক, পৌনে একপাক... মনিটরে ঝলমলিয়ে উঠেছে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের এক নম্বর স্লাইড। অ্যাকোয়ামেরিন ব্লু-এর পটভূমিতে লেখা, "গুড আফটারনুন মিস্টার রাহুল গোয়েঙ্কা! ওয়েলকাম টু ক্যালকাটা" পাশে ধূমায়িত এক ভাঁড় চা।
রাহুল হেসে ফেলেছে, "নাইস পারসোনাল টাচ! দেখি, বাকিটা কেমন হয়েছে।"
স্যান্ডি ইমপ্রম্পটু বলা শুরু করেছে। মধুরা আস্তে-আস্তে টেবিল থেকে সরে আসে। কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে আসার আগে শুনতে পায়, স্যান্ডির কথার মধ্যে চাপা গলায় রাহুল বলছে, "মেশিনটা কত দিন ফরম্যাটিং করাওনি?"
অফিস থেকে বেরিয়ে মধুরা দেখল, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। একে অন্ধকার, তায় বৃষ্টি, তার উপরে মনখারাপ। এখন এক ভাঁড় চা খেলে মন্দ হয় না! যেমন চা সে পাওয়ার পয়েন্টের প্রথম স্লাইডে ঢুকিয়েছে। মন্টুর ঝুপসে গিয়ে সে বলল, "চা দে।"
"আমার এখানে দাঁড়ালে তুমি ভিজে যাবে। বাবার ওখানে যাও। এস্পেশাল চা পাবে।"
"বাবার ওখানে" মানে ক্যালকাটা ধাবা। কুৎসিত বৃষ্টির মধ্যে মধুরা রাস্তার ওপারে ক্যালকাটা ধাবার দিকে তাকায়। স্বাধীনতা দিবসের সকালে সুলতান তাকে পরে আবার ধাবায় আসতে বলেছিল। নানা কারণে যাওয়া হয়নি। মাথা ঠান্ডা করার জন্য এখন তাকে অন্য কোথাও যেতে হবে। ছাতা মাথায় রাস্তা পেরোয় মধুরা।

"আলুর খোসা ছাড়া", মধুরাকে দেখে এক ডেকচি সেদ্ধ আলু এগিয়ে দেয় সুলতান।

কোনও প্রশ্ন নেই, কোনও আপ্যায়ন নেই, "কোথা থেকে এলি", "আপিসের কী খবর?" "এতদিন কেন আসিসনি?"— এসব ফালতু কৌতূহল নেই, সরাসরি কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া।

মধুরারও কোনও বিকার নেই। ছাতা আর ব্যাকপ্যাক পারুলকে ধরিয়ে সে ডেকচি নিয়ে বসে যায়। অন্য একটা ডেকচিতে ঠান্ডা জল নিয়ে তার মধ্যে সেদ্ধ আলুগুলো রাখে। এভাবে না ছাড়ালে হাত পুড়ে যাবে। আধঘন্টার মধ্যে আলুর খোসা ছাড়ানো শেষ করে মধুরা বলে, "আলুগুলো আস্ত রাখব, না অর্ধেক করে কাটব?"

"কী মনে হয়?" উনুনের উপরে চাপানো বিশাল হাঁড়ির ঢাকনা তুলে প্রশ্ন করল সুলতান।

"বিরিয়ানিতে আস্ত আলু দেওয়াই বেটার। তবে বিরিয়ানিতে আলু দেওয়া নিয়ে হায়দরাবাদ আর লখনউ-এর কারিগররা কলকাতার বিরিয়ানিকে খুব হ্যাটা করে", আব্রাহাম সেনের লেখা "বাদশাহি কুইজিন" বইটায় পড়া তথ্য মনে পড়ে যায় মধুরার।

"কীরকম?" মাংসের পাহাড় আর ধারালো চপার মধুরার সামনে নামিয়ে সুলতান অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

চপার দিয়ে রেওয়াজি খাসির মাংস কাটতে-কাটতে মধুরা বলে, "ওয়াজিদ আলি শাহ লখনউ থেকে চলে এলেন আমাদের মেটিয়াবুরুজে। সঙ্গে এল দাসি-বাঁদি, গাইয়ে-বাজিয়ে, নফর-চাকর এবং কয়েক গণ্ডা খানসামা। নবাবের রসুইঘর থেকে রাজকীয় সুবাস বেরতে লাগল। সারা কলকাতা সেই খুশবুতে মোহিত হয়ে গেল। নবাবের অতিথির সংখ্যা কম। অথচ ইংরেজের দেওয়া মাসোহারা দিয়ে লখনউয়ের বিরিয়ানি খাওয়ানো যাচ্ছে না। মাংস কম পড়ছে। একদিন এক খানসামা মাংসের অভাবে একটা আলু বিরিয়ানিতে দিয়ে দিল। সেদিন অতিথিরা বিরিয়ানি খেয়ে 'ওয়াঃ, ওয়াঃ' করতে লাগল। রুপোর রেকাবে সুসিদ্ধ ভাতের ফাঁকে সোনালি আলু দেখে তারা ভাবল, এ হয়তো সোনালি হাঁসের ডিম। খানসামার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তারা বাড়ি গেল। সত্যি কথা বেরতে সময় লাগল না। কিছুদিনের মধ্যেই জানাজানি হয়ে গেল যে মেটিয়াবুরুজের নবাব বিরিয়ানিতে মাংসের বদলে আলু মেশাচ্ছেন! ওয়াজিদ আলি শাহর কানে খবর গেল। তিনি খানসামাকে তাড়ালেন। সে বেচারি বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে চলে এল কলকাতার উত্তরদিকে। চিৎপুরে। গরিবপাড়ার জন্য গরিব বিরিয়ানি আলু সহযোগে দিব্যি বিকোতে লাগল। হায়দরাবাদ আর লখনউ-এর খানসামারা কলকাতার এই গরিবপনা দেখে হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল।"

মাংস কাটা শেষ। মস্ত বড় থালায় মাংস নিয়ে সুলতানকে পৌঁছে দিল মধুরা।

সুলতান মুচকি হেসে বলল, "গায়ে জোর আছে তো!"

"তা আছে। আর কী করতে হবে বলো?"

"আপাতত কিছু করতে হবে না। হাত ধুয়ে বোস। তোর বউদি চা বানাচ্ছে। ততক্ষণ গপ্‌পোটা শেষ কর।"

"গপ্‌পোর আর কিছু বাকি নেই। আলুর একটা গুণ হল, এ সমস্ত মশলার ফ্লেভার নিজের মধ্যে নিয়ে আস্তে-আস্তে সেই ফ্লেভার ছাড়ে। এ ছাড়া আলুতে কর্বোহাইড্রেট আর জল ছাড়া কিছু নেই। ওই জলের কারণে বিরিয়ানির ভাত দলা-দলা না হয়ে আলাদা-আলাদা থাকে। কলকাতার বিরিয়ানিতে আলুর রংবাজিকে সারা ভারতের খাদ্যরসিকরা মেনে নিয়েছে। কম তেল, কম মশলাপাতি আর আলুর সহাবস্থান নিয়ে কলকাতার বিরিয়ানিকে এখন লখনউ আর হায়দরাবাদি বিরিয়ানির সঙ্গে ভারতবর্ষের হোলি ট্রিনিটি হিসেবে গণ্য করা হয়।"

"চা নাও", পারুল মধুরার হাতে এক ভাঁড় মশলা চা ধরাল। সুলতানকে এক ভাঁড় চা দিয়ে বলল, "রাহুলদা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তুমি বকবক করছ বলে রান্নাঘরে আসেননি। ওখানে ওয়েট করছেন।"

রাহুলদার নাম শুনে চায়ের ভাঁড় রেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় সুলতান। "অত বড় মানুষটা এসেছেন, তুমি আগে বলবে তো!" তারপর হন্তদন্ত হয়ে সিটিং এরিয়ায় ঢোকে।

আরাম করে চায়ে চুমুক দিতে-দিতে মধুরা ভাবে, বৃষ্টি থেমেছে। এবার আস্তে-আস্তে বাড়ির দিকে যাওয়া যাক। ব্যাকপ্যাক লটকে, ছাতা নিয়ে, পারুলকে টা-টা করে মধুরা। ক্যালকাটা ধাবা থেকে বেরনোর সময় সুলতানের দিকে হাত নাড়তে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। এ কী দেখছে সে? বাঁশের বেঞ্চিতে বসে সুলতানের সঙ্গে হাসতে-হাসতে গপপো করছে জিন্‌স আর ফ্লোরাল প্রিন্টের টি-শার্ট পরা, ন্যাড়ামাথা আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা বয়স্ক একজন লোক। মধুরাকে দেখে গম্ভীর হয়ে যায় সে।

রাহুল গোয়েঙ্কা!

৭

ক্যালেন্ডারের হিসেবমতো এটা হেমন্তকাল। আজ ১৫ অক্টোবর। দুর্গাপুজো কয়েকদিন আগে শেষ হয়েছে। বিজয়া দশমীর দিন শুভ্র এসেছিল। মনোহর-যুথিকাকে প্রণাম করে, কৃশানুর সঙ্গে কোলাকুলি চুকিয়ে, নকুড়ের সন্দেশের বাক্স যুথিকার হাতে ধরিয়ে মধুরাকে বলেছে, "একদিন আমাদের বাড়িতে এসো। বাবা-মা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে।" আজ সেই দিন। বিজয়া দশমীর এত দিন পরে মধুরার মনে হয়েছে, শুভ্রর বাড়ি গেলে হয়। আজ শনিবার। দু'জনেরই ছুটি আছে। তিন তলায় নিজের ঘরে বসে কালো নেলপালিশ লাগাচ্ছিল মধুরা। ঘর ঝাঁট দিতে এসে সবিতা সেটা দেখে গেছে। কিছুক্ষণ বাদে বেতো হাঁটু নিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে যুথিকা ঢুকল।

"এই যে মা জননী! এসব কী হচ্ছে শুনি?"

"কী?" নখে ফুঁ দিচ্ছে মধুরা।

"প্যান্ট-শার্ট ছাড়া অন্য কিছু পরো না, চোখে ব্যাটাছেলেদের মতো মোটা ফ্রেমের চশমা, নখে কালো কুচ্ছিত নেলপালিশ লাগাও, সব সময় কানে মোবাইলের পুঁটলি গুঁজে রাখো, ল্যাপটপ থেকে চোখ তোলো না — কিচ্ছু বলি না। আমাদের সময়ে মেয়েদের অনেক বাঁধন ছিল। ঘরে-বাইরে নানা অত্যাচার সইতে হয়েছে। আমার মেয়েটাকে যেন সেসব সহ্য করতে না হয়। তার ফল হল এই? বিজয়ার প্রণাম করতে যাওয়ার সময়ে কালো নখপালিশ লাগাচ্ছ!"

যুথিকার হাত-পা নাড়া দেখে, কান থেকে আইপডের তার খুলে মধুরা বলল, "কিছু বললে?"

"না মা, কিচ্ছু বলিনি!" হাত নেড়ে বলে যুথিকা, "তোমাকে বলা যা, দেওয়ালকে বলাও তা! পারলে নখপালিশের রংটা পাল্টাও!" হাত জোড় করে মেয়েকে নমস্কার করে যুথিকা। তারপর ফোলা হাঁটু নিয়ে কুঁতোতে-কুঁতোতে নীচে নেমে যায়। খাবার টেবিলে বসে উদাস মুখে বিড়ি ফুঁকছে মনোহর। যুথিকার চিৎকার শুনে দার্শনিক হয়ে গেল। বলল, "আসলে কী জান গিন্নি, এদের জীবনে কোনও প্রবলেম নেই। মিডিল ক্লাস ঘরের মেয়ে। যখন যা চেয়েছে, পেয়েছে। একটু অভাব না থাকলে ছেলেমেয়ে মানুষ হয় না।"

"হ্যাঁ, আমি এখন গিয়ে রেল বসতিতে একটা ঝুপড়ি বানিয়ে থাকি!" ঝংকার দিয়ে ওঠে যুথিকা, "তোমার বোকা-বোকা কথা শুনলে গা জ্বালা করে।"

"গিন্নি! আমি তা বলিনি। আমি বলতে চেয়েছি, আমরা ছোটবেলা থেকে কত কিছু দেখেছি। স্বাধীনতা দেখেছি, দেশভাগ দেখেছি, মহামারী দেখেছি, দাঙ্গা দেখেছি, মন্বন্তর দেখেছি, নকশাল মুভমেন্ট দেখেছি।

এরা কী দেখে বড় হল বলো তো?"
"কেন বাবা? আমরা টিভি দেখে বড় হলাম!" সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বলে মধুরা, "দাঙ্গা, 'শাশুড়ির কিস্তিমাত বউমা কুপোকাত', মেগা সিরিয়াল, 'টুইন টাওয়ার উড়ে যাওয়া,' 'নাচ ময়ূরি নাচ', 'ডান্স রিয়্যালিটি শো...' স-ব দেখেছি!" সে নেলপালিশ রিমুভার দিয়ে কালো রং মুছে ন্যাচারাল কালার লাগিয়েছে। পরে আছে টি-শার্ট আর জিন্স। টি-শার্টে লেখা, '"আই স্লিপ, দেয়ারফোর আই অ্যাম।"'
মধুরাকে খেতে দিয়ে সবিতা আর যূথিকা গুজগুজ করছে। তাদের আলোচনার বিষয়, মধুরার পোশাক। ভাতের সঙ্গে ডাল সবে মেখেছে, সবিতা মিহি গলায় বলল, "হালকা ঠান্ডা পড়েছে। ফিরতে রাত হবে। অন্য কোনও জামা পরলে হত না?"
"অন্য জামা মানে?" ভাত মুখে চালান করে প্রশ্ন করে মধুরা।
"মানে, শাড়ি-টাড়ি!" মিনমিন করে সবিতা।
তাকে থামিয়ে যূথিকা বলে, "তুই ওর কথা রাখ তো! যত্ত সেকেলে আইডিয়া। তুই বরং সালোয়ার-কামিজ পর। দোপাট্টা থাকলে কান দিয়ে ঠান্ডা ঢুকবে না।"
"আমার কাছে কানচাপা আছে। ফুটপাথ থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে কেনা," জানায় মধুরা।
"হ্যাঁ, ওটা খুব ভাল। তোর বাবাকে দিয়ে দে। বেচারির ঠান্ডা লেগে দিনরাত কাশছে," মধুরার ব্যাগ খুলে কানচাপা বের করে মনোহরের হাতে ধরিয়ে দেয় যূথিকা।
"ঠিক আছে। ওটা বাবা নিক। আমি ব্যাগে একটা স্কার্ফ ভরে নিচ্ছি," খাওয়া প্রায় শেষ মধুরার।
মনোহর বাধ্য হয়ে মুখ খুলল, "উপরে একটা জ্যাকেট চাপাও। টি-শার্ট পরে, বুক চিতিয়ে শুভ্রর বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করাটা শোভন হবে না।"
"কথাটা সরাসরি বললেই পারতে। ঘুরিয়ে নাক দেখানোর কী দরকার?" তিন তলায় গিয়ে পুজোয় কেনা জলপাই রঙের সালোয়ার-কামিজ বের করে মধুরা। এখনও এটা একবারও পরা হয়নি। পোশাক বদলের কারণে সাজ এবং অ্যাকসেসরিজ বদলে গেল। মোটা ফ্রেমের চশমার বদলে কনট্যাক্ট লেন্স, (যেটা মাইনের টাকায় কিনেছে সে,) টপ নটের বদলে খোলা চুল, হোবো ব্যাগের বদলে ক্লাচ, স্লিপ ফ্রপের বদলে কোলাপুরি চপ্পল। নাকে একটা নোলক আর চোখে সামান্য কাজল। আবার দোতলায় নেমে এল মধুরা।
"ঝি মাগীদের মতো নখ পরেছ কেন?" কপাল চাপড়ে বলে সবিতা, "একটা অনাছিষ্টি কাণ্ড না ঘটালে কি মন ভরে না? খোলো ওটা নাক থেকে, খোলো।"
মুচকি হেসে নোজ রিং খুলে যূথিকার হাতে ধরিয়ে বাড়ি থেকে বেরয় মধুরা। ওটা পরে থাকার কোনও প্ল্যান তার ছিল না। শুভ্রর বাড়ি ঢোকার আগে খুলে নিয়ে ব্যাগে ঢোকাত।

শুভ্রদের বাড়িটা বাড়ি না অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স, এই নিয়ে বিতর্ক আছে। বাগবাজারের দিঞ্জি এলাকায় এই রকম বহুতল দেখা যায় না। এর পিছনে একটা দশ লাইনের গল্প আছে। শুভ্রর ঠাকুরদার ঠাকুরদা কোনও এক জমিদারের নায়েব ছিলেন। সেই জমিদার ঠাকুরদার ঠাকুরদাকে এখানে অনেকটা জমি দান করেন। সেখানে গড়ে ওঠে দত্তবাড়ি। তিনতলা এবং দু' মহলা। এর পর দত্ত পরিবার ওই বাড়িতে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করতে থাকে। যেমন-যেমন সন্তানের জন্ম, বিবাহ ইত্যাদি হতে থাকে, তেমন-তেমন এলোপাথাড়ি ঘর উঠতে থাকে। ১২ ঘর এক উঠোনের মায়া কাটিয়ে একটি-দু'টি ছেলে উত্তর ছেড়ে দক্ষিণের ফ্ল্যাটেও পালাতে থাকে।
শুভ্রর ঠাকুরদা ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বুঝতে পারলেন, দত্ত পরিবারের ডানা মেলে উড়তে থাকা ছানাপোনাগুলিকে এক জায়গায় বাঁধতে গেলে অন্যভাবে ভাবতে হবে। অর্থ ছিল, প্রতিপত্তি ছিল, আউট অফ দ্য বক্স ভাবার ক্ষমতা ছিল। তাই অযত্নে বেড়ে ওঠা দত্তবাড়ি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে সেখানে মাথা তুলল দত্ত ম্যানসন। ছ'তলা বহুতল। এক তলায় কার পার্কিং ছাড়াও তিনটি দোকানঘর। ফ্ল্যাঙ্কাইজির ভিত্তিতে সেগুলো চালায় দত্ত পরিবারের ছেলে-বউয়েরা। উপরের পাঁচতলায় ১০টি ফ্ল্যাট। তিন প্রজন্মের আটটি পরিবার আলাদা আলাদা থাকে। দু'টি ফ্ল্যাট তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে। বাড়িতে বিবাহযোগ্য পুরুষের সংখ্যা আপাতত এক। শুভ্র! একতলায় দোকান ছাড়াও একটা কমিউনিটি কিচেন আছে। প্রতিটি ফ্ল্যাটের প্রাতরাশ, দুপুরের খাওয়া,

বিকেলের জলখাবার ও রাতের খাওয়াদাওয়া এই কিচেনে হয়। যেসব ছেলে বা মেয়েরা অফিস যায়, তাদের টিফিন তৈরি হয় এখানে। দত্ত ম্যানসনে উপস্থিত থাকলে কমিউনিটি কিচেনে খাওয়াটা রিচুয়ালের মধ্যে পড়ে। এত দিন ব্যতিক্রম ছিল না। সম্প্রতি বিভিন্ন তরফের অনুরোধে একটা "এক্সসেপশন" যোগ হয়েছে। কোনও ফ্ল্যাটে অ্যালকোহল সহযোগে পার্টি থাকলে গৃহস্বামী বা তার অতিথিরা এখানে আসবে না। তাদের খাবার এখান থেকেই যাবে। বিনিময়ে গৃহকর্তা বা কত্রীকে একদিন অতিরিক্ত শ্রমদান করতে হবে। এবং, শুভ্রর বাবা গুরুপদ দত্তর ভাষায়, "এই বেলেল্লাপনা মাসে দু'দিনের বেশি অ্যাকসেপ্ট করা হবে না।"

শুভ্রর ঠাকুরদার মৃত্যুর পর, বড় ছেলে গুরুপদ এবং তার স্ত্রী মঞ্জু এখন দত্ত পরিবারের গার্জেন। মধুরা আজ তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।

ডানকুনি লোকালে চেপে দমদমে নামল মধুরা। স্টেশনের বাইরে বাইক নিয়ে অপেক্ষা করছিল শুভ্র। চিড়িয়ামোড় আর শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় টপকে বাগবাজারের গলি-গলতার মধ্যে দিয়ে দত্ত ম্যানসনে আসতে সময় লাগল মিনিটকুড়ি। মধুরা একা এলে ডেফিনিটলি খুঁজে পেত না।

বাইরে থেকে দত্ত ম্যানসন অন্য পাঁচটা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের মতো দেখতে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে পরপর তিনটে দোকান। গ্রসারি শপ, কাপড়জামা আর খাদ্যদ্রব্যের রিটেল চেন।

বাইক থেকে নেমে মধুরা বলল, "বাড়ির যাবতীয় বাজার এখান থেকে হয়?"

"হ্যাঁ," বাড়ির একপাশের প্রশস্ত ড্রাইভওয়ে দিয়ে বাইক ঢুকিয়ে জবাব দেয় শুভ্র। মধুরা ড্রাইভওয়েতে উঁকি মারে। পাঁচটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। চারটে বাইক। ছ'টা সাইকেল। নিজের বাইক স্ট্যান্ড করে শুভ্র বলল, "রান্নাঘরে যাও। মা ওখানে রয়েছে।"

শুভ্রর মুখে কয়েকবার "কমিউনিটি কিচেন" শব্দবন্ধ শুনে মধুরার মাথায় জেলের লঙ্গরখানার ইমেজ তৈরি হয়েছিল। বিরাট-বিরাট অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি নিয়ে একজন পোড়খাওয়া কয়েদি দাঁড়িয়ে। পোড়া সানকি হাতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে বাকি কয়েদিরা। একজন করে ডেকচির সামনে আসছে আর সর্দার একহাতা লপসি সানকিতে ঢেলে দিয়ে চেঁচাচ্ছে, "আগে বাড়ো।"

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসি বসানো রান্নাঘরে ঢুকে ধারণা ১৮০ ডিগ্রি বদলে গেল মধুরার। একে রান্নাঘর বলা ভুল। এ কোনও অত্যাধুনিক পাঁচতারা হোটেলের কিচেন। বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মডিউলার কিচেনকে আড়ে-বহরে দশ গুণ করলে এই রান্নাঘর সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। ফ্রিজ থেকে শুরু করে গ্যাস, আভেন থেকে ডিস ওয়াশার — সবই জাম্বো সাইজের। পাঁচজন মহিলা ও পাঁচজন পুরুষ কাজ করছে। গ্রানাইটের প্যানেলিং করা টেবিল টপে ডালবাটা বরফি আকারে কাটতে-কাটতে এক বয়স্ক মহিলা চেঁচালেন, "শুভ্র, ওকে উপরে নিয়ে যা।"

মধুরা ততক্ষণে জুতো খুলে, সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে হাত-পা ধুয়ে, কাবার্ড খুলে নতুন হাওয়াই চপ্পল জোগাড় করে ফেলেছে। মহিলার কাছে গিয়ে বলল, "ধোঁকার ডালনা করছেন? আমি ভেজে দিই?"

মহিলা মধুরার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন। অবশেষে বললেন, "আমি শুভ্রর মা।"

"ও!" মঞ্জুর হাত থেকে চপার নিয়ে ডালবাটার যেটুকু পিস করা বাকি ছিল, সেটাকে নিখুঁত বরফি আকার দেয় মধুরা। বার্নারে কড়া চাপিয়ে বলে, "সরষের তেল কোথায়?" মঞ্জু হাতের ইশারায় উপরের র‍্যাক দেখান।

"আমি এত লোকের জন্য কখনও ধোঁকার ডালনা রাঁধিনি," কড়ায় তেল ঢালতে-ঢালতে বলে মধুরা।

"তোমাকে তো কেউ রাঁধতে বলেনি!" শান্ত গলায় বললেন মঞ্জু।

মধুরার হাত কেঁপে সামান্য বেশি তেল কড়ায় পড়ে গেল, "সরি! প্লিজ়, কিছু মনে করবেন না!" তেলের ক্যান পাশে রেখে দু'পা পিছিয়ে আসে সে, "আমি... আমি...অত্যন্ত দুঃখিত," বলে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে দরজার দিকে দৌড়য়।

"ও মেয়ে, পালাচ্ছিস কোথায়?" পিছন থেকে হাঁক পাড়েন মঞ্জু, "তেল গরম হয়ে গেছে, ধোঁকার টুকরোগুলো ভেজে দিয়ে যা! আধখানা কাজ করে পালাস না!"

মধুরার নিজেকে খুব ছোট বলে মনে হচ্ছে। কী দরকার ছিল হ্যালোর মতো রান্নাঘরে ঢুকে পড়ার? সকলে যে-যার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তার মধ্যে নিজের বিদ্যে জাহির করার কী দরকার ছিল? মঞ্জু ধরেই নিয়েছেন, সে এই বাড়ির বউ হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে! নিজেকে এত নীচে নামানোর প্রয়োজন ছিল না। যাক, যা গন্ডগোল বাধানোর বাধিয়ে ফেলেছে। এখন ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে হবে। মঞ্জুকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, শুভ্রকে নিয়ে তার কোনও আগ্রহ নেই। রান্না করতে ভাল লাগে, তাই হাত লাগিয়েছিল। আবার বার্নারের কাছে গিয়ে দেখে, তেল গরম হয়ে গিয়েছে। ৬০ টুকরো ধোঁকা অল্প আঁচে ভেজে তোলা মুখের কথা নয়। চার বারে ভাজতে হল।

মঞ্জু ধোঁকাগুলো খবরের কাগজের উপরে বিছিয়ে দিয়ে বললেন, "এবার কী নিবি?"

"জিরে ফোড়ন দিন," বলে মধুরা।

"তুই এদিকটা সামলা। আমি ততক্ষণে দেখি, ভাত কত দূর এগোল," মধুরার রন্ধনৈপুণ্যে খুশি হয়ে রান্নার দায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপিয়ে মঞ্জু অন্য দিকে চলে যান। মধুরা আধথেঁতো গরমমশলা আর তেজপাতা দিয়ে ভাল করে নেড়ে নিল। আদাবাটা আর টোম্যাটো দিয়ে কষে পরিমাণমতো জল আর নুন দিল। এত জন লোকের জন্য কতটা নুন লাগে, কে জানে বাবা! মধুরা কম নুন দিল। নুনে পোড়া হওয়ার চেয়ে আলুনি হওয়া বেটার। কারেকশনের স্কোপ থাকে।

বেড়ে গন্ধ বেরিয়েছে! ফুটন্ত ঝোলের সুঘ্রাণ নিল মধুরা। পরে আরও একটু গরমমশলা দিলে আরও খুলবে। গ্যাস বার্নারের উপরের ক্যাবিনেটে মশলার কৌটো খুঁজছে, এমন সময় মঞ্জু হাজির।

"তুই উপরে যা। বাকিটা আমি করে নিচ্ছি।"

"হয়েই তো গেছে। আমি সামলে নেব," কথাটা বলে ফেলে মনে-মনে জিভ কাটল মধুরা। আবার একটা বাজে কথা বলে ফেলল সে! মঞ্জু নির্ঘাত খচে বোম হয়ে গেলেন! কিন্তু কী আর করা! ধোঁকার ডালনার ভাল-মন্দের সম্পূর্ণ দায় সে নিজে নেবে। খেতে বসে কেউ যদি বলে, "টেস্টটা কেমন যেন লাগছে। গরম মশলা কি বেশি দিয়ে ফেলেছ?" মধুরা সেটা জাস্ট নিতে পারবে না।

হলুদ আর লঙ্কাগুঁড়ো পরিমাণমতো ছড়িয়ে, কড়ায় ঢাকনা চাপা দিয়ে গ্যাস বন্ধ করে মধুরা। ব্যবহৃত বাসন সিঙ্কে রেখে, টেবিল টপ পরিষ্কার করে, চিমনি বন্ধ করে মঞ্জুকে বলে, "আপনাদের ফ্ল্যাট কত তলায়?"

"আমার কর্তা ডাইনিং রুমে তোর জন্য অপেক্ষা করছে," চাটনির জন্য আমসত্ত্ব স্লাইস করতে-করতে বললেন মঞ্জু।

ডাইনিং রুম দেখে মনে হয় বিয়েবাড়ির খাওয়াদাওয়া হবে! একগাদা টেবিল পাতা। তাদের ঘিরে আরও একগাদা চেয়ার। সেখানেই একটা চেয়ারে বসেছিলেন গুরুপদ। পুলিশের বড় কর্তা 'পারিজাত' সাহিত্য পত্রিকা পড়ছে। মধুরাকে দেখে বললেন, "চলো, আমরা উপরে যাই। শুভ্র

ওর কাকার ফ্ল্যাটে গেছে।"
চার তলায় গুরুপদ-মঞ্জুর ফ্ল্যাটটা মেরে-কেটে ৮০০ স্কোয়ার ফুটের। একটা ড্রইংরুম, একফালি ঠাকুঘর, অ্যাটাচড বাথরুমসহ দুটো বেডরুম আর দুটো ঝুলবারান্দা। এই ফ্ল্যাটে কোনও কিচেন বা ডাইনিং স্পেস নেই। পুরো ফ্ল্যাটের দেওয়াল সাদা রঙের। মেঝেয় সাদা পাথর। জানলার পর্দা, বেডকভার আর সোফায় হলুদ-সবুজ রঙের ছোঁওয়া। এক ঝলকে পুরো ফ্ল্যাটটা দেখে নিয়ে মধুরা বলল, "বাঃ! দারুণ!"
"আমার করা ইন্টিরিয়র!" গর্বের সঙ্গে বললেন গুরুপদ, "ডাইনিং স্পেস বা কিচেন রাখিনি। তবে ফ্রিজ, ইন্ডাকশন ওভেন আর ইলেকট্রিক কেটলি রাখা আছে। আমার মাঝে-মাঝে চা খেতে ইচ্ছে করে।"
"ওঃ!" হঠাৎ কথা ফুরিয়ে যায় মধুরার। বাবার বয়সি একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে কী বিষয়ে কথা বলবে বুঝতে না পেরে, সোফার কোণে বসে পড়ে। এদিকওদিক তাকিয়ে টেবিলে রাখা "পারিজাত" পত্রিকা তুলে নেয়। এসব হাই ব্রাও ম্যাগাজিন তার পছন্দের তালিকায় পড়ে না। কিন্তু এখন কোনও উপায় নেই। মিনিটপাঁচেকের মধ্যে শুভ্র আর মঞ্জু একসঙ্গে ঢুকল। মঞ্জুর হাতের বাটিতে ধোঁকার ডালনা। সেখান থেকে একপিস তুলে নিয়ে শুভ্র মুখে পুরেছে। সেটা তার মুখ চালানো দেখে বোঝা যাচ্ছে।
"খেয়ে দ্যাখো," গুরুপদর হাতে বাটি তুলে দিয়ে মঞ্জু বলল, "দত্তবাড়ি ঢুকে অন্য কোথাও না গিয়ে মধুরা আগে হেঁশেলে ঢুকেছিল।"
একটু আগে মনে-মনে জিভ কেটেছিল মধুরা। এবার প্রকাশ্যে কাটল। বাটি হাতে নিয়ে গুরুপদ বলল, "শুভ্র, ওকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখা। সকলের সঙ্গে আলাপ করা। আমি ততক্ষণ এটা চেখে দেখি।"
"পুরোটা খাবে না। আমার জন্য এক পিস রাখবে," স্বামীকে মৃদু শাসান মঞ্জু।
শুভ্রর সঙ্গে বেরিয়ে ছাদ থেকে দত্ত ম্যানসন দেখতে শুরু করে মধুরা। ছাদে জলের ট্যাঙ্ক ছাড়াও চমৎকার রুফ গার্ডেন আছে। গাছপালায় মধুরার আগ্রহ নেই। এত বড় ছাদ-বাগান মেনটেন করার পিছনে যথেষ্ট অর্থ এবং শ্রম দান করতে হয়, সেটা বুঝতে কোনও বুদ্ধি লাগে না। মধুরা সবচেয়ে খুশি হল ছাদে বসানো তন্দুর দেখে, "গ্রেট!" তন্দুরের গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় সে।
পাঁচতলায় শুভ্রর ঠাকুরমার সঙ্গে আলাপ হল। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে কাগজ পড়ছিলেন তিনি। মধুরাকে দেখে মিটিমিটি হেসে, অর্থপূর্ণ ঘাড় নেড়ে, শুভ্রকে কাছে ডেকে কানে-কানে কীসব ফিসফিস করে বললেন, মধুরা শুনতে পেল না বটে, তবে বুঝতে পারল শুভ্র হাসি চাপার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।
"কী বললেন?" পাঁচতলা থেকে চারতলায় নামতে-নামতে প্রশ্ন করল মধুরা।
"পরে বলব," হাসতে-হাসতে মেজ কাকার দরজায় কলিং বেল টেপে শুভ্র।
তিন কাকা-কাকিমা এবং তাদের একগাদা ছানাপোনার সঙ্গে দেখা করে মধুরার সব গুলিয়ে গেল। কে কার বাবা, কে কার মা, কার কী নাম — সব ভুলে গেল। ঘড়ি দেখল মধুরা। সাড়ে বারোটা বাজে। এবার বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। গুরুপদ-মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করে সে কাটবে।
শুভ্রর সঙ্গে ফ্ল্যাটে ঢুকে মধুরা দেখল, মঞ্জু হাসি-হাসি মুখে গুরুপদর দিকে তাকিয়ে আছেন। গুরুপদ মোবাইলে কথা বলছেন।
"শুভ্র যখন ঠিক করেছে, তখন আমরা বলার কে? আজকাল জমানা বদলে গেছে, গুরুজনের কথা কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। তবে আমাদের ফ্যামিলিটা অন্যরকম। জয়েন্ট ফ্যামিলিতে মানিয়ে নেওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। স্বাধীন মানে 'স্ব'-এর অধীন, অর্থাৎ নিজের অধীন, তা সকলে বুঝতে পারে না। যথেচ্ছাচারের সঙ্গে গুলিয়ে ফালে," মধুরাকে দেখে কথার ট্র্যাক বদল করে গুরুপদ বলেন, "এই তো আপনার মেয়ে এখন এল। কথা বলবেন?" তারপর মোবাইলটা মধুরার দিকে বাড়িয়ে দেয়।
মধুরা ফোন ধরে বলে, "হ্যালো?"
"তোর রান্না করা ধোঁকার ডালনা খেয়ে ওঁরা তো খুব খুশি," গদগদ কণ্ঠে বলছে যুথিকা, "ওঁরা কবে আমাদের বাড়ি আসবেন, জেনে নে। ফেরার আগে সকলের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করিস..." আরও কীসব বকবক করছিল যুথিকা। না শুনে ফোন কেটে দিল মধুরা। এরকম একটা কিছু যে হতে চলেছে সে জানত! সে জেনে বুঝেই সালোয়ার-কামিজ পরেছে, নাকের নোলক খুলেছে। ধোঁকার ডালনাটাও জেনে বুঝে রেঁধেছে কি? নাঃ। ওটা আপনাআপনি হয়েছে!
মোবাইল বাজছে। ক্লাচ থেকে মোবাইল বের করে মধুরা পর্দার দিকে তাকায়। দিয়া ফোন করেছে। অলরেডি যুথিকার কাছ থেকে খবর পৌঁছে গেছে? এবার কি অভিনন্দন বার্তা শুনে 'ধন্যবাদ' বলতে হবে? উফ! ইরিটেটিং! কানে ফোন দিয়ে মধুরা বলে, 'হ্যালো?'
"শোন, এখনই একটা খবর পেলাম। স্টার চ্যানেলের পক্ষ থেকে একটা কুকারি কম্পিটিশন লঞ্চ হচ্ছে। এটা বাংলা টেলিভিশনের সবচেয়ে বড় রিয়্যালিটি শো হতে যাচ্ছে। দুর্গেশ ফিল্মস প্রোডিউস করছে। ইট উইল বি আ্যা ল্যাভিশলি মাউন্টেড অ্যাফেয়ার। ইউ গিভ ইট আ শট!"
মধুরার শরীর জুড়ে রক্তকণারা নাচানাচি শুরু করে দেয়। অ্যাড্রিনালিন রাশের কারণে কান গরম, গাল গরম, ঘাড় দপদপ করছে! উত্তেজনা কাকে বলে, সারা শরীর দিয়ে অনুভব করছে সে।
এখন এখানে উত্তেজনা দেখানো চলবে না। মধুরা নিচু গলায় বলল, "কীভাবে যোগাযোগ করব?"
"আজকের কাগজে অ্যাড বেরিয়েছে। আজ যেসব ম্যাগাজিন বেরিয়েছে, তাতেও অ্যাড আছে। একটা টোল-ফ্রি নম্বর আছে। সেটায় ফোন করে নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে।"
আজকের ম্যাগাজিন? একটু আগে পারিজাত পত্রিকা উল্টেছিল মধুরা। ওটা আজই বেরিয়েছে। এখনই বাগাতে হবে। লাইন কেটে ক্লাচে ঢুকিয়ে মধুরা বলে, "আমি তা হলে আসি?"
হাঁ-হাঁ করে ওঠেন মঞ্জু, "খেয়ে যাবি না?"
"না, বাড়িতে রান্না করেছে," মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে মিনতি করে মধুরা। মঞ্জু বলেন, "ঠিক আছে। শুভ্র, ওকে দমদম পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আয়। তুই ফেরার পরে আমরা খেতে বসব।"
"আচ্ছা," বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নাড়ে শুভ্র।
'পারিজাত' হাতে নিয়ে গুরুপদর দিকে তাকিয়ে মধুরা বলে, "এই ম্যাগাজিনটা নেব? আসলে একটা গল্প পড়ছিলাম। খুব ইন্টারেস্টিং। শেষ হয়নি..."
"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাও না।" গুরুপদ সাগ্রহে বলেন, "তোমারও আমার মতো বাংলা গল্প-উপন্যাসে আগ্রহ আছে বুঝি? আর একটা রেয়ার স্পেসিমেন পাওয়া গেল!"
"না। মানে, ওই আর কী..." 'পারিজাত' হাতে নিয়ে সবাইকে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরয় মধুরা। পাশে শুভ্র। মধুরা প্ল্যান ছকে ফেলেছে। শুভ্র যখন বাইক চালাবে, তখন বিজ্ঞাপন থেকে টোল-ফ্রি নম্বরটা খুঁজে বের করবে সে। দমদম স্টেশনে ম্যাগাজিনটা শুভ্রকে ফেরত দিয়ে স্টেশন থেকেই নম্বরে ফোন করবে।
টেলিভিশনে ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সব চেয়ে বড় কুকারি কম্পিটিশন লঞ্চ হচ্ছে। মধুরা নাম দেবে না, এ কখনও হতে পারে!

৮

রিয়্যালিটি শোয়ের নাম 'পাঁচফোড়ন।'

সোম থেকে শুক্র, সপ্তাহে পাঁচদিন এই শো টেলিকাস্ট হবে স্টুপ টিভিতে। অডিশন থেকে ফাইনাল রাউন্ড, পুরোটাই টেলিকাস্ট করা হবে। নাচ, গান, কমেডি, গেম শো, কুইজ, নিউজ অ্যাঙ্কর হান্ট, এসবের পরে বাংলার রিয়্যালিটি টিভির স্বাদ বদলাতে বাজারে আসছে 'পাঁচফোড়ন।' টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করতে একটা মহিলা ফোন ধরেছিল। মধুরার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর লিখে নিয়ে সে বলল, "অডিশনের জন্য সাত দিনের মধ্যে আপনাকে ফোন করা হবে। অফিস আওয়ারে ফোন বন্ধ রাখবেন না।" মধুরার ফোন ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকে। ফোন এল পরদিন দুপুরবেলা। হাওড়ার গ্রিনল্যান্ড ক্লাবে সাত দিন পরে অডিশন। সকাল নটার মধ্যে পৌঁছতে হবে। সঙ্গে যেন পরিচয়পত্র থাকে।

নির্দিষ্ট দিনে গ্রিনল্যান্ড ক্লাবে পৌঁছে মধুরার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়! অন্তত এক হাজার লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, যুবক-যুবতী...সব বয়সের মানুষ উপস্থিত। লাইনে দাঁড়িয়ে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, উর্দু, মাড়োয়াড়ি, গুজরাতি এবং গুরমুখি ভাষা শুনে চিনতে পারল মধুরা। দক্ষিণ এবং উত্তর পূর্বের রাজ্য থেকেও কিছু প্রতিযোগী রয়েছে। তারা কোন রাজ্যের এবং কোন ভাষায় কথায় বলছে, আইডেন্টিফাই করতে পারল না! মাথায় ছাতা দিয়ে সে ফুটপাতে বসে পড়ল। গ্রিনল্যান্ড ক্লাব থেকে লাইন বেরিয়ে, ফুটপাত বরাবর এগিয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে। মধুরা মনে-মনে ঠিক করে, সে দু' ঘণ্টা অপেক্ষা করবে। তার মধ্যে লাইন না এগোলে, বাড়ির দিকে রওনা দেবে।

বাড়ির কথা মনে পড়ায় তেতো হাসি ফুটে ওঠে মধুরার মুখে। 'পাঁচফোড়ন'-এর অডিশনে নাম দেওয়া নিয়ে গত সাত দিনে ভৌমিক ভবনে চূড়ান্ত অশান্তি হয়েছে। মেয়েদের স্বাধীনতা, পুরুষতন্ত্র, ফেমিনিজম — এসব ব্যাপার সম্পর্কে তার কোনও আগ্রহ ছিল না। এগুলোর মানে জানতে কখনও আগ্রহ বোধ করেনি। গত সাত দিনের অভিজ্ঞতায় এই সচেতন অজ্ঞতা জোরসে ধাক্কা খেয়েছে। এত দিন আপন মনে ওড়াউড়ি করার পরে মধুরা বুঝতে পেরেছে, উড়ানটা ছিল খাঁচার ভিতরে। খুব বড়, কিন্তু খাঁচা! সোনার তৈরি, কিন্তু খাঁচা! প্রথম আপত্তি এল যুথিকার কাছ থেকে, "চাকরিতে ফাঁকি দিয়ে টিভিতে রান্না করতে যাবি? তোর মাথা খারাপ নাকি?" একথায় পাত্তা দেওয়ার মেয়ে মধুরা নয়। সে কানে ইয়ার প্লাগ গুঁজল।

যুথিকা ছোড়নেওয়ালি নয়। হাঁটুর ব্যথা ভুলে চেঁচাতে লাগল, "এখন আর তোমার একার ইচ্ছেয় সব কিছু চলবে না। আজ বাদে কাল বিয়েতে বসতে চলেছ। দু'-দুটো পরিবারের সুনাম তোমার সঙ্গে জড়িয়ে। দত্তবাড়ির অনুমতি না নিয়ে এই সব তুমি করবে না।"

মনোহর বিড়ি ফুঁকছিল। সে বলল, "আমি তোদের জেনারেশনের একটা নাম দিয়েছি।"

ইয়ার প্লাগ খুলে মধুরা বলল, "কী নাম?"

"অ! তার মানে, তুই কানে পুঁটলি গুঁজে গান শুনছিলি না," ফুরফুর করে ধোঁয়া ছেড়ে বলে মনোহর, "আমাদের পাত্তা না দেওয়ার অ্যাক্টিং করছিলি! তা বেশ।"

"যা বলছিলে, বলো। কোন জেনারেশনের কথা বলছ?"

"তোদের কথা। কানে তার গোঁজা জেনারেশনের কথা। আমাদের অস্বীকার করা ছাড়া যাদের আর কোনও কাজ নেই। আমাদের সময়ে জেনারেশন গ্যাপ হত সিকি শতকের ব্যবধানে। পরে সেটা কমে দাঁড়াল ২০ বছরে। ৪৫ বছরের বাবা ২৫ বছরের ছেলের হালচাল বুঝতে পারছে না। তারপর সেটা কমে হল ১০ বছর! ৩০ বছরের কাকা ২০ বছরের ভাইঝিকে বুঝতে পারছে না! এখন সেটা দাঁড়িয়েছে চার বছরে। ২৫ বছরের দাদা ২১ বছরের বোনকে বুঝতে পারছে না। জেনারেশন গ্যাপ কমানো এই প্রজন্মের আমি একটা নাম দিয়েছি..."

"কী নাম দিলে? সব তো পপ সোশিওলজিস্টদের কাজ।"

মুচকি হেসে মনোহর বলে, "জেন জি।"

"অ্যাঁ?" মধুরা অবাক, "জেন এক্স, জেন ওয়াই, জেন নেক্সট অবধি জানি। জেন জি-টা কী?"

"জি ফর গ্যাপ। জেনারেশন গ্যাপ।"

"যত্ত বাজে কথা," মনোহরকে ধমক দেয় মধুরা। কিন্তু মনে-মনে ফ্রেজটা পিক আপ করে। পরে শুভ্রকে ছাড়তে হবে। মনোহরকে প্রশ্ন করে, "২১ বছরের বোন আর ২৫ বছরের দাদা বলতে তুমি কি আমাকে আর দাদাকে মিন করলে?

দাদারও এই শো নিয়ে আপত্তি আছে?"

"আছে। দিয়ার সঙ্গে বিস্তর খটাখটি লেগেছে তার। দিয়া কেন তোকে এই শো-এর কথা বলল? কেন পাগলকে সাঁকো নাড়া দিল?"

"তোমাদের এগজ্যাক্ট আপত্তিটা কী নিয়ে বলো তো? আমি বাড়িতে রান্না করলে তোমরা 'বাঃ-বাঃ' করবে আর টেলিভিশনের পর্দায় রাঁধলে দুয়ো দেবে, এই হিপোক্রিসি আমি বুঝতে পারছি না! তুমি সারা জীবন মিষ্টির দোকান চালালে। লোককে খাইয়ে বড়লোক হলে। তুমি এরকম বলছ?"

"পাঁচফোড়নের ফাইনাল রাউন্ডে যে ১০ জন উঠবে, তাদের পুরস্কার কী?" আর একটা বিড়ি ধরিয়ে প্রশ্ন করে মনোহর।

"পুরস্কার..." মাথা চুলকোয় মধুরা। এই ব্যাপারটা তার মাথাতে আসেনি। নাম দেবে, রান্না করবে, এই তার পুরস্কার। বিজ্ঞাপনে কীসব যেন লেখা ছিল 'টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস"-এর মধ্যে।

"মন দিয়ে পড়িসনি। দেই-দেই করে অডিশন দিতে যাচ্ছিস! বেয়াক্কেলে জেন জি!" মধুরাকে পাশে বসায় মনোহর, "যে দু'জন ফার্স্ট আর সেকেন্ড হবে, তারা পাবে পাঁচ লাখ আর তিন লাখ টাকার চেক। বাকি আট জন পাবে বিভিন্ন কোম্পানির গিফ্‌ট হ্যাম্পার। প্রথম দু'জন স্টুপ টিভির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকবে আগামী এক বছর। ওরা এই দু'জনকে চ্যানেলের যে-কোনও শো-তে ডাকবে। তখন বিনা পয়সায় কাজ করে দিয়ে আসতে হবে। লাখ টাকার গাজর দেখিয়ে এক বছর গাধার খাটুনি খাটাবে। তোকে এর জন্য চাকরি থেকে যখন তখন ছুটি নিতে হবে।"

"শুনে আমার খুব এক্সাইটিং লাগছে। তোমরা এতে আপত্তি করছ কেন?"

"নতুন চাকরিতে অত ছুটি নিলে চাকরি থাকবে না। তখন খাবি কী?" যুথিকা ক্যাট-ক্যাট করে প্রশ্ন করল। সে এতক্ষণ বাপ-মেয়ের বাকযুদ্ধ শুনছিল।

"এত দিন যেখানে খাচ্ছি। বাপের হোটেল," কানে আবার ইয়ার প্লাগ গোঁজে মধুরা।

ফুটপাতে ছাতা মাথায় বসে থাকতে-থাকতে এসব কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। মনোহর-যুথিকার সঙ্গে কথা কাটাকাটির পরে দিয়াকে ফোন করেছিল মধুরা। সে অত্যন্ত বিরক্ত। গজগজ করে বলল, "ওয়েলকাম টু রিয়্যাল ওয়ার্ল্ড বেবি! পিতৃতন্ত্রে স্বাগতম!"

দিয়ার কাছ থেকে কিছু জানতে পারেনি মধুরা। সপ্তাহের মাঝখানে একদিন কৃশানু রাজচন্দ্রপুরে থাকতে এল। রাতের খাওয়াদাওয়ার পরে দাদাকে চেপে ধরে মধুরা, "কী ব্যাপার দাদা? 'পাঁচফোড়ন'-এ পার্টিসিপেট করা নিয়ে তোর আপত্তি কীসের?"

"না...মানে...আমার সেরকম আপত্তি নেই," আমতা-আমতা করে কৃশানু।

"আপত্তি তা হলে কার?"

আবার কিছুক্ষণ আমতা-আমতা করে কৃশানু বলে, "কম্পিটিশনে নাম দেওয়ার আগে তুই শুভ্রর সঙ্গে কথা বলেছিলি?"
"কেন? শুভ্রর সঙ্গে কেন কথা বলব?"
"শুভ্রর আপত্তি আছে।"
মধুরা খেপে লাল! ষড়যন্ত্রের এই রিলে রেসের ব্যাটনটা একদম গোড়ায় কার হাতে ছিল, সেটা জানতে যুথিকা, মনোহর, দিয়া, কৃশানুকে টপকে সে শুভ্রর কাছে পৌঁছয়। অফিসে পৌঁছে শুভ্রকে বলে, "আমি 'পাঁচফোড়ন'-এ নাম দিলে তোমার কীসের আপত্তি?"
"আমার আপত্তি?" ঘ্যাম নিয়ে বলে শুভ্র, "এই ভুলভাল ইনফরমেশন তোমায় কে দিল?"
"তোমার তা হলে আপত্তি নেই?" উত্তর না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করে মধুরা।
"না...মানে আমার যে আপত্তি নেই, তা নয়। তবে মূল আপত্তি মায়ের।"
মঞ্জু? অবাক হয়ে ভাবে মধুরা! যে নিজের রান্নাঘর নিমেষে মধুরার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল, যে তার রান্না করা ধোঁকার ডালনার প্রশংসা করছিল, সে আপত্তি করছে? কেন?
"কেন?" মনের প্রশ্নটা মুখে এনে ফেলে মধুরা।
"আমাদের ফ্যামিলি কনজার্ভেটিভ নয়। বাড়ির বউদের চাকরিবাকরি করা নিয়ে কোনও প্রবলেম নেই। কিন্তু টেলিভিশন শো, সিনেমা, এসব নিয়ে আপত্তি আছে। দত্ত পরিবারের বউ মেয়েরা এসব লাইনে নামে না।"
"লাইনে? নামে না?" ঠান্ডা মাথায় বলে মধুরা।
"লাইন মানে রাঁধুনিগিরি। তুমি সব কথার টারা মানে কোরো না প্লিজ! তুমি রান্না করতে ভালবাস, দ্যাট্স ডিফারেন্ট। বাড়িতে করো না যত খুশি। কিন্তু কখনও কোনও মহিলা শেফ দেখেছ? সঞ্জীব কপূরের নাম জান। একজন মহিলা শেফের নাম বলো তো?"
"কলকাতায় রাখিপূর্ণিমা দাশগুপ্ত আর লাভি বর্মন। ন্যাশনাল লেভেলে তরলা দালাল আর মধুর জাফরি। ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে নাইজেলা লসন..." গড়গড় করে পাঁচটা নাম আউড়ে দেয় মধুরা।
"ওফ! তোমায় নিয়ে পারা যাবে না। এখন আমি মাকে কী বলি?"
সিচুয়েশনটা ঠান্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করে মধুরা। সব সময় প্রতিবাদী হয়ে লাভ হয় না। কখনও বাঁকা আঙুলে ঘি তুলতে হয়। সে শুভ্রকে বলল, "ওঁকে কিছু বলার দরকার নেই। চুপচাপ থাকো। আমি অডিশনেই আউট হয়ে যাব। ওদের যখন কথা দিয়েছি, তখন রাখা উচিত।"
"আচ্ছা?" কনভিন্সড না হয়ে বলে শুভ্র, "তুমি যেরকম খেপি, ঠিক কোনও রকম ম্যাজিক করে অডিশনের বেড়া টপকে মূল প্রোগ্রামে ঢুকে পড়বে!"
"হারার জন্য কেউ কম্পিটিশনে নাম দেয়?" হাসতে-হাসতে লগ ইন করেছিল মধুরা।

এখন রোদের মধ্যে বসে মনে হচ্ছে, হার-জিত দূরের কথা, সে অডিশন পর্যন্তই পৌঁছতে পারবে না। এক ঘন্টা পেরতে চলল, লাইন এক ইঞ্চিও এগোয়নি। মধুরার চিন্তার মধ্যেই হুড়মুড় করে লাইন এগোতে শুরু করে। মিনিটপাঁচেকের মধ্যে লাইনের দৈর্ঘ্য অর্ধেক। শ' চারেক প্রতিযোগীকে একসঙ্গে গ্রিনল্যান্ড ক্লাবের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন তার অবস্থান গেট থেকে তিন নম্বরে। পরের বারে সে এন্ট্রি পাচ্ছে, এটা শিওর। আকাশে চড়া রোদ। ছাতা মাথায় আবার ফুটপাতে বসে পড়ে মধুরা।
মুভি ক্যামেরা হাতে এক ছোকরা আর চকচকে এক মেয়ে হঠাৎ তাদের সামনে হাজির। মেয়েটাকে চেনে মধুরা। টিভি সিরিয়াল করে। একটা-দু'টো বাংলা সিনেমাও করেছে। নামটা মনে পড়ছে না। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিযোগীরা চিৎকার করল, 'হাই জিজা!'
মেয়েটার নাম জিজা। মনে পড়ে মধুরার। জিজা পরে আছে জিন্স আর ফ্লোরাল প্রিন্টের অফ শোল্ডার টপ। মুখ আর গলায় চড়া মেক আপ। রোগা চেহারার ক্যামেরাম্যান ঘাড়ে ক্যামেরা নিয়ে প্রতিযোগীদের লাইন শুট করছে। মধুরার মতো আরও কয়েকজন ফুটপাতে বসেছিল। তারা টপাটপ উঠে দাঁড়িয়ে, টিসু পেপার দিয়ে মুখ মুছে, চুল ঠিক করে, পজিশন নিল। মধুরা ওঠার প্রয়োজন বোধ করল না। বসে-বসে শুনতে লাগল জিজার পেপটক।
"ইয়ং হার্ট কুকিং অয়েল নিবেদিত অনুষ্ঠান 'পাঁচফোড়ন'-এর অডিশন পর্বে আপনাদের স্বাগত। আজ সোমবার, সপ্তাহের প্রথম দিন। আজ থেকে আগামী পাঁচদিন রাত ন'টা থেকে আপনারা দেখতে পাবেন এই রিয়্যালিটি শো। এ এমন এক রিয়্যালিটি শো, যেখানে নাচ হয় না, গান হয় না, ভাঁড়ামো হয় না! শুধু রান্না হয়। পোস্ত থেকে পাস্তা, ডিমসাম থেকে ডিমের ডেভিল, সন্দর থেকে অম্বল, সব কিছু তৈরি করবে প্রতিযোগীরা। খুন্তি-হাতার এই মহা সংগ্রামে যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করবে, সে পাবে আশারানি কুকিং রেঞ্জের তরফ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার গিফ্ট কুপন, স্টপ চ্যানেলের পক্ষ থেকে তিন লাখ টাকা এবং 'পাঁচফোড়ন'-এর সিক্সন টু-তে মেন্টর হওয়ার সুযোগ। 'পাঁচফোড়ন'-এর বিজেতা পাবে স্টপ চ্যানেলের পক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা, আশারানি কুকিং রেঞ্জের তরফ থেকে এক লক্ষ টাকার গিফ্ট কুপন আর 'পাঁচফোড়ন' সিক্সন টু-তে মেন্টর হওয়ার সুযোগ। গ্রিনল্যান্ড ক্লাবে আমাদের রেজিস্ট্রেশন এবং অডিশন শুরু হয়ে গেছে। আমরা অলরেডি কয়েকজন বাডিং শেফের সঙ্গে কথা বলেছি। এবার কথা বলব আরও কয়েকজনের সঙ্গে। আপনার নাম?"
"গুরুপাল সিংহ, ফ্রম ভবানীপুর," জবাব দেয় ছ' ফুটিয়া, মাঝবয়সি এক সর্দার।
"গুরুপাল, টেল আস সামথিং অ্যাবাউট ইউ। মালাই মারকে!"
জিজার হিংরেজি বাক্যের উত্তরে গুরপাল নির্ভেজাল বাংলায় বলল, "আমি পেশায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। বাড়িতে গিন্নি আর দুই ছেলেমেয়ে। রান্না করা আমার শখ। তাই নাম দিলাম।"
"বল্লে-বল্লে গুরপাল! কৌন সা ডিশ আপ কা ফেভারিট হ্যায়?"
"ফেভারিট মানে কী? যেটা রান্না করতে ভাল লাগে? না, যেটা খেতে ভাল লাগে?"
"দু'টোই বলুন!"
"রান্না করতে ভাল লাগে পঞ্জাবি ডিশ। চিকেন টিক্কা মশালা, পালক পনির। খেতে ভাল লাগে খিচুড়ি আর ডিমভাজা। স্পেশ্যাল বর্ষাকালে।"
বসে-বসে মুচকি হাসল মধুরা। ভাল খেলছে গুরপাল। প্রথম থেকেই বং কানেক্ট এস্ট্যাব্লিশ করছে।
জিজা ইন্টারভিউ নিতে লাইন বেয়ে আরও দূরে চলে গেছে। মধুরার মনে পড়ে গেল অন্য কথা। সুলতানের কথা...
শুভ্রর সঙ্গে কথা বলে সেদিন খানিকটা বিরক্ত আর খানিকটা পাক্কলড হয়ে মেশিন থেকে চারটের সময় লগ আউট করেছিল মধুরা। হাজির হয়েছিল ক্যালকাটা ধাবায়। পারুল আর মন্টু মিলে চিংড়ি মাছের খোসা ছাড়াচ্ছিল। মধুরাকে দেখে পারুল বলল, "কী গো? এত দিন পরে মনে পড়ল? আপিসে খুব কাজের চাপ?"
বেঞ্চিতে বসে মধুরা বলে, "সুলতানদা কোথায়?"
"চিংড়িঘাটার মোড়ে নারকেল কিনতে গেছে। আইসিএমের পার্টিতে চিংড়িমাছের মালাইকারি পাঠাতে হবে।"
"ক'টা ডিশ?" অভ্যাসবশত প্রশ্ন করে মধুরা।
"সত্তর," জবাব দেয় মন্টু।

এই সময় সুলতানের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, "পটের বিবি যে! এত দিন বাদে কী মনে করে?" বড় এক বস্তা নারকেল স্টুটারের পিছনে বসিয়ে ধাবার সামনে বাইক দাঁড় করাচ্ছে সুলতান। মধুরা আর মন্টু মিলে নারকেলের বস্তা নামাতে লাগল।

নারকোল কুরুনি দিয়ে নারকোল কুরোতে-কুরোতে মধুরার কাছ থেকে 'পাঁচফোড়ন' এবং দন্তবাড়ির রিঅ্যাকশানের গল্পো শুনে নিল সুলতান। কোনও মন্তব্য করল না। পারুল অবশ্য নাছোড়বান্দা। সে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগল, "শুভ্র? মানে যার সঙ্গে তুমি প্রথম দিন এখানে এসেছিলে? যা-ই বলো বাপু, ছেলেটাকে দেখতে খুব সুন্দর। আচ্ছা, ঘরদোর কেমন? ননদ-ভাশুর আছে নাকি? শ্বশুরশাশুড়ির মিষ্টি কথায় ভুলো না। বিয়ের পরে সবাই বদলে যাবে..." এই জাতীয় মন্তব্যে মধুরাকে উত্ত্যক্ত করে মারল।

সুলতানের নারকেল কোরা শেষ। কোরা নারকেলের ঝুড়ি নিয়ে সে ব্লেন্ডারের কাছে গেল। পাত্রে কোরা নারকোল দিয়ে, ঢাকনা লাগিয়ে, সুইচ অন করে বলল, "এখনও শাউড়ি হয়নি। ফিউচারে হবে। তার এত ফোঁপরদালালি কেন?"

ঘর-ঘর করে ব্লেড ঘুরছে। নারকেল থেকে জন্ম নিচ্ছে দুধ। স্বচ্ছ পাত্র এখন দুধের ফোঁটায় ধবধবে সাদা। মেশিন থরথর করে কাঁপছে। এত আওয়াজে কথা বলা যায় না। মধুরা চুপ করে রইল।

সুইচ অফ করে, ঢাকনা খুলে, নারকেলের দুধ বড় ডেকচিতে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে, ছিবড়ে অন্য পাত্রে রাখে সুলতান। ব্লেন্ডারে আবার নারকেল কোরা ঢালে, "কী ভাবছিস? মুখ থমথমে কেন?"

আবার ঘরঘর আওয়াজ। আবার মেশিনের থরথর কম্পন। আবার দুধ ঢালা। আবার ছিবড়ে ফেলা। মধুরা চুপ।

"আমার কাছে কেন এসেছিস? কাঁদুনি গাইতে?" ব্লেন্ডারে আবার নারকেল ঢালছে সুলতান, "বাঙালিরা একটা গান ভাল গায়। কাঁদুনি। আমি শহিদ, দশ জনের অত্যাচারে আমার ট্যালেন্ট নষ্ট হয়ে গেল, কেউ আমাকে বুঝল না!"

"কাঁদুনি গাইতে আসিনি। এসেছি গেমপ্ল্যান ঠিক করতে। অন ক্যামেরা কীভাবে রান্না করব, একই সঙ্গে হাতা-খুন্তি নাড়া এবং কথা বলা কীভাবে ব্যালান্স করব, এসব শিখতে। অ্যান্ড অ্যাবাভ অল, কী রান্না করব, এটা জানতে!" মেশিনের আওয়াজের দু' পর্দা উপরে গলা তুলে বলে মধুরা।

মেশিন বন্ধ করে সুলতান বলে, "ভিডিও ক্যামেরা এনেছিস?"

"হ্যাঁ," ব্যাগ থেকে হ্যান্ডিক্যাম আর মেকআপ কিট বের করে মধুরা।

"তা হলে এখন থেকেই শুরু কর," ব্লেন্ডারের ঢাকনিতে হাত চাপা দিয়ে বলে সুলতান, "আমাকে ওই যন্তরটা চালানো শিখিয়ে দে। প্রথম-প্রথম একটু গুবলেট করব। তারপর ঠিক হয়ে যাবে।"

"তোমরা চিংড়িমাছ নিয়ে ছ্যাবলামো কোরো না। ওটা বাজে হলে আইসিএম আর বরাত দেবে না," ঝাঁঝিয়ে ওঠে পারুল।

"তুমি পাগল হলে গিন্নি?" হাসতে-হাসতে বলে সুলতান, "ওটা তুমি রাঁধবে। আমি তোমার ছবি তুলে-তুলে ক্যামেরায় হাত সেট করব। ততক্ষণে মধু সাজুগুজু করুক।" গত ছ'দিন বিকেল চারটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কেটেছে ক্যালকাটা ধাবায়। রান্না করে, ছবি তুলে, সেই ছবি দেখে, সুলতানের ধাতানি আর কিল খেয়ে। সতেজ সবজি, ফ্রেশ মাছ-মাংস-মশলাপাতি কেনা, সবজির খোসা ছাড়ানো ও ডাইস করা, পোলট্রির পারফেক্ট কাট রপ্ত করা, মাছের ডি-বোনিং করা, মশলা পেষা ও বাটা, বাঙালি ডাল-ভাত থেকে দক্ষিণী ইডলি-দোসা-সম্বর, রাজস্থানি দাল-বাটি-চুরমা থেকে পাস্তা-পিৎজা-বার্গার...সব রেঁধেছে মধুরা। রেঁধেছে আর ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বকবক করেছে। ভাত রাঁধতে-রাঁধতে বলেছে চালের রকমফের। কাকে বলে সেদ্ধ আর আতপ চাল, কাকে বলে পার বয়েলিং। ডাল রান্না করতে-করতে মুগ, মুসুর, অড়হর, কলাই, খেসারির ডালের খাদ্যগুণ নিয়ে তুলামূল্য বিচার করেছে। একই সঙ্গে মাথায় রেখেছে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল, আলোর সোর্স, ফ্রেমিং। লং শটে বেশি হাত-পা নেড়েছে। মিড-লং শটে মুখ দিয়ে অভিনয় করেছে এবং এত কিছুর মধ্যে রান্নাগুলো ঠিকভাবে বেঁধেছে। সুলতান ছবি তুলেছে। রান্না এবং শুটিংয়ের শেষে সেই ডিশ চাখতে-চাখতে ছবি রিওয়াইন্ড করেছে দু'জনে। কখনও চাটনিতে চিনি কম হয়েছে বলে পিঠে হাতার বাড়ি খেয়েছে মধুরা। কখনও ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ননস্টিক কড়াইতে তেল ঢালতে গিয়ে বাইরে তেল গড়িয়ে যাওয়ার জন্য তাকে শুনতে হয়েছে সুলতানের গালাগালি, "পটের বিবি সেজে চুল বাঁধলেই চলবে না, রাঁধতেও হবে। না হলে দূর করে দেব।"

রাগে মধুরার মাথা দপদপ করছে। কিন্তু মিষ্টি হাসি ঠোঁটের উপর সেলাই করে সে বলেছে, "এরকম ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি নতুন রাঁধুনিদের হতেই পারে। তাই হাতের কাছে মজুত রাখবেন টিসু পেপার। যাতে রান্না করতে-করতেই বার্নারের চারপাশটা পরিষ্কার করে ফেলা যায়। যেমন আমি করলাম।" তেলে ভেজা টিসু পেপার ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে সে রান্না করতে থাকে, যেন কিছুই হয়নি! পারুল আর মন্টু হাততালি দিয়ে হাসতে থাকে।

গত ছ'দিন অফিস থেকে চারটের সময় বেরিয়েছে মধুরা। প্রথম তিন দিন সমস্যা হয়নি। অ্যানি সামলে দিয়েছিল। কিন্তু একা অ্যানি কত দিন দু'জনের লোড টানবে। সে শুভ্রকে রিপোর্ট করতে বাধ্য হয়েছে। চতুর্থ দিন ফার্স্ট আওয়ারে শুভ্রর তলব, "কী ব্যাপার? রোজ চারটের মধ্যে বেরিয়ে গেলে কী করে চলবে?"

অফিসের বাইরে হলে মধুরা উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করত না। কিন্তু এখানে শুভ্র তার বস। মধুরা বাধ্য হয়ে বলেছে, "আগামীকালও আমি আগে বেরিয়ে যাব।"

"তুমি অত সিএলের জন্য এনটাইটেলড্ নও!"

"তা হলে মাইনে কাটো।"

মাইনে কাটার এক্তিয়ার শুভ্রর নয়। সে এই ঘটনা রিপোর্ট করেছে স্যান্ডিকে। রিপোর্টিংয়ের দশ মিনিটের মধ্যে স্যান্ডির ফোন, "একবার আমার কিউবিকলে এসো।"

রাহুল গোয়েঙ্কার সামনে সেই কেলেঙ্কারির পর থেকে মধুরা স্যান্ডির থেকে দূরে-দূরে থাকে। মিটিং বা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ছাড়া মুখোমুখি হয় না। সেগুলো হয় অনেকের সঙ্গে। আজ একেবারে ওয়ান টু ওয়ান! কাচের কফিনের বাইরে দাঁড়াতেই স্যান্ডি বলল, "ভিতরে এসো।"

মধুরা চেয়ার টেনে বসল।

স্যান্ডি কনসার্নমাখা দৃষ্টিতে মধুরার দিকে তাকিয়ে বলল, "কোনও সমস্যা থাকলে আমার সঙ্গে শেয়ার করো। আই উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট টু হেল্প ইউ।"

মধুরা জানে, এটা ট্র্যাপ। এই মিষ্টি ব্যবহার, এই সহানুভূতি মাখানো চোখ, এই তোমার-জন্য-জান-দিয়ে-দেব অ্যাটিটিউড, সব ফেক! আর পাঁচটা কর্পোরেট কর্মীর মতো এ-ও 'লিভ অ্যান্ড লেট ডাই' তত্ত্বে বিশ্বাস করে। ইনক্রিমেন্ট, টার্গেট আর অ্যাপ্রাইজাল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। অ্যাপ্রাইজাল-ইনক্রিমেন্ট-ডেফিশিয়েন্সি-সিনড্রোমের রোগী। একে বিশ্বাস করা যাবে না।

"কিছু হয়নি!" নিষ্পাপ মুখে বলে মধুরা। "ডোন্ট ডাক দ্য ইস্যু। তোমার সহকর্মী বলছে, তোমার বস বলছে, তুমি প্রতিদিন চারটের মধ্যে লগ আউট করছ। কাজ বাকি

থাকছে। দেয়ার মাস্ট বি সাম রিজন।"
স্যান্ডির কনসার্নকে পাত্তা না দিয়ে মধুরা বলেছিল, "পার্সোনাল রিজনস।"
"ওয়েল," শ্রাগ করে স্যান্ডি বলেছিল, "দেন টেক লিভ। মাইন্ড ইট, এতে টিম স্পিরিট নষ্ট হয়।"
গতকাল পর্যন্ত কাজ করে, আজ ছুটি নিয়েছে মধুরা।

"হাই! তুমি বসে কেন? ডিপ্রেস্‌ড?"
মধুরার চিন্তা সূত্র ছিঁড়ে গেল। তার সামনে এখন জিজা। রোগা ক্যামেরাম্যানটি তার দিকে মুভি ক্যামেরা বন্দুকের নলের মতো তাক করে রয়েছে।
মৃদু হাসল মধুরা, "ডিপ্রেসড নই। এক্সাইটেড।"
"তোমার বডি ল্যাঙ্গোয়েজ তা বলছে না," জিজা ক্যামেরাম্যানকে বলে, "বান্টি, একটু পিছিয়ে যা। লং শট নে।"
বান্টিকে ফ্রেম নিতে দেয় মধুরা। ছাতা মাথার থেকে না নামিয়ে বলে, "বসে-বসে এনার্জি স্টোর করছি। ভিতরে যাওয়ার পরে কাজে লাগবে।"
"দ্যাটস লাইক আ স্মার্ট গার্ল। তোমার নাম কী?"
জিজার প্রশ্নের ফাঁকে গ্রিনল্যান্ড ক্লাবের প্রধান ফটক খুলে গিয়েছে। ভিতরে ঢোকার আগে বান্টির ক্যামেরার দিকে হাত নেড়ে মধুরা বলল, "থ্যাঙ্কস ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট। আমার নাম মধুরা ভৌমিক।"

৯

গ্রিনল্যান্ড ক্লাবে ঢোকার পরে লাইনটা চার ভাগে ভাগ হয়ে গেল। চারটে টেবিল পেতে চারটে টিম বসে রয়েছে। প্রতি টিমে মেম্বারের সংখ্যা দুই। প্রথমজন লিস্ট দেখে নামের পাশে টিক দিচ্ছে, কম্পিউটারে ডেটা এন্ট্রি করছে, ফোটো আই কার্ড স্ক্যান করে ফেরত দিচ্ছে। দ্বিতীয়জন একদিকে আঠা লাগানো কাগজে সিরিয়াল নম্বর লিখে প্রতিযোগীদের বুকে সাঁটিয়ে দিচ্ছে।
মধুরা দু'টো ঘটনা খেয়াল করল। চারটে কম্পিউটার লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক দিয়ে নিজেদের মধ্যে কানেক্টেড।
কাজেই সব ডেটা সব কম্পিউটারে জমা হচ্ছে। দ্বিতীয় ঘটনা হল, বুকে কাগজ সাঁটার কাজটা মহিলা কর্মীরা করছে।
'পাঁচফোড়ন'-এর অর্ধেক প্রতিযোগী মেয়ে। তাদের বুকে কাগজ সাঁটবে, এমন বুকের পাটা ক'জন ছেলের আছে!
মধুরার বুকে কাগজ সাঁটার পরে সিকিওরিটি তাকে নিয়ে গেল শীতাতপনিয়ন্ত্রিত একটা হলঘরে।
প্রতিযোগীদের বসার জন্য অজস্র চেয়ার রয়েছে। এক কোণে চা ও কফি ভেন্ডিং মেশিন। এখানে পনেরো মিনিটের একটা রিটন টেস্ট হবে। মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন। একটা প্রশ্নের চারটে উত্তর, একটা ঠিক, বাকি তিনটে ভুল। ঠিক উত্তরে টিক দিলে চার নম্বর। ভুল উত্তরে টিক দিলে কোনও নম্বর কাটা হবে না। তিরিশটা প্রশ্নের মধ্যে প্রথম প্রশ্ন হল, "ভাত কী থেকে তৈরি হয়?" চারটে চয়েস। চাল, ডাল, বাজরা, জোয়ার। দশ মিনিটের মধ্যে উত্তরপত্র জমা দিল মধুরা। এটা অডিশন না ফ্যালাসি?
এক কাপ কফি নিয়ে করিডরে বেরিয়ে সুলতানকে ফোন করল মধুরা।
"এত তাড়াতাড়ি ফোন করার কী হল? কম্পিটিশন থেকে আউট? না অডিশনের লম্বা লাইন দেখে ব্যাক টু রাজচন্দ্রপুর?"
ফোনের ওপার থেকে ধমক ভেসে এল।
"কোনওটাই নয়," বিরক্ত হয়ে বলে মধুরা, "এত ক্ষণ কী হল জানাতে ফোন করলাম।"
"বাজে কথা শোনার সময় নেই!" ফোন কেটে দিয়েছে সুলতান।
বেজার মুখে কফিতে চুমুক দেয় মধুরা।
ইয়ারপ্লাগ গুঁজে অকারণে দু'টো গান শোনে। হঠাৎ হলঘর জুড়ে শোরগোল শুরু হয়ে যায়। মাইকে জিজা ঘোষণা করছে, "ন'শো তিন জন প্রতিযোগীর মধ্যে রিটন টেস্টের মাধ্যমে পাঁচশো জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের তালিকা হল ঘরের চার দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাঁদের নাম নেই, তাঁরা অডিশনে পাশ করতে পারেননি। অডিশনে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ।"
দেওয়ালে ঝোলানো লিস্টের সামনে মারপিট শুরু হয়ে গিয়েছে। অর্ধেক প্রতিযোগী আনন্দে নাচছে। বাকি অর্ধেক মনমরা। কয়েকজন হাঙ্ক-কিস্তু-গামবাট টাইপের ছেলে আর সুন্দরী-এবং-ন্যাকা টাইপের মেয়ে ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি হয়ে পরাজিতের ভূমিকায় অভিনয় করছে। এরা মডেল অথবা স্ট্রাগলিং জুনিয়র আর্টিস্ট। সব রকম রিয়্যালিটি শোতে নাম লিখিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে।
মধুরার কফি শেষ হওয়ার আগেই হলঘরের ভিড় পাতলা হয়ে গেল।
বান্টি এবং আরও চারজন ক্যামেরা ক্রু দৌড়োদৌড়ি করে লুজারদের বাইট নিল। তারাও কম ড্রামাবাজ নয়। কেউ কেঁদে, কেউ চেঁচিয়ে, কেউ মোরগের মতো গলা ফুলিয়ে, কেউ ক্যামেরার দিকে তেড়ে গিয়ে, কেউ পাঁচফোড়নের মা ও বোন সম্পর্কে নানা বিশেষণ ব্যবহার করে, কেউ সিকিওরিটির কাছে ঘাড়ধাক্কা খেতে-খেতে বিদায় নিল। 'বিপ' সহযোগে এই সব বিদায় দৃশ্য টিভির পর্দার ভালই টিআরপি দেবে! মুচকি হেসে মধুরা নিজের নাম দেখতে আসন ছেড়ে ওঠে। হ্যাঁ, আছে।
পাঁচশো জনকে আবার একটা রিটন টেস্ট দিতে হল। আবার মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন। তবে এবারে ভুল উত্তরে টিক দিলে চার নম্বর কাটা যাবে। প্রশ্নগুলো হাস্যকর রকমের সোজা। ইলিশ মাছ কোথায় পাওয়া যায়? পুকুর, নর্দমা, নদী, অ্যাকোয়ারিয়াম। রসগোল্লার আবিষ্কর্তার নাম কী? নবীনচন্দ্র দাস, গাঙ্গুরাম, অমিতাভ বচ্চন, হরিদাস। ফুচকার প্রতিশব্দ কোনটি? গোলগাপ্পা, চুরমুর, পুরনপুরি, বুলবুল ভাজা। প্রশ্নের সংখ্যা পঞ্চাশ। সময়সীমা আধঘণ্টা। কুড়ি মিনিটের মধ্যে প্রশ্নপত্র জমা দিলে মধুরা। তার মনে হল, এবার প্রতিযোগীর সংখ্যা কমে একশোয় নামবে।
মধুরার ভুল মনে হয়েছিল। ফাইনাল ঘণ্টি পড়ার পর উত্তরপত্র দেখতে উদ্যোক্তারা সময় নিল আধঘণ্টা। নামের লিস্ট বের করল পঁচিশ জনের। সেই তালিকায় মধুরা ভৌমিক আছে।
বান্টি এবং চার ক্যামেরা ক্রু মিলে সাড়ে চারশো পরাজিত কন্টেস্ট্যান্টদের বাইট নিতে ব্যস্ত। এর মধ্যে জয়ী পঁচিশজনকে একটা আলাদা ঘরে ডেকে নিয়ে জিজা বলল, "আগামীকাল সকাল ন'টার মধ্যে এখানে বসতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের শুটিং চলবে দশ দিন। রোজ বারো ঘণ্টা করে। আগামীকাল সকলের সঙ্গে আলাপ হবে। আজ প্যাক আপ।"
টানা দশ দিন শুটিং? তার মানে অফিস থেকে আরও দশ দিন ছুটি? এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে তার আর দশ দিনই ছুটি পাওনা আছে। শরীর খারাপ, বাড়ির প্রবলেম বা কোনও এমার্জেন্সিতে অফিস কামাই করলে মাইনে কাটবে। অ্যাপ্রাইজালের সময় স্যান্ডি তার হাল খারাপ করে দেবে।
মরুক গে যাক! ফালতু টেনশন মাথায় নিয়ে কী লাভ? কী হবে, তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে, কী পাওয়া গেছে সেই ভেবে আনন্দিত হওয়া উচিত। বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে মধুরা মোবাইল হাতে নেয়। আর একবার সুলতানকে ফোন করা যাক।
সবুজ বোতাম টেপা মাত্র পাশ থেকে ধমক, "কাকে ফোন করা হচ্ছে? সেই ছোকরা?" চমকে উঠে পাশে ফিরে মধুরা দেখে ভাঙাচোরা স্কুটারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সুলতান তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

"তুমি এখানে?" মধুরা দৌড়ে সুলতানের কাছে যায়, "জানো, আমি অডিশনে সিলেক্টেড হয়েছি?"

"জানি। এ-ও জানি যে পঁচিশ জনের মধ্যে তোর র‍্যাঙ্ক সাত। উনুনের সামনে আসল লড়াইয়ের সময় তোর সামনে যেন কেউ না থাকে!" স্কুটারে স্টার্ট দিয়ে পিলিয়ন থাবড়াচ্ছে সুলতান।

মধুরা সেখানে সন্তর্পণে বসে বলে, "তুমি এত কথা জানলে কী করে?"

"এই ইউনিটের কয়েকজন আমার চেনা। ওদের কাছে খবর পেলাম।"

ঢক-ঢক করে স্কুটার চলেছে। আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকায় মধুরা। বিকেল সাড়ে পাঁচটা বাজে। অক্টোবরের শেষের দিকে সন্ধে নেমে আসছে দ্রুত। বাবা, মা, শুভ্র, কেউ একবারও ফোন করল না! ওরা তো জানে, আজ অডিশন। সুলতানকে মধুরা বলে, "কাল থেকে শুটিং শুরু। সকাল ন'টার মধ্যে এখানে পৌঁছতে হবে। একটানা বারো ঘণ্টা শুটিং চলবে।"

"বারো নয়। ওটা মিনিমাম যোলো ঘণ্টা," দিল্লি আর বম্বে রোডের মুখে বাইক দাঁড় করিয়ে একটা ট্যাক্সিকে হাঁক পেড়ে ডাকে সুলতান, "অ্যাই! রাজচন্দ্রপুর যাবি?"

"৩০ টাকা এক্সট্রা," বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে বলে ড্রাইভার।

"চলে যা," মধুরার পিঠ চাপড়ে বলে সুলতান, "আজ আর ঝগড়া করতে হবে না। রেস্ট জরুরি।"

"আচ্ছা বাবা, আচ্ছা!" হাসতে-হাসতে মধুরা ড্রাইভারকে বলে, "চলুন দাদা।"

বাড়ি ঢুকতে-ঢুকতে সাড়ে ছ'টা বাজল। ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দোতলায় এসে মধুরা দেখে মা আর সবিতা মিলে স্কুপ টিভিতে "শাশুড়ির কিস্তিমাত বউমা কুপোকাত" দেখছে। শাশুড়ি আর বউদের নিয়ে এই গেম শোটা খুব পপুলার। নিশিগন্ধা সেনগুপ্ত কনডাক্ট করে। বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকার ঝি-মহলে প্রবল কদর।

"কী হল? একটু বলো না গো!" মধুরাকে ঢুকতে দেখে আবদার করে সবিতা, "তোমাকে নিয়েছে? নিশিগন্ধা ছিল?"

"সব বলব। আগে এক কাপ চা খাওয়াও। আর বাই দ্য ওয়ে, সব অনুষ্ঠানে নিশিগন্ধা কেন থাকবে? এটায় জিজা ছিল," গেরামভারি গলায় বলে মধুরা। সে অলরেডি মনে-মনে নিজেকে "পাঁচফোড়ন"-এর অংশ ভাবতে শুরু করেছে।

"জিজা মানে ওই উঁচকপালি মেয়েটা? যে "নাচ ময়ূরি নাচ" পোগরামটায় থাকে?" চায়ের জল বসিয়ে বলে সবিতা।

রিমোট টিপে টিভি বন্ধ করে যূথিকা বলে, "আঃ সবিতা! পোগরাম নয়, প্রোগাম।"

যূথিকার মুখ দেখে মধুরা বুঝতে পারে, অডিশনে কী ঘটল সেটা জানার ইচ্ছে প্রবল। কিন্তু কিছুতেই নিজের থেকে জিজ্ঞেস করবে না। মধুরার জানাতে বয়েই গিয়েছে! সে সটান তিন তলায় চলে গেল। স্নান করে, পোশাক বদলে, গায়ে গন্ধ ছড়িয়ে নীচে এল মিনিট পনেরোর মধ্যে। খাবার টেবিলে এখন মনোহর এবং যূথিকা। মেঝেয় বসে সবিতা। টিভি বন্ধ। সবাই চুকচুক করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

"শাকিবকু শেষ?" চেয়ারে বসে চায়ের কাপ টেনে প্রশ্ন করল মধুরা। "শাশুড়ির কিস্তিমাত, বউমা কুপোকাত" অনুষ্ঠানটার সংক্ষিপ্ত নাম, শাকিবকু। সেটা সবাই জানে।

সবিতা বলল, "আর একটা পার্ট বাকি আছে। কিন্তু আমরা দেখব না। তোমার ওখানে কী হল বলো। তোমায় নিয়েছে, না নেয়নি?"

"নিয়েছে। আগামী দশ দিন রোজ শুটিং। সকাল আটটায় বেরতে হবে। ফিরতে-ফিরতে রাত এগারোটা বাজবে," চায়ে চুমুক দিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে মধুরা।

"চাকরির কী হবে?" প্রথম প্রশ্ন মনোহরের।

"ছুটি নেব।"

"কৃশানু বলছিল, তোমার আর ছুটি পাওনা নেই," এবার যূথিকা।

"দাদা অন্য ডিপার্টমেন্টে। ও জানে না।"

"ডিপার্টমেন্ট অন্য হতে পারে, কিন্তু অফিসটা এক। আমার ছেলে বাজে কথা বলার বান্দা নয়।"

"তুমি সত্যি বলছ যে, দাদা এটা তোমাকে বলেছে?" যূথিকার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করে মধুরা।

"কৃশানু বলুক কিংবা শুভ্র, কথাটা সত্যি কি না বল?" ঝাঁঝিয়ে ওঠে যূথিকা।

"কথাটা সত্যি। তোমার বয়ানটা মিথ্যে!" চায়ের কাপ রেখে দিয়ে তিন তলায় ওঠে মধুরা। মাথা গরম করে লাভ নেই। এখন একটু ঘুমনো যাক। রাতের খাওয়া সেরে আর এক প্রস্থ ঘুমোতে হবে। কাল সকাল ন'টার সময় ফ্রেশ এবং এনার্জেটিক থাকা অত্যন্ত জরুরি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে মধুরা শুনল, সবিতা বলছে, "তোমাদেরও বলিহারি। ভাল একটা কাজ করে ফিরেছে। কোথায় বাহবা দেবে! তা না, ধাতাচ্ছে! শুভ্র কে, যে তার কথা শুনতে হবে?"

সারা রাত নিরুপদ্রব ঘুমের পরে সকাল সাতটার অ্যালার্মের শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল মধুরার। অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি। লেপের ওমের মধ্যে শুয়ে হাই তুলছে সে, এমন সময় দরজা খুলে সবিতার প্রবেশ, "বেড টি রেডি, উঠে পড়ো!"

"দরজায় নক না করে ঢোকাটা ভব্যতা নয়," সবিতাকে বলে মধুরা।

"মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের ঘরে ঢুকবে। তার আগে ঠকঠকানির কী আছে?" গজগজ করে সবিতা, "তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নীচে এসো। রুটি আর আলু চচ্চড়ি করছি," সবিতা নীচে চলে যায়।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে ঘুম ভ্যানিশ। অনেকক্ষণ ধরে চান করে, জিন্স আর টপ পরে, ব্যাকপ্যাক ঝুলিয়ে নীচে নামে মধুরা। পৌনে আটটা বাজে। মনোহর ট্যাক্সি ডেকে এনেছে। যূথিকা পুজো করে ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে বসে রয়েছে। রুটি-আলু চচ্চড়ি খায় মধুরা। প্রসাদ মুখে দেয়। গ্লুকোজ আর ওআরএস মেশানো জলের বোতল ব্যাগে ভরে। মনোহর-যূথিকাকে বলে, "আসছি।" তারপর তরতরিয়ে একতলায় নেমে ট্যাক্সিতে উঠে বসে।

ঠিক ন'টার সময় গ্রিনল্যান্ড ক্লাবের এসি হলঘরে ঢুকে ডিরেক্টর অর্ণব মুখার্জির সঙ্গে আলাপ হল মধুরার। কাজপাগল, সুভদ্র মানুষটার সঙ্গে কথা বলে টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারল। স্কুপ চ্যানেল নিজে কোনও শো তৈরি করে না। চ্যানেল হেডরা শো-এর আইডিয়া তৈরি করে প্রোডাকশন হাউজ়কে দেয়। কলকাতায় গাদা-গাদা প্রোডাকশন হাউজ় আছে। "স্ল্যাপস্টিক" ন্যাশনাল লেভেলের একটা প্রোডাকশন হাউজ়, যাদের মেগা সিরিয়াল "লাজবন্তী" গত ছ'মাস ধরে টিআরপিতে ভারতবর্ষে এক নম্বর। স্ল্যাপস্টিক রিজিওনাল ল্যাঙ্গোয়েজের শোও তৈরি করে। "পাঁচফোড়ন" সেরকম একটা শো। স্কুপ টিভি স্ল্যাপস্টিকের হাতে থোক টাকা তুলে দিয়ে বলেছে, তাদের একটা কুকারি শো চাই। স্ল্যাপস্টিক মার্জিন মানি সরিয়ে রেখে শো শুট করে স্কুপ টিভির হাতে তুলে দেবে। স্কুপ সেটা টেলিকাস্ট করবে এবং বিজ্ঞাপন বাবদ যে টাকা আসবে সেটা পকেটে ভরবে। যে প্রোগ্রামের যত ভাল টিআরপি, তার তত বেশি অ্যাড সাপোর্ট, তত বেশি রোজগার। অর্ণবের বয়স বছর চল্লিশ। পুণে থেকে ফিল্ম ডিরেকশন নিয়ে পড়াশোনা করেছে। ফেলিনি, গোদার, ত্রুফো, ওয়াংকার ওয়াই, কুরোসাওয়া, ডেভিড ফিঞ্চ, সোডারবার্গ, মাখমালবাফ আওড়ালেও মেয়েদের মন ভেজানো সাবানপালা তৈরি করতে

হয় বলে আদতে কষ্টে আছে। ভবিষ্যতে কোনও একদিন ফিল্ম তৈরি করবে, এরকম আশা।

হ্যান্ডমাইক নিয়ে জিজা ২৫ জন প্রতিযোগীকে রুল অফ দ্য গেম বুঝিয়ে দিল। "এই শোয়ে তিন জন জাজ আছেন। প্রথমজন হলেন সেলেব্রিটি শেফ, ফুড কলামনিস্ট, আব্রাহাম সেন। সারা পৃথিবী জুড়ে পঁচিশ বছর ধরে বিভিন্ন হোটেল চেনের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। জন্ম কলকাতায়, এখন মুম্বইয়ের হিলটন ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যুক্ত।"

আব্রাহাম সেনের নাম অন্য প্রতিযোগীরা শুনেছে কি না, মধুরার জানা নেই। সে শুনেছে। কিছুদিন আগে আব্রাহামের লেখা "বাদশাহি কুইজিন" বইটা পড়ে ভোরবেলা স্বপ্নে বিরিয়ানির গন্ধ পেয়েছিল। ঘটনাটা মনে পড়ায় ফিক করে হেসে ফেলে সে।

"দ্বিতীয় বিচারকের জন্ম পাবনায়। নাম মিজান চৌধুরী মনু। মিজানসাহেব এই মুহূর্তে হোটেল টিউলিপ বেঙ্গলের 'পাকোয়ান' ফুড কোর্টের প্রধান শেফ, এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্টের হসপিটালিটি কনসালট্যান্ট। তৃতীয় বিচারক হলেন, নিশিগন্ধা সেনগুপ্ত!" গলা একধাপ চড়িয়ে বলল জিজা। নিশিগন্ধার পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। সব প্রতিযোগী হইহই করছে। মধুরা ভাবল, সবিতার ইচ্ছেপূরণ হল!

"বেসিক নিয়মটা বলে দিই। শুটিংয়ের সময়ে মডিফিকেশন হতে পারে।

তোমাদের ২৫ জনকে পাঁচটা গ্রুপে ভাগ করা হবে। প্রতিটি গ্রুপকে একটা ডিশ বানাতে দেওয়া হবে। পাঁচ গ্রুপের জন্য পাঁচটা আলাদা ডিশ। প্রতিটি গ্রুপ থেকে দু'জন করে মনোনীত হবে। অর্থাৎ ১০ জন। পরের রাউন্ডে বিচারকরা এই ১০ জনের মধ্যে পাঁচ জনকে বেছে নেবেন। যাদের মধ্যে হবে ফাইনাল রাউন্ড। এনি কোয়েশ্চেন?"

কেউ কোনও প্রশ্ন করল না। মধুরাও চুপচাপ রইল। দেখা যাক, কী হয়!

প্রথম দিনে কোনও শুটিং নেই। তার বদলে সারা দিন ধরে ওয়র্কশপ। ওয়র্কশপের শিডিউল সকলের হাতে তুলে দিল অর্ণব। মধুরা দেখল, তাতে রয়েছে ইনট্রোডাকশন, ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, নো ইয়োর কম্পিটিটরস, নো দ্য টিম, ক্রমিং, ফেসিং দ্য ক্যামেরা এবং লুক টেস্ট — এই ক'টা সেকশন। ফাঁকে-ফাঁকে চা কফির ব্রেক, লাঞ্চের বিরতি। ওয়র্কশপ শেষ হবে রাত নটায়।

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে হাতি-ঘোড়া কিছু হল না। স্টপ চ্যানেলের ইতিহাস, ন্যাপস্টিক প্রোডাকশন হাউজের সাফল্যের কাহিনি, অর্ণব মুখার্জির টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজকর্মের খতিয়ান, এসবের একটা প্রেজেন্টেশন হল, নির্মাতা অর্ণব নিজেই। আধঘণ্টার ওরিয়েন্টেশনের শেষে "নো ইয়োর কম্পিটিটরস।" অর্থাৎ অন্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে আলাপ পর্ব।

বিচারকের আসনে বসে বলল অর্ণব, পাঁচটা টিমের নাম পাঁচফোড়নের পাঁচ রকম এলিমেন্ট দিয়ে।

২৫ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১৮ জন মেয়ে, সাত জন ছেলে। ছেলেদের বয়স ত্রিশের উপরে, সকলেই বিবাহিত। ১৮ জন মেয়ের মধ্যে তিন জন অবিবাহিত। যে তিন জন অবিবাহিত, তাদের মধ্যে মধুরার বয়স সবচেয়ে কম। বাকি দু'জনের বয়স ২৬-২৭। বাংলা বলার স্টিল শুনে বোঝা যাচ্ছে, অন্তত চারজন ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ আছে। প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। ভিন্ন ভাষার মানুষদের আলাদা করে খেয়াল করল মধুরা। কমবয়সি দুজনের নাম নেহা পারেখ আর ঐশ্বর্যা নায়ার। বিবাহিত মেয়েটির নাম রত্নাবলী শর্মা। অডিশনের সময় দেখা গুরপাল সিংহও মনোনীত হয়েছে।

পরিচয় পর্বের শেষে রিসার্চ টিম সকলের হাতে একটা প্রশ্নপত্র ধরাল। প্রতিযোগীর জীবনে স্ক্যান্ডালাস বা কেলেঙ্কারিয়াস বা সেনসেশনাল কোনও ঘটনা ঘটেছে কি না জানার জন্য রিসার্চ টিম যত্ন করে প্রশ্ন সাজিয়েছে। "প্রেম করেন? করলে বাড়িতে জানে? না করলে কেন করেন না? লাভ না অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ? লাভ ম্যারেজ হলে কে প্রথম প্রোপোজ করেছিল? বাড়িতে কীভাবে জানতে পারল? অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ হলে শুভদৃষ্টির সময়ে বরকে/বউকে প্রথম দেখা, না বাড়িতে দেখতে গিয়েছিলেন? কোনও এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার আছে? শাশুড়ি অত্যাচার করে? স্বামী কখনও গায়ে হাত তুলেছে? শাশুড়ি-বউয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়?" কেচ্ছা খোঁজার আধুনিক বটতলা সংস্করণ! মধুরা ফটাফট প্রশ্নপত্রে টিক মেরে রিসার্চ টিমের হাতে তুলে দিল।

অর্ণব আবার মাইক্রোফোন হাতে নিয়েছে। সে এবার শুরু করল পরবর্তী পর্যায়, "নো ইয়োর টিম"। অর্থাৎ 'পাঁচফোড়ন' অনুষ্ঠানটির টেকনিক্যাল টিমের সঙ্গে আলাপের পালা। স্ক্রিপ্ট রাইটার শ্রাবন্তী গুপ্তর বেঁটেখাটো, গোলগাল চেহারা। বয়কাট চুল। হাতে ট্যাবলেট পিসি।

জিন্স আর ফুল শার্ট পরে ফসফস করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে নমস্কার করল। কস্টিউম ডিজাইনার ইলিনা বসু জিন্স আর লিনেনের কুর্তা পরে আছে। পায়ে কনভার্স শু। মেকআপ আর্টিস্ট সাহানা দাসের পরনে সালোয়ার-কামিজ। চেহারায় একবিন্দু মেক আপ নেই। টপনট করা চুলে একাধিক তুলি, কাজল আর আইলাইনারের গোঁজ। তিন জনের বয়সই ত্রিশের আশেপাশে। এরা ফ্রি-ল্যান্সার। বিভিন্ন চ্যানেলের সঙ্গে কাজ করে। হার্ডকোর প্রফেশনাল। কেউ বিশেষ কথা বলল না। এবার লাঞ্চব্রেক।

লাঞ্চের সময় কয়েকজন কম্পিটিটরের সঙ্গে আলাপ হল মধুরায়।

বাঙালি বউরা টিপিক্যাল হাউজওয়াইফ। সেই চকচকে শাড়ি, সেই বেঢপ চেহারা, সেই একগাদা গয়না, সেই কপালে সিঁদুরের টিপ আর সিঁথিতে লিপস্টিকের ছোঁয়া, সেই দাঁত বের করা, বোকা-বোকা অশিক্ষিত হাসি। ইরিটেটিং! তারই মধ্যে, "চন্দ্রাণী জানা" নামে হলদিয়ার এক মহিলার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল। স্বামীর কেটারিংয়ের ব্যবসা আছে। অনেক রকমের রান্না জানে চন্দ্রাণী।

লাঞ্চের পর 'লুক টেস্ট' আর 'ফেসিং দ্য ক্যামেরা'। এই দুটো সেগমেন্ট সেটে হল। প্রপার লাইটিংয়ের সঙ্গে বিচারকদের রোল প্লে করল জিজা আর অর্ণব।

নিয়মটা খুব সিম্পল, বিচারকের আসনে বসে বলল অর্ণব, "পাঁচটা টিমের নাম পাঁচফোড়নের পাঁচ রকম এলিমেন্ট দিয়ে। অর্থাৎ জিরে, কালোজিরে, মেথি, মৌরি

আর রাঁধুনি। কে কোন টিমে যাবে, সেটা বিচারকরা লটারির মাধ্যমে ঠিক করবেন। প্রথম রাউন্ডের নাম, 'মুখশুদ্ধি।' তাতে একটা টিমের পাঁচজন প্রতিযোগীকে একটা স্টার্টার রান্না করতে হবে। কী পদ হবে, বলে দেবেন বিচারকরা। ফ্লোরে পাঁচটা মডিউলার কিচেন জোন তৈরি করা হয়েছে। এখানে গ্যাস বার্নার, মাইক্রোআভেন, চিমনি, মিক্সার গ্রাইন্ডার, ইউটেনসিলস, সব আছে। যে স্টার্টার রাঁধতে বলা হবে, তার যাবতীয় উপকরণ টেবিলে রাখা থাকবে। স্টার্টারের জন্য সময় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। এনি কোয়েশ্চনস?"
গুরপাল বলল, "আমাদের কি বাংলাতেই কথা বলতে হবে?"
"দিস ইজ় আ বেঙ্গলি রিয়্যালিটি শো। আমাদের অডিয়েন্স বাঙালি। সো, ইউ হ্যাভ টু আনসার ইন বাংলা। বাট ফিল ফ্রি টু ইউজ় হিন্দি অ্যান্ড ইংলিশ টু এক্সপ্রেস ইয়োরসেল্‌ফ," জিজ্ঞ উত্তর দিল।
"আমাদের কি বংলা রান্না করতে হবে?" এবার প্রশ্ন করেছে রত্নাবলী শর্মা।
"কথাটা বংলা নয়, 'বাংলা।' তোমাদের শুধু বাংলা রান্না নয়, সারা ভারতের যে-কোনও প্রদেশের ডিশ রাঁধতে হতে পারে," অর্ণব জবাব দিল, "ইউরোপিয়ান বা মেডিটেরেনিয়ান ডিশও রাঁধতে হতে পারে। সে প্রসঙ্গে পরে আসব। প্রতিটি দল থেকে যে দু'জন নির্বাচিত হবে, তারা যাবে পরের রাউন্ডে। বাকিরা টা-টা বাই।"
"পরের রাউন্ডে কী থাকবে?" চন্দ্রাণী জানতে চাইল।
"উই উইল ক্রস দা ব্রিজ হোয়েন ইট কামস," ঘড়ি দেখে অর্ণব বলল, "সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। ইলিনা আর সাহানার টিম তোমাদের লুকটেস্ট করবে। ইট উইল টে আ হেল লট অফ টাইম। আগামীকাল এখানে সকাল ন'টায় দেখা হচ্ছে। বাই।"

১০

এসপ্ল্যানেড মেট্রোর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলল মধুরা, "চল, কাছের রেস্তরাঁতে বসি"। লোকের ভিড় দোকানটার সামনে। বেশিরভাগ কাস্টমার রোল কিনছে। এগরোল, এগ চিকেন রোল, এগ মটন রোল, নানা শ্রেণিবিভাগ, অজস্র কাস্টমার। দরজার সামনে মস্ত তাওয়ায়, গরম তেলে ডিম ভেঙে তার উপরে পরোটা ভাজছে কারিগর। তাওয়া থেকে তুলে ছুঁড়ে দিচ্ছে পাথরের স্ল্যাবে। সেখানে তার শাকরেদ ডিম-পরোটার মধ্যে মাংসের পুর, পেঁয়াজ, শশা, চিলি সস, সয়া সস, কাসুন্দি দিয়ে, পরোটা গোল করে পাকিয়ে কাগজে মুড়ে তুলে দিচ্ছে কাস্টমারের হাতে।
পুঁচকে দোকানের ভিতরে গোটা চার-পাঁচ টেবিল। মধুরারা ঢুকতেই একটা টেবিল খালি হল। সেখানে গুছিয়ে বসে, মোবাইল ফোন ভাইব্রেটর মোডে পাঠিয়ে মেরি বলল, "তারপর বল! ফার্স্ট রাউন্ডে কীভাবে উতরে গেলি?"
মধুরা কিছু বলার আগে অ্যানি বলল, "নো এসি?"
"শাট আপ গার্ল!" মেয়েকে ধমক দিয়ে ওয়েটারকে ডাকে মেরি, "তিনটে মোগলাই পরোটা।"
ওয়েটার ভিজে কাপড় দিয়ে টেবিল মুছে তিন গেলাস জল রেখে গেল। মেরি বলল, "ইট উইল টেক টাইম। তুই বল।"
আজ শুটিংয়ের চতুর্থদিন ছিল। আজই মধুরার প্রথম শুটিং হয়েছে। প্রথম তিনদিন তার শুটিং না থাকলেও সে গ্রিনল্যান্ড ক্লাবে উপস্থিত ছিল। স্ল্যাপস্টিকের তরফে অর্ণব ফরমান জারি করেনি যে, শুটিং না থাকলেও আসতে হবে। কিন্তু সকলেই থাকছে। একটা অঘোষিত ভয় কাজ করছে, যে তার অনুপস্থিতিতে অন্যজন যদি কিছু শিখে যায়! থেকে ল্যাভও হচ্ছে। ৬০ জনের একটা টিম সবসময় টগবগ করে ফুটেছে! কয়েকজন ক্যামেরার সামনে, বেশিরভাগ ক্যামেরার পিছনে। ভীষণ ছোঁয়াচে একটা অভিজ্ঞতা।
আজ সন্ধে সাতটার সময় গ্র্যান্ড হোটেলে মেরির ক্লায়েন্ট মিট ছিল। অ্যানিকে ইউএসআইএস আসতে হয়েছিল ভিসা সংক্রান্ত দরকারে। মেরি গতকাল সন্ধেবেলা ফোন করে মধুরাকে বলেছিল, "ক্লায়েন্ট মিট আটটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তুই শুটিংয়ের পরে চলে আয়। আড্ডা মারা যাবে।" আড্ডার মোড়কে মেরির এই জরুরি তলবের কারণ মধুরা আন্দাজ করতে পারছে না। মেরি রান্নাবান্না করতে ভালবাসে। কিন্তু তার জন্য মধুরাকে ডেকে পাঠিয়ে গপ্‌পো করার মহিলা সে নয়। নিছক কৌতূহলবশত, শুটিংপর্ব চোকার পরে গ্রিনল্যান্ড ক্লাব থেকে ট্যাক্সি নিয়ে মধুরা ধর্মতলা এসেছে।
মেরির কথা শুনে মধুরা বলে, "কী বলব?"
"কাল ফোনে বললি, প্রথম দিন কোনও শুটিং হয়নি। দ্বিতীয় দিনে কী হল?" একচুমুক জল খেয়ে বলে মেরি।
"দ্বিতীয় দিন সকাল থেকে শুটিং ছিল। অ্যাক্ট আ গ্রুপ, আমাদের নিয়ে শুট করল। ইন্ডিভিজুয়ালি ইন্টারভিউ নিল। ফ্লোরে আটখানা ক্যামেরা। তিনটে টলি ক্যামেরা, চারটে ফ্লোর ক্যামেরা, একটা জিমি জিব। ফটাফট কাজ এগোচ্ছিল। শুনলাম, রিসার্চ টিম ক্যামেরা নিয়ে বাড়ি-বাড়ি যাচ্ছে। বাবা-মা, ভাই-বোন, বউ-বাচ্চা, দাদু-দিদা, প্রেমিক-প্রেমিকা, কোলিগ-প্রতিবেশী...কাউকে ছাড়ছে না। আমাদের বাড়িতে অবশ্য এখনও আসেনি।"
ওয়েটার তিন প্লেট মোগলাই পরোটা আর তিন বাটি আলুর তরকারি টেবিলে রাখল।
মেরি বলল, "তারপর?"
"প্রথমে আমরা সবাই শ্যাভো প্র্যাক্টিস করেছি। মডিউলার কিচেন ভালভাবে চেনা, কোথায় ক্রকারি, কোথায় কাটলারি, কোথায় ফ্রিজ়, কোথায় মিক্সার-গ্রাইন্ডারের পাওয়ার সকেট, কীভাবে মাইক্রোআভেন হ্যান্ডল করতে হয় — এই সব। শুনতে সোজা লাগলেও, ক্যামেরা ফেস্ডলি হয়ে কাজগুলো করার জন্য ট্রেনিং লাগে। প্লাস একটানা কথা বলতে হবে। শ্রাবন্তী একটা বেসিক স্ক্রিপ্ট বানিয়ে দিয়েছে। সেটা ফলো করে রান্না করলাম।"
"কী রাঁধলি?"
"অর্ণব আমাদের এগ চাউমিন বানাতে বলল। ডিম সেদ্ধ, চাউমিন সেদ্ধ, ভেজিটেবল ডাইস করা, ভেজিটেবল সেদ্ধ করা, সব ইনগ্রেডিয়েন্ট সতে করা, অনেকগুলো স্টেপ আছে। মেক-আপ নিয়ে চড়া আলোর মধ্যে রান্না করা খুব টাফ কাজ।"
কাঁটা-চামচ দিয়ে এক টুকরো পরোটা কেটে মুখে পুরে মেরি বলল, "তারপর কী হল?"
"মনিটরে আমাদের ক্লিপিংস দেখিয়ে অর্ণব বোঝাল, কোথায়-কোথায় গন্ডগোল হচ্ছে। তারপর বাড়ি পাঠিয়ে দিল। আসল শুটিং শুরু হয়েছে গতকাল থেকে। সকালবেলা জাজদের সঙ্গে আলাপ হল। আব্রাহাম সেনের নাম জান তো?"
"ইয়াপ। দ্য ফেমাস শেফ অ্যান্ড দ্য কুকবুক অথর।"
"উনি স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী আমাদের পাঁচটা টিমে ভাগ করে দিলেন। টিমগুলোর নাম জিরে, কালোজিরে, মৌরি, মেথি আর রাঁধুনি।"
"পাঁচফোড়ন!" ফোড়ন কাটে অ্যানি।
"তারপর মিজান চৌধুরী মনু টিমগুলোকে বাংলা অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে সাজালেন। কালোজিরে, জিরে, মেথি, মৌরি আর রাঁধুনি। গতকাল 'কালোজিরে' টিমের শুটিং ছিল। আমি 'জিরে' টিমে ছিলাম। আমার শুটিং আজ হল।"
"তোর গল্প পরে শুনব। গতকাল কী হল বল," আর এক টুকরো মোগলাই মুখে পুরে বলে মেরি।
"টিম কালোজিরেকে নিশিগন্ধা আদর করে ডাকল টিম নাইজেলা। ন্যাকা!"
"ন্যাকার কী আছে? নাইজেলা ইজ দ্য ইংলিশ সিনোনিম অফ কালোজিরে।"

"জানি, সেই জন্য ন্যাকা বলিনি। নিশিগন্ধার মতো ন্যাকা মহিলা আমি দু'টো দেখিনি। আধো-আধো বাংলায় কথা বলছে, থেকে-থেকেই আঁচল খসে পড়ছে, প্রতি দশ সেকেন্ডে একবার লকস কানের পিছনে সরাচ্ছে। ডিফগাস্টিং! এনিওয়ে, নিশিগন্ধা টিম নাইজেলাকে লুচি আর ছোলার ডাল রাঁধতে দিয়েছিল।"

"টাফ জব! ছোলার ডাল ইজ নট ম্যাটার অফ জোক! ঘটিরা ছোলার ডালে চিনি দেয়। আবার লঙ্কাগুঁড়োও দেয়। দেয়ার ইজ আ ফাইন ব্যালান্স বিটুইন টু টেস্টস! কে ফার্স্ট হল?"

"নেহা পারেখ। আ গুজরাতি গার্ল। সেকেন্ড হল চন্দ্রাণী জানা নামের একটা বাঙালি বউ।"

"গুজ্জু হয়ে বেঙ্গলি ডিশে একটা বেঙ্গলিকে হারিয়ে দিল? শি মাস্ট বি ভেরি গুড!" অ্যানি অবাক হয়ে বলে।

"রান্না দু'জনেই উনিশ-বিশ করেছিল," অ্যানিকে বোঝায় মধুরা, "নেহা বেরিয়ে গেল প্রেজেন্টেশনের জোরে। লুচি আর ছোলার ডালের মতো মানডেন ডিশকে ধনেপাতা আর অনিয়ন রিং দিয়ে যে অত সুন্দর গার্নিশ করা হয়, এ আমি কল্পনাই করতে পারিনি। শি মাস্ট বি আ প্রেফেশনাল শেফ।"

"মে বি!" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মেরি বলল, "আজ কী হল?"

"আজ?" নিজের প্লেট শেষ করে অ্যানির প্লেট থেকে একটুকরো মোগলাই মুখে পুরে মধুরা বলে, "আজ টিম কিউমিনের স্টার্টার এপিসোডের শুট হল। গোদা বাংলায় জিরে টিমের মুখশুদ্ধি।"

"কী রাঁধতে দিল?"

"আর বোলো না," হাসতে-হাসতে বলে মধুরা, 'গাজরের হালুয়া।'

"সুইট ডিশ। নট আ ব্যাড আইডিয়া। কেমন হল তোর রান্না?"

"কেমন আবার হবে? আমার সঙ্গে চারটে বউ ছিল। সব কটা ধ্যাড়ানে পাবলিক! পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় ছিল। একটা বউ গাজর কাটতে আধঘণ্টা পার করে দিল। সে শেষ করতেই পারেনি। অন্য তিনজন শেষ করল বটে, কিন্তু জঘন্য প্রিপারেশন করল। আব্রাহাম মুখে দিয়ে বলল, "আপনাদের কারও পরের রাউন্ডের জন্য সিলেক্টেড হওয়া উচিত নয়। তবে খেলার নিয়ম মেনে আমরা সব চেয়ে কম খারাপ যিনি রেঁধেছেন, তাঁকে সেকেন্ড করেছি।"

"তুই ফার্স্ট হয়েছিস তো?" ইশারায় ওয়েটারকে বিল দিতে বলে মধুরাকে প্রশ্ন করে মেরি।

"এটা আবার জানতে চাওয়ার কী আছে মা?" বিরক্ত হয়ে বলে অ্যানি।

"হ্যাঁ, আমি ফার্স্ট। আগামী তিনদিন টিম ফেনুগ্রিক, টিম ফেনেল আর টিম সেলেরির স্টার্টার রাউন্ড আছে।"

"মেথি, মৌরি আর রাঁধুনি, তাই তো?" জানতে চায় অ্যানি।

"রাঁধুনি একেবারেই ইন্ডিয়ান স্পাইস। ওটার ইংরেজি নেই। সেলেরি ইজ জাস্ট আ রিপ্লেসমেন্ট। চলো মেরি মাসি," মুখে মৌরি ভাজা আর মিছরি ফেলে বলে মধুরা, "অনেক রাত হল। মেট্রো ধরে দমদম পৌঁছতে আধঘণ্টা লাগবে। বাকি রাস্তাটা শুভ্র পৌঁছে দেবে। কাল ভোর থেকে আবার ঝামেলা।"

"অফিসে খুব ঝামেলা হচ্ছে," ফুট কাটে অ্যানি, "আমাকে দ্বিগুণ খাটতে হচ্ছে। প্রবলেম ইজ রিউইং। টেক কেয়ার মধু।"

"অ্যায়াম সরি অ্যানি," অ্যানির হাত চেপে ধরে মধুরা, "চাকরি আমি ছাড়ব না। 'পাঁচফোড়ন'-এর শুটিং ক'দিন চলবে, কে জানে! অর্ণব বলছিল, দু'টো কুড়ি মিনিটের এপিসোড শুট করতে একদিন লাগে। মাসে কুড়িদিন টেলিকাস্ট করার জন্য যে পরিমাণ মেটিরিয়াল লাগে, একটানা দশদিন শুট

করলে সেটা পাওয়া যায়। প্লিজ় আর ক'টা দিন টলারেট কর। অফিস থেকে খুব ফোর্স করলে আমি 'পাঁচফোড়ন' ছেড়ে বেরিয়ে আসব।"

"ব্রেজি গার্ল!" মধুরার পিঠ চাপড়ে দেয় মেরি, "তোকে চাকরিও ছাড়তে হবে না, 'পাঁচফোড়ন'ও ছাড়তে হবে না। বাড়ি যা।"

মেট্রোর সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মধুরা মেরিকে বলে, "একটা জিনিস আমার মথায় ঢুকছে না। তুমি এই শো-টা সম্পর্কে এত ইন্টারেস্টেড কেন?"

"আই অলওয়েজ় ওয়ান্টেড টু বি আ প্রফেশনাল শেফ। হতে পারিনি। তার বদলে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম চালাই। তাই আমি একটু কিউরিয়াস," চাপা হাসে মেরি।

মেরির যুক্তি মধুরার পছন্দ হয়নি। সে ভুরু কুঁচকে বলল, "কী একটা টিভি শো-এর জন্য তুমি ডিপ ফোকাসের প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলে না?"

"জাসুসি?" রহস্যময় হাসে মেরি।

অ্যানিকে নিয়ে ফুটপাতে নেমে হাঁক পাড়ে, "ট্যাক্সি! ইলিয়ট রোড!" মধুরা মেট্রো রেলের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নামতে থাকে।

দমদম মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে রেল লাইনের তলা দিয়ে হেঁটে ফুটপাতে পৌঁছে মধুরা দেখল, বাইক স্ট্যান্ড করে শুভ্র ফুলওয়ালির কাছ থেকে গোলাপ ফুলের তোড়া কিনছে। শীতের এই সময়টায় এখানে ফুল বিক্রি বেড়ে যায়। মরসুমি ফুল, একটু এগজ়টিক বিদেশি ফুলের ডালা নিয়ে বসে মাঝবয়সি বউরা চিৎকার করে, "গোলাপ, জারবেরা, গ্ল্যাডিওলি!"

"হঠাৎ গোলাপ?" শুভ্রর বাইকের পাশে দাঁড়িয়ে জানতে চায় মধুরা।

"তোমার জন্য কেনেনি গো মেয়ে!" খনখনে গলায় জানায় ফুলওয়ালি, "ওর ঠাকুমার আজ পঁচাত্তর বছর পুরবে। তাই পঁচাত্তরটা গোলাপ নিল।"

"তাই?" ঝলমলে মুখে বলে মধুরা, মনে-মনে অখুশিও হয়। ঠাকুরমার জন্য কিনছে কিনুক। তা বলে তার জন্য কিনবে না?"

"এই মেয়েটা তোমার কে হয়?" ফুলের ডালার পাশে, নর্দমায় পিক করে পানের পিচ ফেলে একগাল হেসে জানতে চাইল ফুলওয়ালি।

"বন্ধু। কেন?" টাকা মিটিয়ে অনাবশ্যক গলা চড়িয়ে জানতে চাইল শুভ্র।

"বন্ধু? বোন নয় তো? তা হলে এই নাও," পঁচাত্তরটা গোলাপের তোড়া সেলোফোনে মুড়ে শুভ্রর হাতে তুলে দেওয়ার পরে, একটা গোলাপ মধুরাকে ফাউ দেয় ফুলওয়ালি, "এটা তোমায় ফিরি দিলুম।"

"কেন?" আবার জানতে চায় শুভ্র। সে গোলাপের তোড়া মধুরার হাতে চালান করে দিয়েছে।

"জানি না বাপু!" নাকের আংটা নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করে ফুলওয়ালি। "ধান্দার সময় গপ্পোগাছা করতে পারবুনি।"

হাসতে-হাসতে মধুরা শুভ্রর বাইকের পিছনে উঠে বসে। শুভ্র বাইকে স্টার্ট দেয়। চিড়িয়ামোড়ে পড়ে ডানদিকে ঘুরে সাঁ-সাঁ করে বাইক চালিয়ে পৌঁছে যায় ডানলপ। পি ডাবলিউ ডি রোড ধরে সুনসান রাস্তা ধরে নিমেষের মধ্যে দক্ষিণেশ্বর। এখানে ব্রিজের তলায় সারা বছর জ্যাম লেগে থাকে। আজও ব্যতিক্রম নয়। ট্রেন থেকে নামা যাত্রীদের ভিড়, মন্দিরে আসা ভক্তদের ভিড়, বাস, লরি, টেম্পো, অটো, রিকশা মিলে নরককুণ্ড হয়ে আছে পুণ্যস্থান। নানা কায়দায় তাদের টপকে, বালি ব্রিজে ওঠে শুভ্র। বাকি রাস্তা মোমমসৃণ।

ভৌমিক ভবনে বাইক দাঁড়াল সোওয়া দশটায়। এত রাতে রাস্তায় একজন লোকও নেই। বাইক থেকে নেমে সেলোফনে মোড়া ফুলের তোড়া শুভর হাতে তুলে দিয়ে মধুরা বলল, "তুমি এবার কাটো। মেলা রাত হয়েছে। কাল আমাকে সকাল-সকাল উঠতে হবে।"

ছিয়াত্তরতম গোলাপটি শুভ্রর শার্টের বুকপকেটে ছিল। সেটা মধুরার হাতে তুলে দিয়ে শুভ্র বলল, "এই নাও। ফাউ গোলাপ।"

গোলাপটা হাতে নিয়ে ভুরু কুঁচকে ভাবল মধুরা। নিজের কনফিডেন্স ক্লিয়ার করতে জিজ্ঞেস করল, "ফুলওয়ালি কী ভেবে ফুলটা দিল বল তো? ও কী ভাবল? উই আর ইন লাভ?"

"নয়?" বাইকে স্টার্ট দিয়ে প্রশ্ন করে শুভ্র। "জানি না...আমার তো কিছু মনে হয় না," আনমনে বলে মধুরা, "প্রেম-ফ্রেম আমার ঠিক আসে না।"

"ইউ কান্ট এসকেপ ফ্রম লাভ মধুরা। নো বডি ক্যান।"

"ওয়েট, ওয়েট, ওয়েট!" শুভ্রর শার্টের কলার খিমচে ধরেছে মধুরা, "দ্যাট ওয়াজ় আ নাইস কোট। কোত্থেকে ঝাড়লে?"

"চেতন ভগত, ফেসবুকের স্টেটাস আপডেট, খবরের কাগজের হেডলাইন আর খেলার পাতা ছাড়া কিছু পড়ি না। এটা ওরকম কোনও জায়গা থেকে পাওয়া," শার্টের কলার ঠিক করছে শুভ্র, "বাই দ্য ওয়ে, আর একটা কথাও বলি, ফেন্ডশিপ ইজ় আ ফর্ম অফ লাভ।"

টিক-টিক করে বাইক চালিয়ে শুভ্র চলে গেল। হাতের গোলাপের দিকে কনফিউজ্ড হয়ে তাকিয়ে রইল মধুরা। এসব হচ্ছেটা কী? টিপিক্যাল হিন্দি সিনেমার মতো? বোকা-বোকা! ইডিয়টিক! ওয়াক তোলার ভঙ্গি করে গোলাপ ফুল নর্দমায় ফেলতে যাচ্ছে, এমন সময় দরজা খুলে একগাল হেসে সবিতা বলল, "ওমা! গোলাপফুল? শারুখ খান চলে গেল?"

ফুল সবিতার হাতে দিয়ে মধুরা গনগনে গলায় বলল, "হ্যাঁ। চলে গেল। যাওয়ার আগে তোমাকে ফুলটা দিয়ে গেল।"

"করিনা কপুর থাকতে আমায় কেন দেবে!" মিচকে হেসে কথা শোনায় সবিতা। গলা বদলে বলে, "বাবা-মা না খেয়ে বসে আছে। তাড়াতাড়ি উপরে চলো।"

চেনা সংলাপে ঢুকতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে মধুরা। যাক বাবা! ন্যাকা-ন্যাকা বিষয় নিয়ে আলোচনা বন্ধ হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে সরসর করে তিনতলায় উঠে যায় সে। দু'মিনিটের কাকস্নান সেরে কাপরি আর টি-শার্ট গলিয়ে, চমশা নাকে এঁটে দোতলায় নেমে হাঁক পাড়ে, "খাব।"

মনোহর নেশা করে আছে। সে কোনও কথা না বলে রুটিতে হাত দিল। যুথিকা হাঁটুতে হাত বোলাচ্ছিল। সে বলল, "শুটিং তো অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। এত রাত পর্যন্ত কোথায় ধিনিক-ধিনিক করে নেচে বেড়াচ্ছিলে?"

উল্টোপাল্টা প্রশ্নের উল্টোপাল্টা উত্তর দেওয়া উচিত। চড়া গলায় মধুরা বলল, "বউবাজারে।"

"মারব টেনে এক চড়!" যুথিকা বোমার মতো ফেটে পড়ে, "মাকে এসব কথা বলতে লজ্জা করে না? নোংরামির একটা সীমা থাকা উচিত।"

"উচিত তো," ডালে রুটি ডুবিয়ে মধুরা বলে, "আমিও তাই জানতাম। তুমি সেটা পেরলে কেন? মেয়েকে এসব কথা বলার আগে তোমারও দু'বার ভাবা উচিত ছিল।"

যুথিকা আবার কীসব বলতে যাচ্ছিল। তার হাঁটুতে হাত রেখে চুপ করাল মনোহর। মধুরার দিকে না তাকিয়ে, রুটি দেখতে-দেখতে বলল, "আমরা বাবা-মা তো! আমাদের টেনশন হয়।"

মনোহরের গলায় তীব্র অভিমান। মধুরা নরম হল। বলল, "সরি মা। আমার ওরকম বলা উচিত হয়নি। মেরি মাসি ফোন করে ধর্মতলায় ডেকেছিল। ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেরি হল। তোমাকে আমার ফোন করে দেওয়া উচিত ছিল।"

যুথিকার রাগ পড়েছে বলে মনে হল না। সে গলা চড়িয়ে বলল, "দিয়া!"

ও! আজ এখানে বউদি আছে! মায়ের

উপরে রাগ হল মধুরার। বউদি আছে জানা সত্ত্বেও ডামাটা না করলেই চলছিল না?
খাবার টেবিল থেকে উঠে সে কৃশানুর ঘরে ঢুকে বলে, "ম্যাডাম, খাবে এসো।"
দিয়া ল্যাপটপে কিছু একটা লিখছিল। যেটুকু লিখেছিল, সেটুকু সেভ করে হাই তুলে বলল, "বাড়ি ঢুকেই ঝগড়া? কাল শুটিং আছে না?"
দিয়ার হাত ধরে টানতে-টানতে খাবার টেবিলে বসিয়ে মধুরা বলে, "কাল আমার শুটিং নেই। আগামী তিনদিনই নেই। জাস্ট যেতে হয় বলে যাওয়া।"
"আজ তুমি ফার্স্ট হয়েছ! আমরা আগে থেকেই জানি!" মধুরার পাতে বেগুন পোড়া দিয়ে বলে সবিতা। মধুরা অবাক হয়ে সবিতার দিকে তাকায়। সে বাড়িতে ফোন করে এই ইনফরমেশন দেয়নি। তার ফার্স্ট হওয়ার খবর এখনও পর্যন্ত জানে মেরি আর অ্যানি। সুলতানকেও ফোন করেনি। এরা তা হলে জানল কী করে? রুটি আর বেগুনপোড়া মুখে পুরে মধুরা বলল, "তোমাকে কে বলল?"
"আমি," পাশ থেকে বলল দিয়া।
"তুমি অফিস থেকে জেনেছ," সূত্র জানতে পেরে নিশ্চিন্ত হয় মধুরা।
"আমাদের অফিস 'পাঁচফোড়ন' নিয়ে বদারড নয়। আমি জানতে পেরেছি কৃশানুর কাছ থেকে।"
"দাদাকে কে বলল? সুলতানদা?" মধুরা জানতে চায়। সুলতানের নানা রকম অদ্ভুত কানেকশন আছে। অডিশনে মধুরার সিলেকশনের কথা সে অনেক আগে জেনে গিয়েছিল।
মধুরাকে অবাক করে দিয়া বলল, "কৃশানুকে বলেছে তোর বস। স্যান্ডি।"
সন্দীপ? আকাশ থেকে পড়ে মধুরা। তার বস 'পাঁচফোড়ন'-এর খবর রাখছে?
লোকটার হল কী? মধুরা একটা যুক্তি খুঁজে পায়। হঠাৎ ছুটি নেওয়ায় স্যান্ডি অসন্তুষ্ট হলেও তার অ্যাচিভমেন্টের খবর রেখেছে। লোকটাকে যতটা বদ মনে হয়, ততটা নয়।
এগারোটা কুড়ি বাজে। দাঁত মেজে শুতে-শুতে পৌনে বারোটা বাজবে। তিনতলায় উঠে দাঁত মাজার আগে মধুরা সেলফোন হাতে নেয়। আজ সারাদিনে একবারও সুলতানকে ফোন করা হয়নি। এখন একবার চেষ্টা করা যাক। মোবাইল কানে ঠেকিয়ে মধুরা শুনতে পায়, যান্ত্রিক মানবীকণ্ঠ বলছে, "আপনি যে নম্বরটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছেন, সেটি এখন সুইচড অফ রয়েছে।"
হালকা মনখারাপ হল মধুরার। সে ফোন করতে ভুলে গিয়েছে। কিন্তু সুলতান তো একবার ফোন করলে পারত! 'পাঁচফোড়ন' নিয়ে কত আগ্রহ লোকটার, আর তার শুটিংয়ের দিন ফোন করতে পারল না? ধুস!
অন্য দিন বালিশে মাথা রাখামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। আজ ঘুমের নামমাত্র নেই। ঘাড়ে আর কানের পিছনে জল দিল, ফাঁকা ছাদে একা-একা ঘুরে বেড়ালো। বারোটা বেজে গিয়েছে। রাস্তায় একটাও লোক নেই। কুকুরগুলো ঠান্ডায় কুঁকড়ে শুয়ে আছে। রাজচন্দ্রপুর এখন ঘুমোচ্ছে।
টি-শার্ট আর কাপরিতে শীত যাচ্ছে না। ঘরে ঢুকে কম্বলের তলায় আশ্রয় নেয় মধুরা। চোখ বুজে শুয়ে থাকলে ঘুমবাবাজি আপনি চলে আসবে। পাশ ফিরে শুতে গিয়ে একটা চেনা গন্ধ নাকে আসে। বিরিয়ানির গন্ধ! অবাক হয় মধুরা। আবার সেই গন্ধওয়ালা স্বপ্ন? কিন্তু সে তো এখনও ঘুমোয়নি! এনিওয়ে, স্বপ্ন আসছে যখন, তখন ঘুমও আসবে। যদিও উল্টোটাই হওয়ার কথা! অথবা লোকে যেমন স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখে, সেও তাই-ই দেখছে। গন্ধটা ছড়াচ্ছে! ঠিক বিরিয়ানির গন্ধ নয়। বিরিয়ানির কোনও একটা উপাদানের গন্ধ। জায়ফল? না। জয়ত্রি? না। কেওড়া? নাঃ, এটা গোলাপজলের গন্ধ!
ধুস! ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মধুরা। এটা গোলাপফুলের গন্ধ। সে যখন খাচ্ছিল, সবিতা তার বালিশের পাশে শুভ্রর দেওয়া গোলাপ ফুলটা রেখে গিয়েছে। আর মধুরাও এমন বেরসিক যে, গোলাপ ফুলের গন্ধ নাকে আসায় তার মনে হয়েছে এটা বিরিয়ানির গন্ধ!
সত্যি-সত্যি ঘুমিয়ে পড়ার আগে মধুরা ভাবল, রবি ঠাকুরের গানে আর কবিতায় নাকি প্রেম আর পুজো একাকার হয়ে যায়। তার ক্ষেত্রে প্রেম আর পেটপুজো মিশে যাচ্ছে! গোলাপ ফুল হাতে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

১১

"কোথায় যাবি?" লেপের ফাঁক থেকে বিড়বিড় করল যুথিকা।
"সান ইয়াত সেন স্ট্রিট," হি-হি করে কাঁপতে-কাঁপতে জবাব দিল মধুরা। তার স্নান হয়ে গিয়েছে। জিন্স আর ফুল স্লিভ শার্ট পরে, লাল টুকটকে পোলো নেক সোয়েটার গলাচ্ছে। ঘড়িতে এখন ভোর সাড়ে চারটে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।
"সেটা কোথায়?" প্রশ্ন করে উত্তর শোনার আগেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল যুথিকা।
লেপের তলায় পাশ ফিরতে ফিরতে মনোহর বলল, "টেরিটিবাজার।" তারপর নাক ডাকতে লাগল।
ঘুমন্ত বাবা-মাকে টা-টা করে কৃশানুর ঘরে নক করল মধুরা। গতকাল রাতে দাদা এসেছে। আজ এখান থেকে অফিস যাবে। গাড়ির চাবিটা গতকাল চেয়ে রেখেছে মধুরা।
"টেবিলে আছে," লেপের তলা থেকে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে কৃশানু, "তুই এই কুয়াশার মধ্যে পোদ্দার কোর্ট যেতে পারবি? অ্যাক্সিডেন্ট করবি না?"
"না," টেবিল থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে নিয়েছে মধুরা।
"ক'টার মধ্যে ফিরবি?"
"তোর অফিসে বেরনোর আগে," চাবি নিয়ে শনশন করে নীচে নামে মধুরা। বিমল গ্যারেজের শাটার তুলে রেখেছে। ড্রাইভারের সিটে বসে হাত ঘষে তালু গরম করে মধুরা। ভয়ঙ্কর ঠান্ডা। এখন বাইরের টেম্পারেচার দশ ডিগ্রি। হাত-পা কাজ করছে না। গাড়ি চালিয়ে যাওয়াটা রিস্কি হয়ে গেল না তো? উপায় নেই। সুলতানের হুকুম। চাইনিজ মশলা আর সস কিনতে সে সান ইয়াত সেন স্ট্রিটে পৌঁছবে ভোর সাড়ে পাঁচটায়। তখন সেখানে মধুরাকে আসতে হবে। গাড়ি রাস্তায় নামিয়ে মধুরা বলে, "বিমলকাকা, তুমি শুয়ে পড়ো।" তারপর ফাঁকা, মানুষহীন রাস্তায় গাড়ি চালাতে থাকে। কিছু দূর যাওয়ার পরে ট্রেনলাইনের তলা দিয়ে ডান দিকে ঘোরে। বত্রিশ চাকার দু'টো লরিকে পাশ কাটিয়ে জি টি রোডে পড়ে।
এখন ভোরবেলা না মাঝরাত? কুপকুপে অন্ধকারের মধ্যে পাতলা কুয়াশা ভাসছে। যেভাবে চায়ের লিকারে ভাসে দুধ।
কুয়াশার মাঝখান দিয়ে ডিপার দিতে-দিতে আসছে দৈত্যের মতো ট্রাক। সালকিয়ার পরে অবস্থা একটু বদলাল। আলো ফুটছে, রাস্তায় লোকজন দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে হকার আর ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করে ফেরা মুটে-মজুরদের। আড়চোখে ড্যাশবোর্ডের ঘড়ির দিকে তাকায় মধুরা। পাঁচটা বাজে। টেরিটিবাজার পৌঁছতে আরও আধঘণ্টা লাগবে।
সান ইয়াত সেন স্ট্রিটে চাইনিজ ব্রেকফাস্টের কথা মধুরা অনেকবার শুনেছে। কখনও যাওয়া হয়নি। শুভ্র বা বিশালের মুখে শুনে, ব্লগারদের লেখা পড়ে ভাসা-ভাসা ধারণা আছে। ভারতবর্ষে চিনারা এসেছিল ১৮০০ সাল নাগাদ। সুগার প্ল্যান্টেশানের ব্যবসা করতে। গোদা বাংলায়, আখচাষ। একসময় ভারতবর্ষে প্রায় পাঁচ লাখ চিনা ছিল। এখন দুশোরও কম চিনা ফ্যামিলি কলকাতায় থাকে। কলকাতার চিনেরা মূলত হাক্কা এবং ক্যান্টনিজ প্রদেশের বাসিন্দা। রোববার সকালে সান ইয়াত সেন স্ট্রিটে এরাই প্রাতরাশ নিয়ে বসে। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ

বাজার শুরু। আটটার মধ্যে সব বিক্রি হয়ে যায়।

কলকাতায় চিনা কালীমন্দির আছে, চিনা খবরের কাগজ আছে, এগুলো মধুরা জানত। কিন্তু বাড়িতে তৈরি সসেজ বা সস বা মশলার জন্য খানদানি দোকান আছে, এটা জানত না। আজকাল শপিং মলে নানা এগজটিক মশলা বা সবজি পাওয়া যায়। তার দাম বেশি। সুলতান চাইনিজ রান্নার জন্য টেরিটিবাজারের রবিবারের চিনা ঠেক থেকে মশলাপাতি, সস আর সসেজ কেনে।

হাওড়া ব্রিজ সুনসান। ডেকচি উপচানো গরম দুধের ধারার মতো বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা। তার মাথার উপরে ধোঁয়ার মতো ভাসছে কুয়াশা। দেখলেই জিলিপি ডুবিয়ে খেতে ইচ্ছে করে। ব্রেবোর্ন রোড ফ্লাইওভার ধরে টি বোর্ডে পৌঁছে বাঁ দিকে ঘুরল মধুরা। রিকশাওয়ালারা আরামসে ঘুমোচ্ছে রিকশার তলায়। রাতে জ্বালানো আগুনের কুণ্ড থেকে হালকা ধোঁয়া উঠে মিশে যাচ্ছে কুয়াশার সঙ্গে। রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে গাড়ি পার্ক করে মধুরা। ডান দিকে একফালি সরু রাস্তা। সান ইয়াত সেন স্ট্রিট। স্কুটার স্ট্যান্ড করে সুলতান তার উপরে বসে রয়েছে। একদল বৌদ্ধ লামা রিকশা থেকে নামল। আর একদল লামা ফুটপাতে টেবিল পেতে, বোওল থেকে ফিশবল সুপ আর চিকেন বান খাচ্ছে। এক চিনা মহিলা ফুটপাতে টুল পেতে সসেজ, রেড রিমড প্রন পাঁপড়, মোকা বা রাইস কেক বিক্রি করছে। এক বাঙালি দম্পতি এসেছে। বাও বা রাউন্ডেড ব্রেড স্টাফড উইথ মিট খেতে-খেতে নীল কার্ডিগান পরা, অসম্ভব ফর্সা বউটি বলল, "ইটস লাইক ম্যাকবার্গার, না?"

তার ভুঁড়িওয়ালা কর্তা বলল, "টোফু ট্রাই করো।"

"চল, আমরা মিস্টার ইয়েনের কাছে যাই। ওখানেই সব চেয়ে ভাল সিউমাই পাওয়া যায়," স্কুটার থেকে নেমে বলে সুলতান। সিউমাই! স্মৃতির সার্কিট ঘেঁটে মধুরা মনে করার চেষ্টা করে, 'সিউমাই' শব্দটা কোথায় পড়েছে বা শুনেছে। মনে পড়েও যায়। এর মানে ফিশ পেস্ট।

"প্রিলিমসের রেজাল্ট কী দাঁড়াল?" রাস্তায় ফুল বিক্রি করতে থাকা দোকানিদের টপকাতে-টপকাতে বলল সুলতান।

"রত্নাবলী শর্মা, নেহা পারেখ, ঐশ্বর্যা নায়ার, গুরপাল সিং আর মধুরা ভৌমিক।"

"পাঁচজন কেন? দশ জন হওয়ার কথা না?"

"বাকি পাঁচটা বাঙালি বউ। চন্দ্রাণী ছাড়া কারও নাম জানি না।"

"কম্পিটিটরদের নাম জানিস না? কনফিডেন্স ভাল। ওভার কনফিডেন্স ভাল নয়," মিস্টার ইয়েনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে মধুরাকে বলে সুলতান। সিউমাই-এর দুটো শিশি কেনে। মিস্টার ইয়েন বলেন, "এনিথিং এলস? সয়া সস? মাঞ্চুরিয়ান সস? ভিনিগার? চাইনিজ হার্ব?"

"সসেজ দাও।"

"দোন্ত তেক দিস! দিস ইজ নত দ্য বেস্ত লত," 'টু' বর্ণকে 'ত'য়ে বদলে কথা বলছে মিস্টার ইয়েন, "বেত্তার তেক ফ্যাত মামাজ় সসেজ। দে আর ফ্রেশ অ্যান্ড নন স্মেলি," উল্টো ফুটে বসে থাকা ভীষণ মোটা এক চিনা মহিলার দিকে আঙুল দেখায় ইয়েন। অবাক হয়ে মধুরা ভাবে, এদের সঙ্গে সুলতানের র‍্যাপো খুব ভাল তো! তা না হলে কেউ নিজের বাজার খারাপ করে কাস্টমারকে অন্য দোকানদারের কাছে পাঠায়?

"থ্যাঙ্কস ইয়েন," ফুটপাত বদল করে সুলতান। ফ্যাট মামার কাছ থেকে সসেজ কিনে সসের দোকানে ঢুকতে-ঢুকতে বলে, "সেকেন্ড ফেজ়ের শুটিং কবে শুরু হবে?"

"ফার্স্ট ফেজ়ের শুটিং গতকাল শেষ হয়েছে। আজ আর কাল শুটিং নেই। নিশিগন্ধা সিনেমার শুটিংয়ের জন্য হায়দরাবাদ গিয়েছে। মিজান বাংলাদেশ গিয়েছে। আমাদেরও তাই ছুটি।"

"মুখশুদ্ধি রাউন্ডে কী-কী রাঁধতে দিয়েছিল?"

"প্রথম দিন লুচি আর ছোলার ডাল। দ্বিতীয় দিন গাজরের হালুয়া। তৃতীয় দিন চিকেন পাস্তা স্যালাড। চতুর্থ দিন ক্যারট অ্যান্ড জিঞ্জার সুপ। শেষ দিন করিয়েন্ডার কালামারি রিং।"

"বাঃ! বেশ ছড়ানো প্রিপারেশন। বাঙালি, ভারতীয়, আন্তর্জাতিক, সব রকম স্টাটার রেখেছে।"

"ওদের রিসার্চ টিম গতকাল বাড়িতে এসেছিল। বাবা, মা, বিমলকাকা, সবিতাদি — সবার ছবি তুলল। আলাদা করে ডেকে কীসব গুজুরগুজুর ফুসুরফুসুর করল। সেগুলো ওরা আমায় ডাইভালজ করেনি। জিজ্ঞেস করলে মুচকি হাসছে!"

"টেলিভিশনের এফেক্ট। ওরা এখন নিজেদের তোর রক্ষাকর্তা ভাবছে।"

"রক্ষাকর্তা মাই ফুট!"

"ওসব বললে হবে না। একটা জিনিস খেয়াল করেছিস, আগে রিয়্যালিটি শোতে অ্যাঙ্কররা বলত, মধুরা ভৌমিকের শো থেকে বেরিয়ে যাওয়া আটকাতে এই টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করুন। এখন বলে, মধুরা ভৌমিককে বাঁচাতে এই টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করুন। টিভির দর্শক এখন ত্রাতা। টিভি বলে, তোমার হাতে এই যে রিমোটটা রয়েছে, এইটা তোমার জাদুদণ্ড। এটার মাধ্যমে তুমি কাউকে বাঁচাতে পার। তুমিই এই জগতের রক্ষাকর্তা!"

মধুরা অবাক হয়ে বলল, "খুব ভাল বললে তো! আমি এভাবে কখনও ভাবিনি!"

"একে বলে দুনিয়াদারি!" কাঁধ ঝাঁকায় সুলতান, "সমস্ত টিভির বিজ্ঞাপনে খেয়াল করবি, একটাই গপ্পো। প্রথমে একজন হেরো মেয়ে থাকে। বরের জামা পরিষ্কার হয়নি বলে গালাগাল খাচ্ছে, ছেলে পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করেনি বলে ম্যাম স্কুলে তলব করে, ধোপা ধাতানি দিচ্ছে, ঝি কাজ ছেড়ে দেবে বলে চোখ রাঙাচ্ছে, মায় যার জন্য এত, সেই কোলের ছেলেটাও আর পাত্তা দিচ্ছে না। কখনও সেই মেয়েটা কালো বলে বিয়ে হচ্ছে না। তিরিশ পেরলেই চোখের চারদিকে বলিরেখা আসছে। তখন বর অন্য মেয়েকে ঝাড়ি মারছে। তারপরই জাদু! এসে গেল নতুন ফেয়ারনেস ক্রিম, নতুন কাপড়কাচা সাবান, নিউ অ্যান্ড ইমপ্রুভড বাসন মাজার কেক, অল্টা মলিকিউল যুক্ত স্কিন সেরাম, হেয়ার এক্সপার্টের তৈরি করা শ্যাম্পু। আর সেই মেয়েটা হেরো থেকে হিরোইন হয়ে গেল! পড়শির ঈর্ষা, পরিবারের গর্ব!"

"তা ঠিক!" অনিশ্চত ঘাড় নাড়ে মধুরা, "কিন্তু টিভি কি শুধু মেয়েরা দেখে? ছেলেরা তো দিব্যি টিভি দেখে। বাবা, দাদা, শুভ্র..."

"জেনারেল এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলের প্রথম এবং শেষতম দর্শক বাড়ির বউ। ন্যাশনাল লেভেলই হোক বা বাংলা, নারীচরিত্র কেন্দ্রিক সিরিয়াল ছাড়া অন্য কোনও সিরিয়াল দেখেছিস? আর 'পাঁচফোড়ন' সিরিয়ালের ফরম্যাটটা একদম বাড়ির বউদের ট্যাপ করার জন্য।"

"একটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। আগে কালো বলে মেয়েদের বিয়ে হত না। এখন কালো বলে মেয়েরা এয়ার হোস্টেস অথবা মিস ইন্ডিয়া হতে পারছে না। অর্থাৎ কাজ পাচ্ছে না। অর্থাৎ 'ছেলেদের চাকরি, মেয়েদের বিয়ে,' এই প্যাট্রিয়ার্কাল ট্র্যাপ থেকে গল্পটা বেরিয়েছে।"

"সময় বদলাচ্ছে, অথচ বাজারের চাহিদা এক থাকছে। তাকে ক্রমাগত মাল বিক্রি করতে হবে। এই সব উপরচালাকি আসলে মাল বিক্রির নতুন ছক। ওসব ছাড়। তোর দাদা-বউদির ইন্টারভিউ নেয়নি?"

"নিয়েছে। রিসার্চ টিম দাদার ফ্ল্যাটে হাজির হয়েছিল। অ্যানি বলল, অফিসেও গিয়েছে। অ্যানি, শুভ্র, স্যান্ডি, সকলের ইন্টারভিউ নিয়েছে।"

"হুম!" স্যান্ডির নাম শুনে গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়ে সুলতান, "চল, কেনাকাটা

সেরে ফেলি। ছ'টা বাজতে যায়। এর পর ব্রেকফাস্ট শেষ হয়ে যাবে।"
সসের দোকান থেকে নানা রকমের বোতল আর শিশি কেনে সুলতান। বেশিরভাগই মধুরার চেনা। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে এখানকার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি দামে বিক্রি হয়। টাকা মিটিয়ে সুলতান আবার ফ্যাট মামার কাছে যায়। দুটো প্ল্যাস্টিকের বোওলে ফিশ বল সুপ আর দু'টো প্লাস্টিকের প্লেটে ডিমসাম নিয়ে একটা টেবিলে রাখে। বৌদ্ধ লামারা চলে গিয়েছে। নীল কার্ডিগান গিন্নি আর ভুঁড়িওয়ালা কর্তার জুটিও উধাও। শাল গায়ে দিয়ে, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে উত্তর কলকাতার এক কর্তা আর মাফলার জড়ানো তার আহ্লাদি গিন্নি এখন মন দিয়ে রাইস কেক খাচ্ছে।
ফিশবল সুপটা বেশ খেতে। সামান্য তেল-মশলা দিয়ে সাঁতলানো। মাছটাও চমৎকার সেদ্ধ হয়েছে। কুচি-কুচি পেঁয়াজকলি আর বিট-গাজর ভাসছে। এক চামচ সুপ সন্তর্পণে মুখে ঢেলে মধুরা বলে, "আমাকে ডাকলে কেন বললে না তো?"
সুলতান চামচ দিয়ে ডিমসাম কাটছিল। ময়দার ঢাকা সরিয়ে দেখলে কীসের স্টাফিং। "পর্ক!" আপনমনে বলল।
অর্ধেক ডিমসাম মুখে পুরে চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে-তারিয়ে স্বাদ উপভোগ করল, মধুরার প্রশ্ন যেন শুনতে পায়নি।
"কী হল? বললে না তো?" সুলতানের প্লেট থেকে একটা ডিমসাম তুলে নিয়ে বলে মধুরা।
"আমি রিসার্চ টিমের কথা ভাবছিলাম," পর্ক চিবোতে-চিবোতে বলে সুলতান, "তোর অফিসে পর্যন্ত পৌঁছে গেল!"
"তো?"
"ওদের কত সুবিধে হল ভাব। একই জায়গায় দু'জন কন্টেস্ট্যান্টের পরিচিত লোকজনের ইন্টারভিউ নিয়ে নিল।"
সুলতানের কথা শুনে খাওয়া বন্ধ হয়ে যায় মধুরার। কী বলতে চাইছে সুলতান? দু'জন কন্টেস্ট্যান্টের পরিচিত লোক মানে? ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় মধুরা ভৌমিক ছাড়া আর কোন প্রতিযোগীর চেনাশোনা লোক আছে?
হঠাৎ একটা সন্দেহ মধুরার মাথায় চাগাড় দেয়। মেরি তাকে কেন এসপ্ল্যানেডে ডেকে পাঠিয়েছিল? কেন অনাদি কেবিনে বসিয়ে মোগলাই পরোটা খাইয়ে জেনে নিয়েছিল 'পাঁচফোড়ন'-এর হাঁড়ির খবর? মেরির এত কীসের কৌতূহল? মনে-মনে প্রথম ১০ জন প্রতিযোগীর কথা ভেবে নেয় মধুরা। এদের মধ্যে কেউ কি মেরির চেনা? মধুরার কাছ থেকে শোনা টুকরোটাকরা খবর মেরি সেই প্রতিযোগীর হাতে তুলে দিয়েছে। ইনফরমেশন ইজ় পাওয়ার। নিজের অজান্তে মধুরা তার কম্পিটিটরের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে মধুরা। বলে, "মেরি মাসি! আমার আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল।"
"মেরি নয়, অ্যানিও নয়," সংক্ষিপ্ত জবাব সুলতানের।
"যিশু?"
"না।"
"শুভ্র?" পর্কের টুকরো চামচেতে তুলেছে মধুরা।
"না।"
"তা হলে?" শ্রাগ করে মধুরা, "এবার তা হলে সকলের নাম করতে হয়!"
"তুই আসলটা মিস করে গেলি,"
ক্যাজুয়ালি বলে সুলতান, "স্যান্ডির পদবি কী?"
"সন্দীপ পারেখ। কেন?" প্রশ্ন করতে গিয়ে মধুরার চামচ থেকে পর্কের টুকরো ফুটপাতে পড়ে যায়, "ওঃ মাই গড! নেহা পারেখ!"
"নেহা স্যান্ডির বোন। নেহার জন্ম এবং পড়াশোনা কলকাতাতে। তারাতলা থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাশ করেছে। আমেরিকা থেকে কুকিং ও মিক্সোলজির উপরে ডিপ্লোমা করে সবে দেশে ফিরছে। পাঁচতারা হোটেল থেকে জয়েনিংয়ের অফার আছে। কিন্তু ও জয়েন করবে না। ও মিশেলিন-স্টার শেফ হতে চায়। খুব অ্যাম্বিশাস মেয়ে।"
"তাই স্যান্ডি আমার ছুটি নেওয়া নিয়ে এত ঝামেলা করছে!" মধুরার বিস্ময় কাটতে চাইছে না!
"একদম!" টেবিলে ঘুষি মারে সুলতান। নড়বড়ে টেবিল দুলে ওঠে, "ও জানে, বাকি প্রতিযোগীরা কোনও ইস্যু নয়। কিন্তু রান্নাপাগল মধুরা সমস্যা করতে পারে। তাই এত ফন্দিবাজি। ওয়ার্কোহলিক না ছাই! ও দু'দিনের মধ্যে কোলিগদের তোর পিছনে লাগিয়ে দেবে।"
"অলরেডি দিয়েছে," কেটে-কেটে বলে মধুরা, "গতকাল শুভ্র ফোন করে বলল, যিশু কমপ্লেন করেছে যে, এত ওয়র্কলোড নিতে পারছে না। শুভ্র অ্যাক্ট আ টিম লিড সেটা স্যান্ডিকে জানাতে বাধ্য হয়েছে। স্যান্ডি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে যিশুর কথা শুনেছে এবং শুভ্রকে বলেছে ওভার টেলিফোন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সেটাই শুভ্র করেছিল। আমাকে বলল, আগামীকাল থেকে জয়েন করে যেতে। না হলে, "উই উইল লুক ফর রিপ্লেসমেন্ট।' এখন বুঝতে পারছি, এসব স্যান্ডির বদমাইশি!" রাগে ফুটতে-ফুটতে মধুরা বলে, "বাই দ্য ওয়ে, তুমি এত কথা জানলে কী করে? ব্ল্যাপস্টিকের রিসার্চ টিমের গোপন তথ্য তো তোমার জানা কথা নয়।"
"ভুলে যাচ্ছিস মধুরা," স্কুটারে শিশি-বোতলের পোঁটলা তুলে কাঠ-কাঠ হাসে সুলতান, "তুই যে খেলায় সদ্য নেমেছিস, আমি একসময় সেই খেলার চ্যাম্পিয়ান ছিলাম। এখন আহত হয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে গিয়েছি বটে, কিন্তু এই খেলার নিয়ম আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। এসব ফালতু তথ্য জোগাড় করা আমার কাছে হাতের পাঁচ।"
ফিশ বল সুপ আর ডিমসামের দাম মিটিয়ে মধুরা বলে, "পাঁচফোড়নের আমার নাম দেওয়া নিয়ে তোমার এত কৌতূহল কেন সুলতানদা? ক'দিন আগেও তো তুমি আমাকে চিনতে না।"
"ঠিক কথা!" স্কুটারের সিট থাবড়ে ধুলো ওড়ায় সুলতান, "উত্তরটা দু'জনের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত। শেফ সুলতানকে চোর প্রমাণ করে, জেল হাজত খাটিয়ে ফুটপাতে বসিয়েছিল কেউ একজন। আমি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার একটা সৈনিকের দরকার। এমন সৈনিক, যে রান্না করতে ভালবাসে। জানতাম, একদিন না-একদিন কাউকে পাবই। উপরওয়ালা তোকে পাঠিয়ে দিল!"
"আমি এত জটিল কথা বুঝি না," অভিমানে ঘাড় বাঁকায় মধুরা। পৌনে সাতটা বাজে। এখন স্টার্ট না করলে কৃশানুর অফিস বেরনোর আগে বাড়ি পৌঁছনো যাবে না।
"সোজা কথাটা হল, তুই একজন জিনিয়াস কুক! জিনিয়াস মানে বুঝিস?"
"না। বুঝতেও চাই না।"
"বাঙালি মেয়ে মাত্রই রান্নাবান্না জানে। এটা তোদের রক্তে আছে। বাঙালি রান্নার মতো এত বৈচিত্র খুব কম জনগোষ্ঠীর মধ্যে আছে। কার্বোহাইড্রেটের ডেলি ডোজ অনেক খাবার থেকে আসে। পুরি বল, পাস্তা বল, নুডলস বল, চাপাটি বল, হামাস বল, পরোটা বল, সব এক জিনিস। কিন্তু ফুলকো-ফুলকো লুচি? ওটা বেস্ট অফ দ্য লট। খাদ্যকে দেখতে সুন্দর করে দেওয়া, নানা ফ্লেভারকে সিমফনির মতো ফুটিয়ে তোলা — এটা ফরাসি আর বাঙালিরা সবচেয়ে ভাল পারে।"
"সব বাঙালি মেয়ে রান্নাবান্না পারে না। আমার বউদিই পারে না।"
"আমি বলতে চাইছি, কয়েক কোটি বাঙালি মেয়ের মধ্যে কয়েক হাজার ভাল রাধুনি। তাদের রান্নার ন্যাক আছে। তারা

কখনও খারাপ রাঁধে না। এই কয়েক হাজারের মধ্যে শ'খানেক আছে জবরদস্ত। যাদের হাতে ঘাসভাজাও অমৃতের সমান হয়ে যায়! শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক ভাবে তারা একের পর এক ডিশ ভেবে ফেলতে করতে পারে। এই শ'খানেকের মধ্যে আছিস তুই। যে নিজেও জানে না, তার মধ্যে কী অসম্ভব প্রতিভা লুকিয়ে আছে!"

"তুমি জ্যোতিষী নাকি যে, ভবিষ্যদ্বাণী করছ?"

"না। আমি জরুরি তথ্যগুলো দিচ্ছি। যেদিন তুই শুধুমাত্র মশলা দেখে আর শুঁকে বলেছিলি, আমি মালাবার ফিশ কারি বানাচ্ছি, সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম। তুই নিজেও জানিস মধু, রান্নায় তুই মুক্তি খুঁজে পাস। অফিসে বসের কাজ করতে গেলে ঘাবড়ে যাস, টিম লিডের হুকুম মানতে কান্না পায়, কোলিগের অনুরোধ রাখতে নাভিশ্বাস ওঠে। সবাই যখন তোকে হেরো প্রমাণ করতে চায়, প্রমাণ করতে চায় তুই

লাথি মারে সুলতান। নড়বড় করতে-করতে লালবাজার স্ট্রিটের দিকে এগিয়ে যায়। দৌড়ে রাস্তা পেরয় মধুরা। দেরি হয়ে গিয়েছে। গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে-দিতে ভাবে, দাদা বেরনোর আগে বাড়িতে পৌঁছতেই হবে।

আর আগামী পরশু নিজের সেরা পারফরম্যান্সটা দিতে হবে। গাড়ি চালিয়ে মধুরা সাঁ-সাঁ করে হাওড়া ব্রিজের দিকে এগোয়।

১২

সেকেন্ড রাউন্ডের শুটিং শেষ হয়েছে গতকাল। রাউন্ডের নাম ছিল, 'খাই খাই।' আব্রাহাম বলেন, "তোমাদের ১০ জনকে এই রাউন্ডে একটা সাইড ডিশ বানাতে হবে পাঁচজনের জন্য। তবে এবার শুধু রান্না করা নয়। ডিশের নাম শুনে, বাজারে গিয়ে প্রতিটি উপকরণ কিনে আনতে হবে। রান্না করার সময়ে 'এটা নেই! ওটা কিনতে

সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে স্নান সেরে, জিন্‌স আর কুর্তি গলিয়ে কৃশানুর পাশে বসে পড়েছে মধুরা।

ফেকলু, যখন তোর বুকে মনখারাপের মেঘ জমে ওঠে, তখন তুই ক্যালকাটা ধাবায় কুটনো কুটে, মশলা বেটে, থালা-বাটি-গেলাস ধুয়ে, ডেকচি-কড়াই নাড়াচাড়া করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচিস! তোর মুক্তি রান্নাঘরে। তুই এত দিন বুঝিসনি। আজ আমি বানান করে বুঝিয়ে দিলাম।"

"মেয়েদের মুক্তি রান্নাঘরে নেই," বিড়বিড় করে মধুরা, "কিচেন আর বেডরুমে মেয়েদের আটকে রাখার এটা একটা ছক। ছেলেদের বদমাইশি।"

"বস্তাপচা বুকনি আওড়াস না। নিজেকে জান। ভিতরে তাকা। যা সকলের ক্ষেত্রে সত্যি, তা তোর ক্ষেত্রে সত্যি না-ও হতে পারে। শেফ হওয়া একটা দুর্দান্ত কেরিয়ার অপশন। যার উত্থানের কোনও অন্ত নেই। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কাচের কফিনের মধ্যে, কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকিয়ে আস্তে-আস্তে বুড়িয়ে যাওয়ার চেয়ে হাজার গুণ ভাল একটা কাজ," স্কুটারের গিয়ারে

ভুলে গেছি!' বলে কাঁদুনি গাওয়া চলবে না। বাজারে একবারই যাওয়া যাবে।"

মিজান আব্রাহামের মতো কড়া ধাঁচের বিচারক নন। হাসিখুশি ও মৃদুভাষী মানুষটি বললেন, "ডিশের নাম শোনার পরে ফর্দ বানিয়ে, বাজার করে ডিশ বানাতে মোট দু' ঘণ্টা সময় দেওয়া হবে। ঠিক আছে?"

নিশিগন্ধা চুলের গুছি কানের পিছনে সরিয়ে বললেন, "মেথি টিমে আছে রত্নাবলী শর্মা আর সোমা মণ্ডল। তোমাদের সাইড ডিশ হল, রুইমাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল।"

আব্রাহাম বললেন, "ইয়োর টাইম স্টার্টস নাউ!"

নামে রিয়্যালিটি শো হলেও সব শো-ই আসলে স্ক্রিপ্টেড। নির্দিষ্ট একটা প্রবলেমের কথা ভেবে শুটিং শুরুর আগে অর্ণব আর শ্রাবন্তী মিটিং করেছিল। অর্ণব বলেছিল, "গ্রিনল্যান্ড ক্লাবের আশেপাশে কোনও ভাল বাজার নেই। ভিশুয়ালি এক্সাইটিং ওয়েল স্টকড বাজার বলতে ফোরশোর রোডের রিভারসাইড মলস। এখান থেকে চার কিলোমিটার দূরে।"

"মাঝখানে অন্তত দশটা ক্রসিং। এখান থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে বাজার করে ফিরতে দু' ঘণ্টা লেগে যাবে!" বলেছিল শ্রাবন্তী।

"আমরা তা হলে যাতায়াত পর্বটা এডিট টেবিলে বাদ দিয়ে দেব। তুমি স্ক্রিপ্টে সেটা প্ল্যানফুলি ঢুকিয়ে দিও," অর্ণব সাজেশন দিয়েছিল।

সেই মতো শুটিং হল। 'মেথি' টিমে ফার্স্ট হল রত্নাবলী। পরের চারটে টিম থেকে নেহা, মধুরা, ঐশ্বর্যা আর গুরপাল। এদের সাইড ডিশ ছিল পালক পনির, কর্ন অন দ্য কচ উইথ পারমেজান চিজ, মিরচি কা সালান আর শ্রিম্প স্টাফড জুকিনি ফ্লাওয়ারস। পঞ্জাবি, ইতালিয়ান, দক্ষিণ ভারতীয় এবং আমেরিকান সাইড ডিশ।

'খাই খাই' রাউন্ড চলার সময়ে প্রতিযোগীদের মধ্যে হালকা বন্ডিং তৈরি হয়েছে। সকলেই সকলের মোবাইল নম্বর নিয়েছে। হালকা গপপোগুজবও হয়েছে। গতকাল শুটিং সেরে মধুরা বাড়ি ফিরছে, এমন সময়ে নেহার ফোন। "হাই মধু! কেমন আছ?"

'ভাল,' সন্তর্পণে উত্তর দেয় মধুরা, "তোমার কী খবর?"

"ঠিক হ্যায়! কাল আর পরশু রেস্ট ডে। তুমি একবার আমাদের বাড়ি ঘুরে যাও। জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে," নেহার হঠাৎ আমন্ত্রণ।

মধুরা অবাক। অ্যাভয়েড করার জন্য সে বলে, "তুমি কোথায় থাক আমি জানি না। তা ছাড়া বাড়িতে নানা কাজ আছে..."

"আমি তোমার বসের বোন বলে হেজিটেট করছ?" হালকা হেসে বলে নেহা, "স্যাভিকে নিয়ে বদারড হোয়ো না। হি ইজ আ গুড হোস্ট। ঠিকানাটা লিখে নাও। ক্যালকাটা ইস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি। অ্যাকশান এরিয়া ফোর। কটেজ নাম্বার সেভেন। কটেজ নেম, লেমনগ্রাস। ক্লিয়ার?"

মোবাইলে ঠিকানা লিখতে-লিখতে মধুরা বলে, "ক্লিয়ার। আমি দেখছি কবে যাওয়া যায়..."

"দেখাদেখির কিছু নেই। কাল চলে এসো।"

"কাল?"

"হ্যাঁ। অ্যারাউন্ড টেন এ এম?"

"আচ্ছা," বলে মধুরা। প্রতিদ্বন্দ্বীকে তার নিজের টার্ফে জাজ করার একটা সুযোগ এসেছে। ব্যবহার করা উচিত।

"কাল দেখা হচ্ছে, বাই," ফোন কেটে দেয়

নেহা।

আজ সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে স্নান সেরে, জিন্‌স আর কুর্তি গলিয়ে কৃশানুর পাশে বসে পড়েছে মধুরা। বলেছে, "নিউ টাউন যাব। লিফ্‌ট দিবি?"
মনোহর রোদে পিঠ দিয়ে বাংলা কাগজ পড়ছিল। বলল, "চরকি কাটতে বেরনোর আগে বলে যাও, কোথায় যাচ্ছ, দুপুরের খাবার বাড়িতে খাবে কি না জানতে পারলে ভাল হয়। এটা হোটেলে নয় যে, রাত এগারোটার সময়ে চেক ইন করে হুকুম করবে, "এক কাপ চা আর এক প্লেট চিকেন পকোড়া দেখি!"
মনোহরের বলার ধরনে মধুরা হেসে ফেলে।
যূথিকা রান্নাঘর থেকে বলে, "চাউমিন তৈরি আছে। খেয়ে বেরো।"
চিনে সুতো গিলতে-গিলতে মধুরা বলল, "বিকেল চারটের মধ্যে ফিরে ভাত খাব। চল দাদা।"

ক্যালকাটা ইস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি। পূর্ব কলকাতার জলাজমি বুজিয়ে তৈরি হওয়া অতি বৃহৎ স্যাটেলাইট টাউনশিপ। পাঁচটা ফেজে কাজ হচ্ছে। অ্যাকশন এরিয়া ওয়ান, টু, থ্রি-এর কাজ কমপ্লিট। অ্যাকশান এরিয়া ফোর ও ফাইভের কাজ লোকচক্ষুর আড়ালে চলছে। প্রথম তিনটি এরিয়াতে তিরিশটা আখাম্বা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং। কুড়িতলার রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স থ্রি বি এইচ কের নীচে কোনও ফ্ল্যাট নেই। কমিউনিটি সেন্টার, চব্বিশ ঘণ্টা সিসিটিভি মনিটরিং, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জলের বন্দোবস্ত, জগার্স পার্ক, গলফ কোর্স, মাল্টিজিম, সুখী জীবনযাপনের যাবতীয় ব্যবস্থা নিপুণভাবে সাজানো রয়েছে। ফ্ল্যাটের ন্যূনতম দাম এক কোটি টাকা। মূলত অবাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও প্রবাসী বাঙালি মিলে সমস্ত অ্যাপার্টমেন্ট কিনে ফেলেছে। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরনোর এক মাসের মধ্যে বিক্রি কমপ্লিট। অ্যাকশন এরিয়া চার ও পাঁচে গেলে সিরিয়াস মানি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এখানে কোনও বহুতল নেই। আছে কটেজ, ফার্মহাউজ ও বাংলো। চারপাশে ফলের বাগান, পুকুর, পুষ্পোদ্যান। এসব বাসস্থানের ডিজাইনার আমেরিকান, বাগান করেছে জাপানি বিশেষজ্ঞ, ফলের বাগানের তত্ত্বাবধানে আছে মুম্বইয়ের ফার্ম চেন। নৈঃশব্দ্য, গাছগাছালির ঠান্ডা হাওয়া, পুকুর থেকে ভেসে আসা ভেজা বাতাস, পাখির ডাক, এসব বিনে পয়সায় পাওয়া যাবে। প্রতিটি কটেজের দাম পাঁচ কোটি টাকার আশেপাশে।
অ্যাকশন এরিয়া ফোর আগাগোড়া দেড় তলা সমান পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের মাথায় ইলেকট্রিক ফেন্সিং। সেখানে হাত লাগলে অবধারিত মৃত্যু। সারভাইল্যান্স ক্যামেরাও আছে। ফোরের এন্ট্রি পয়েন্টে সান্ত্রিদের ঘর। সেখানে পৌঁছে নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার লিখে নিজের গন্তব্য বলল মধুরা। গলায় ঝোলানো আই কার্ডে সান্ত্রীর নাম দেখা যাচ্ছে। বাবুলাল বারুই। বাবুলাল ইন্টারকমে লেমনগ্রাসের মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে, গলফ কার্টে করে মধুরাকে সাত নম্বর কটেজের সামনে পৌঁছে দিল। সৌরশক্তি চালিত এই ছোট্ট তিন চাকার যানে কোনও দূষণ হয় না। পৃথিবীর বুকে কোনও কার্বন ফুটপ্রিন্ট পড়ে না।
"পাঁচফোড়ন"-এর টেলিকাস্ট শুরু হয়ে গিয়েছে। অডিশন পর্ব পেরিয়ে এখন "মুখশুদ্ধি" পর্ব দেখাচ্ছে। এপিসোডে, টিভির বিজ্ঞাপনে শহরজোড়া ফ্লেক্স আর ব্যানারে প্রথম ১০ জন প্রতিযোগীর ছবি। তার মধ্যে মধুরাও আছে। তার দিকে তাকিয়ে বাবুলাল যেভাবে হাসল, মধুরার মনে হল, চিনতে পেরেছে। নিজেকে সেলিব্রিটি-সেলিব্রিটি মনে হল!
লেমনগ্রাস দু'তলা কটেজ। কটেজের দু'দিকে চারটে গ্যারাজ। গ্যারাজের আয়তন দেখে অনুমান করা যায়, ভিতরে এসইউভি রাখা আছে। কটেজের দরজায় ভিডিওক্যামেরা বসানো। পাশে মাইক্রোফোন। বাবুলাল কলিংবেল বাজানোর সঙ্গে-সঙ্গে স্যান্ডির গলা পাওয়া গেল, "কৌন?"
বাবুলাল তড়িঘড়ি চুল ঠিক করে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "ম্যাডাম কী গেস্ট আয়ি হ্যায়। মধুরা ভৌমিক।"
"মধুরা এসে গেছ? দাঁড়াও আমি আসছি। বাবুলাল, তুম আপনা জগাহ যা সকতে হো।"
"ওকে স্যর!" লম্বা সেলাম ঠুকে গলফ কার্ট চালিয়ে প্রবেশ দুয়ারে চলে গেল বাবুলাল।
"প্লিজ় ড়ু কাম," মেহগনি কাঠের পুরু দরজা খুলে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে স্যান্ডি। তার পরনে ফেডেড ব্লু জিন্‌স আর সাদা টি-শার্ট। পায়ে লাল রঙের চপ্পল। মধুরা বিশাল ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করল।
"নেহা তোমাকে ডাকল বটে, কিন্তু ও এখন ব্যস্ত। এসো, তোমাকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাই," ড্রয়িং রুমের মহার্ঘ সোফা টপকাতে-টপকাতে স্যান্ডি বলে, "এখানে থাকি আমি, আমার মিসেস আর ছেলে, বাবা আর নেহা। মিসেস ছেলের সঙ্গে মুভি দেখতে গেছে। এসো, আমার বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। মিট মিস্টার প্রদীপ পারেখ, মাই ফাদার।"
ড্রয়িং রুমের বাঁদিকে বিশাল লাইব্রেরি। চেয়ারে বসে ল্যাপটপে হিসেবনিকেশ করছেন বছর পঞ্চাশের সৌম্যকান্তি এক ভদ্রলোক। মধুরাকে দেখে বললেন, "হ্যালো," বলার সময় চোখ মনিটারের দিকে।
নেহা কোথায়? অস্বস্তি হচ্ছে মধুরার। স্যান্ডির মা-ই বা কোথায়?
"এসো আমরা উপরে যাই," মধুরাকে নিয়ে দোতলায় নিয়ে যায় স্যান্ডি। পেল্লায় লিভিং এরিয়ায় বসিয়ে বলে, "জানো মধুরা,আওয়ার ফ্যামিলি ইজ় ইন্টু হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি ফর লাস্ট থ্রি জেনারেশনস। আমার ঠাকুরদা গুলাবচাঁদ পারেখ তাজ কন্টিনেন্টালে লিনেন কিপার হিসেবে জয়েন করে পেস্ট্রি ডিভিশনের শেফ হয়ে রিটায়ার করেন। আমার বাবা-মা ফর্মালি ট্রেনড। কলকাতার হোটেল ম্যানেজমেন্ট স্কুল থেকে ওঁদের ডিগ্রি আছে।"
"আপনার মা?"
"কৃষ্ণা পারেখ ডায়েড অফ সারভাইকাল ক্যান্সার ফাইভ ইয়ারস ব্যাক।"
"ওঃ! আয়্যাম সরি।"
"ইট্‌স অল রাইট। বাবা-মা"র লাভ ম্যারেজ ছিল। তবে এই পেশায় এত চাপ যে, প্রেম করার সময় পাওয়া যায় না। গ্র্যাজুয়েশনের পর মা চাকরি পেয়েছিল শেরাটন গ্রুপে আর বাবা ওয়েলকাম গ্রুপে। দু'জনে এক শহরে এক ছাদের তলায় থেকেছে খুব কম। ইট ওয়াজ় অলওয়েজ় আ লং ডিসট্যান্স ম্যারেজ। আমার বড় ভাই মনোজ যখন হল, বাবা তখন ব্যাঙ্ককে। আমি যখন জন্মাই তখন মুম্বইতে। নেহা হওয়ার সময়ে লন্ডনে। আমাদের ফ্যামিলি কখনও কোড্যাক মোমেন্টস শেয়ার করে উঠতে পারেনি। আমি সমস্যাটা বুঝি বলেই ফ্যান্টাস্টিক কুক হওয়া সত্ত্বেও এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসিনি।"
"ও," এর বেশি কিছু বলার চেষ্টা করে না মধুরা। যে নিজেই নিজেকে "ফ্যান্টাস্টিক কুক" উপাধি দেয়, সে ফ্রাস্ট্রেটেড। এসব লোকের কাছ থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। মধুরা কেন যে বোকার মতো নেহার আমন্ত্রণে রাজি হল!
"বাবা অ্যাট দ্য এজ অফ ফর্টি, চাকরি ছেড়ে দেয়। হি ওয়জ কমপ্লিটলি বার্ন আউট। মা তখন মুম্বইতে। বাবা কিছুদিন বাড়িতে বসে থাকল। তারপর সার্কাস অ্যাভিনিউতে ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে শুরু করল 'লেমনগ্রাস।' কলকাতার প্রথম

অথেনটিক চাইনিজ ফুড জয়েন্ট।"
"লেমনগ্রাস আপনাদের?" চোখ বড়-বড় করে জানতে চায় মধুরা। সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর এই ছোট্ট ফুড জয়েন্টের এখন কলকাতায় পাঁচটি শাখা। সারা ভারতে আরও দশটা। লন্ডনে একটা। শোনা যাচ্ছে, চায়নাতেও নাকি ব্রাঞ্চ খুলবে। এতক্ষণে পারেখ পরিবারের বিত্তের একটা আন্দাজ পেল মধুরা।
"হ্যাঁ। পারেখ ফ্যামিলি ওটা ওন করে। মনোজ রেস্ট অফ ইন্ডিয়ার অপারেশন দেখে। বাবা কলকাতার ব্রাঞ্চগুলো দেখাশোনা করেন। লন্ডনেরটা মা দেখছিল। মা মারা যাওয়ার পর এখন নেহার দায়িত্ব নেওয়ার পালা। অ্যান্ড শি ইজ় ভেরি কিন।"
"নেহা 'পাঁচফোড়ন'-এ নাম দিল কেন? এটা বাড়ির বউদের জন্য তৈরি করা একটা প্রোগ্রাম। আপনাদের মতো টপশটদের ওখানে মানায় না।"
"হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি তার চরিত্র বদলাচ্ছে। মনোজ বা বাবা ফেসলেস পিপল। ওরা সেলিব্রিটি নয়। সেলিব্রিটি কোশেন্ট একটা রেস্তরাঁকে আইডেন্টিটি দেয়। অ্যাজ় ওয়েল অ্যাজ় বিজনেস দেয়। তুমি নাইজেলা লসনের নাম জানো?"
"জানি," বিরক্ত বোধ করে মধুরা। স্যান্ডি তাকে কী ভেবেছে?
"নেহার আইডল হল নাইজেলা। শি ওয়ন্ট টু বি আ সেলিব্রিটি শেফ। নিজের শো, নিজের কুকবুক, নিজের ব্লগ, নিজের ওয়েবসাইট, নিজের ফ্যান ক্লাব। আমাদের আপত্তি নেই। নেহার ব্র্যান্ডভ্যালু বাড়লে লেমনগ্রাসের ব্র্যান্ডভ্যালু বাড়বে। কলকাতায় আপমার্কেট চাইনিজ় ইটারি সেগমেন্টে এখন টাফ কম্পিটিশন।"
"পাঁচফোড়ন-এ নাম দেওয়ার জাস্টিফিকেশন কী?"
"দ্যাখো মধুরা, আমরা অবাঙালি হলেও, জন্ম-কর্ম এই শহরে। তোমরা বাই বার্থ বং। আমরা বাই চয়েস বং। সেকেন্ডটা বেশি শক্ত। তাই নয় কি? আমরা চাইছি, নেহা কলকাতার বাঙালি সমাজে কাজ শুরু করুক। ও অনেক দূর যাবে। ন্যাশনাল লেভেল ইজ় হার প্লেয়িং ফিল্ড। কিন্তু রুটটা ভুলে গেলে চলবে না। শি হ্যাজ় টু ওয়র্ক হার্ড টু উইন বেঙ্গলস হার্ট।"
মধুরার বেজায় রাগ হচ্ছে। স্যান্ডি একটানা বকবক করে যাচ্ছে বোনকে নিয়ে। একবারও মধুরা সম্পর্কে, তার বাড়ি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করছে না। কায়দা করে মধুরা বলল, "আমাদের সুন্দর আড্ডা হল। নেহা কোথায়?"
"নেহা লাস্ট মিনিট প্রিপারেশনে ব্যস্ত। আমি আমাদের কিচেনে একটা শুটিং ইউনিট ইনস্টল করেছি। ওখানে ও রান্না করছে। টিমে ডিরেক্টর অফ ফোটোগ্রাফি, লাইটের লোক, এডিটর, মেকআপ আর্টিস্ট সব আছে। ওরা মনিটরে দেখে নিচ্ছে, কোথায় প্রবলেম। নেহা ইজ় আ ফ্যাবিউলাস কুক। কিন্তু শুধু ভাল রাঁধলেই তো হবে না, শি হ্যাজ় টু বি ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি। শুধু প্রেজেন্টেবল হলে হবে না। সেই জ়িং চাই, সেই এক্স ফ্যাক্টর চাই, যেটার জন্য নেহাকে অডিয়েন্স অ্যাকসেপ্ট করবে। ইমোশোনাল কানেক্ট।"
"ঠিক!" বিড়-বিড় করে মধুরা।
"শোনো মধুরা," তার চোখে চোখ রেখে বলে স্যান্ডি, "আই ওয়ান্ট টু বি ব্রুটালি অনেস্ট উইথ ইউ। 'পাঁচফোড়ন'-এ তোমার ফার্স্ট হওয়ার কোনও চান্স নেই। ফার্স্ট হবে নেহা।"
"আপনি জাজ নাকি?" তেরচাভাবে বলে মধুরা। স্যান্ডি ভদ্রতা, সভ্যতার সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে!
"হ্যাঁ। আমিই সবচেয়ে বড় জাজ। কারণ, আমি দর্শক হিসেবে কথাটা বললাম। তুমি আর নেহা, দু'জনেই ব্রিলিয়ান্ট কুক। কিন্তু নেহা ওর রূপের জন্য বেরিয়ে যাবে।"
মধুরা এতক্ষণে খেয়াল করল, স্যান্ডি তাকে একবারের জন্যও বসতে বলেনি। এক পেয়ালা চা অথবা এক গ্লাস জল অফার করেনি। গতকাল নেহা বলেছিল, "স্যান্ডি ইজ় আ গুড হোস্ট।" বাড়িতে ডেকে এনে অপমান করে মরাল ডাউন করার ছকটা মধুরার আগেই ধরা উচিত ছিল। বোঝা উচিত ছিল, একরাশ অপমান আসছে। আর কিছু করার নেই। এবার এখান থেকে কাটতে হবে।
"থ্যাঙ্কস ফর ইয়োর হসপিটালিটি!" রূঢ়ভাবে বলে মধুরা। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নামতে থাকে।
পিছন থেকে স্যান্ডি বলে, "তুমি ভাল রান্না কর মধুরা। ইউ উইল বি আ গুড হাউজ়ওয়াইফ। কিন্তু জেতার কথা ভুলে যাও।"
মধুরার চোখ ফেটে জল আসছে! এত রূঢ়ভাবে অপমানিত সে কোনওদিন হয়নি। সে কেন আসতে গেল, এসব বড়লোকদের বাড়িতে?
"আর একটা কথা শুনে যাও," দোতলার ল্যান্ডিং থেকে বলে স্যান্ডি, "সুলতানের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? ও কি তোমার বয়ফ্রেন্ড?"
একতলার ডানদিকে একটা ঘরের দরজা খুলে হঠাৎ বেরিয়ে এল নেহা। ঘর থেকে লোকজনের কথাবার্তা, আলোর ঝলকানি, জেনারেটর চলার ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ আসছে। নেহা ওই ঘরেই প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মধুরাকে দেখে বলল, "সরি, তোমায় আসতে বলে নিজেই বিজ়ি হয়ে পড়লাম। কিছু মনে কোরো না।"
"ঠিক আছে," বিড়-বিড় করে মধুরা। তার মাথাটা স্যান্ডি মাইক্রোআভেনে ঢুকিয়ে সুইচ অন করে দিয়েছে। মাথা টগবগ করে ফুটছে!
"ওই বুড়োটা তোমার বয়ফ্রেন্ড?" আবার প্রশ্ন করে স্যান্ডি, "কী করে ওকে ছিপে গাঁথলে?"
"ইংরিজি প্রোভার্ব বলে, দ্য ওয়ে টু আ ম্যানস হার্ট ইস থ্রু হিজ় স্টম্যাক," হাসতে-হাসতে বলে নেহা, "আমি বলি, দ্য ওয়ে টু আ ম্যানস হার্ট ইজ় নট থ্রু স্টম্যাক, বাট আ প্লেস লিটল বিট লোয়ার! পেট নয়, ওটা তলপেট!"
মধুরার মুখ নিমেষে টকটকে লাল হয়ে যায়। রক্ত চলকে ওঠে দু' গালে, কানে, ঘাড়ে! আগুন চোখে সে চেঁচিয়ে ওঠে, "শাট আপ!" "লেমনগ্রাস" থেকে দৌড়ে বেরয় মধুরা। সাত নম্বর কটেজের বাগান পেরিয়ে গাছপালা ঘেরা সরণিতে আসে। নেহার বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাঁদতে-কাঁদতে, দৌড়তে-দৌড়তে প্রধান কটেজের দিকে আসছে মধুরা, এমন সময় বাবুলাল গল্‌ফ কার্ট নিয়ে হাজির। হাসিমুখে জানাল, "ম্যাডাম ফোনে বলেছেন, আপনাকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে।"
দ্রুত নিজেকে সামলায় মধুরা। চোখে কিছু একটা পড়েছে, এমন অভিনয় করতে-করতে কার্টে উঠে বসে। নিঃশব্দে কার্ট চালিয়ে গেট পর্যন্ত পৌঁছয় বাবুলাল। গেট খুলে দিয়ে বলে, "একটা কথা বলব ম্যাডাম?"
"বলুন," কান্না চেপে বলে মধুরা।
"আমি দারোয়ান। ক্লাস টেন ফেল। বড়লোকের চাকর। কিন্তু কাজের শেষে বাড়ি ফিরে মায়ের হাতের ভাত, গরম ডাল, আর আলুপোস্ত খেলে প্রাণে শান্তি আসে। গায়ে-গতরে খেটে যে রোজগার, সেই পয়সার কেনা খাবারের স্বাদ ফাইভ স্টার হোটেলের ডিনারের চেয়ে অনেক ভাল। ঘামের নুন থেকে তরকারিতে সোয়াদ আসে। নেহা ম্যাডাম ফাইভ স্টার হোটেলের ডিনার। আপনি আমার মায়ের হাতে রান্না করা ভাত আর আলুপোস্ত!"
মধুরার কান্না চাপার প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ। দু'চোখ উপচে অশ্রু তার গাল ভেজাচ্ছে। অ্যাকশান এরিয়া ফোরের গেট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অ্যাকশান এরিয়া থ্রি-র রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সে সুলতানকে ফোন করে।

"এখন ফোন কেন?" গাঁক-গাঁক করে বলে সুলতান।
"আমি ক্যালকাটা ইস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটির মেন এন্ট্রান্সে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাও!" কাঁদতে-কাঁদতে বলে মধুরা।
কয়েক সেকেন্ডের জন্য সুলতান চুপ করে রইল। তারপর বলল, "আসছি।"

মধুরাকে পিছনে বসিয়ে সুলতান স্কুটারে স্টার্ট দিল। ক্যালকাটা ইস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি, অ্যাকশান এরিয়া ফোর, কটেজ নাম্বার সাত, লেমনগ্রাস কটেজ থেকে যত দূর সম্ভব চলে যেতে-যেতে মধুরার মুখ থেকে আজকের অভিজ্ঞতা শুনে নিল। বিবরণ শেষ হতে রাস্তার ধারে স্কুটার দাঁড় করাল সুলতান। পুঁচকে চায়ের দোকানে খুনখুনে এক বুড়ি উদাস মুখে বসে রয়েছে। সামনে রাখা উনুনে কালো কেটলিতে চা ফুটছে। আশেপাশে জনমানব নেই। দুটো চা আর দুটো লেড়ো বিস্কুটের অর্ডার দিয়ে নড়বড়ে বেঞ্চিতে বসে সুলতান। বেঞ্চি থাবড়ে মধুরাকে বলে, "বোস।"
মধুরা বেঞ্চিতে না বসে স্কুটারে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়।
"বসবি না? স্যান্ডি বলেছে, আমি তোর লাভার। তুই কথাটা সিরিয়াসলি নিয়েছিস? এখন আমার পাশে বসতে অসুবিধে হচ্ছে?" জ্বলন্ত চোখে বলে সুলতান।
"তা না, আসলে..." স্কুটার ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় মধুরা।
"তা-ই! স্যান্ডির গেমপ্ল্যান পুরো সাকসেসফুল। ও চেয়েছিল, ফাইনাল রাউন্ডের আগে তোর মন ভেঙে দিতে, তোকে মেন্টালি হেরো বানাতে। ও সেটা পেরেছে। তোর শরীরের ভাষা বলছে, তুই হেরে গিয়েছিস। পরশুদিন তুই জিতবি না!"
"বাচ্চা মেয়েটাকে বকছিস কেন?" দু' ভাঁড় চা বাড়িয়ে প্রশ্ন করে বুড়ি।
"বাচ্চা নয় গো ঠাকুরমা। এসব মেয়ে চৌবাচ্চা! কিন্তু আসল জায়গায় গন্ডগোল। খেলতে নামার আগেই হেরে বসে আছে।"
"মেলা ফচরফচর করিসনি," সুলতানকে ধমকে বুড়ি কাজে মন দেয়।
সুলতান তারিয়ে-তারিয়ে চা খাচ্ছিল। ভাঁড় ফেলে, পয়সা মিটিয়ে মধুরাকে বলল, "রাগ কমেছে?"
"না!" দাঁত দিয়ে ঠোঁট টিপে বলল মধুরা।
"ভাল। ওই রাগটা, ওই অপমানটা পুষে রাখ। লোকে কুকুর-বিড়াল পোষে, মাছ-পাখি পোষে, চাকরবাকর পোষে। তুই অপমান পোষ! প্রতি মুহূর্তে ভাববি, লেমনগ্রাসের বাসিন্দারা তোর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছে। নেমন্তন্ন করে বাড়িতে ডেকেছে, বসতে বলেনি, এক গ্লাস জলও দেয়নি। তোকে দেখতে খারাপ বলেছে, তোকে হেরো বলেছে, তোর চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করেছে। বাবার বয়সি একটা লোককে তোর বয়ফ্রেন্ড বলেছে।"
"চুপ করো!" চেঁচিয়ে ওঠে মধুরা। পাঁঠাকে বলি দেওয়ার মুহূর্তে পাঁঠার গলা দিয়ে যে আর্তনাদ বেরয়, মধুরার গলা দিয়ে সেই আওয়াজ বেরয়, "একদম চুপ। একটাও কথা বলবে না আর!"
বুড়ি আঁতকে উঠে বলে, "মেয়েটা পাগলা নাকি?"
সুলতান স্কুটারে উঠে বলে, "ওঠ। আমি তোকে চিংড়িঘাটায় ছেড়ে দেব। ওখান থেকে ট্যাক্সি ধরে নিস। বাড়ি গিয়ে রেস্ট নিস।"
মধুরা স্কুটারের পিছনে চড়ে। স্কুটার চালাতে-চালাতে সুলতান বলে, "পরশু কী ডিশ রাঁধতে হবে, ধারণা আছে?"
"না," মধুরা নিজেকে সামলে নিয়েছে, "কেউ বলছে, একটা মেন কোর্স আর একটা সাইড ডিশ বানাতে দেবে। কেউ বলছে, মেন কোর্স আর ডেজার্ট বানাতে দেবে। তবে এগুলো গুজব!"
"আগে থেকে ভেবে মাথা খারাপ করে লাভ নেই। যা করবি, মন দিয়ে করবি। বার্নারের আঁচে, আভেনের হিট ওয়েভের মধ্যে নিজের অপমানটুকু মিশিয়ে দিবি। ওতে রান্নার স্বাদ বাড়ে।"
মধুরা উত্তর দেয় না। দেখতে-দেখতে চিংড়িঘাটা চলে এল। মধুরাকে নামিয়ে দিয়ে সুলতান উল্টো রাস্তা ধরল। মধুরা ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমন সময় মোবাইলের টুংটাং। মায়ের ফোন। যূথিকা চিবিয়ে-চিবিয়ে বলছে, "আর কতক্ষণ খাবার বেড়ে বসে থাকব? বেলা চারটে তো বাজে।"
"চারটে নয়, এখন সোওয়া তিনটে বাজে। চারটের মধ্যে বাড়ি ঢুকছি।" ফোন কেটে ট্যাক্সি ধরে মধুরা। আজ অনেক ধকল গেল। বাড়ি গিয়ে খেয়ে-দেয়ে লম্বা ঘুম দিতে হবে। না হলে পরশু কম্পিটিশনে টানতে পারবে না।
দু'বছর আগে গোয়ায় গিয়ে মধুরা প্যারাগ্লাইডিং করেছিল। প্যারাশুটে চেপে শূন্যে উঠে যাওয়ার পর উপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে যখন সব কিছুকে পুঁচকে, ছোট্ট, এন্তুটুকু লাগে, তখন সারা শরীর জুড়ে রক্ত প্রবাহিত হয় দ্রুত গতিতে। পালস্ বেড়ে যায়, মাথা ঝনঝন করে, পেটে মোচড় দেয়, গলা শুকিয়ে আসে। বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যেতে-যেতে মধুরার শরীরে এই মুহূর্তে সেরকম অনুভূতি হচ্ছে। হাতের মধ্যে হাত গুঁজে, চোখ বুজে মধুরা বলতে থাকে, "আই অ্যাম নট আ লুজার...আই অ্যাম নট আ লুজার...আমি হারব না...আমি কিছুতেই হারব না...আমি জিতবই!"

১৩

গ্রিনল্যান্ড ক্লাবের সামনে যখন ট্যাক্সি দাঁড়াল, ঘড়িতে ন'টা বাজতে পাঁচ। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ভিতরে ঢোকার আগে মধুরা খেয়াল করল, আজ এখানে গাড়ির সংখ্যা অনেক বেশি। অন্য দিন গোটাকুড়ি গাড়ি থাকে। বেশিরভাগই লড়ঝড়ে সুমো, সাফারি আর চারশো সাত পিকআপ ভ্যান, যার আদরের ডাক নাম "ছোট হাতি।" কয়েকটা মিনিবাস আর ট্যাক্সি থাকে সারাদিন ভাড়া খাটার চুক্তিতে। আজ তারা ছাড়াও অতিরিক্ত হিসেবে রয়েছে গোটদশেক জবরদস্ত এসইউভি। কলকাতার রাস্তায় ৭০-৮০ লাখ টাকার যেসব গাড়ি দেখা যায়, এগুলো তার মধ্যে পড়ে। এসব চকচকে গাড়ির পাশে ভাঙাচোরা স্কুটারে বসে ঠ্যাং দোলাচ্ছে সুলতান! হাতে লম্বা সিগারেট, মুখে মিচকে হাসি। কেটারিংয়ের যে ছেলেটা শুটিংয়ে লাঞ্চ সাপ্লাই করে, সে গদগদ মুখে সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে। তার হাতেও লম্বা সিগারেট। সুলতান লাইটার জ্বালিয়েছে। গান গাওয়া লাইটার থেকে শোনা গেল মান্না দে-র কণ্ঠস্বর, "আমি শ্রী-শ্রী ভজহরি মান্না..." দু'জনে ধোঁয়া ছাড়ল। সুলতান মধুরার দিকে তাকিয়েও দেখল না।
বয়েই গেল! স্টেডিয়ামের গেটে দাঁড়িয়ে থাকা সিকিওরিটির ছোকরাদের আই কার্ড দেখায় মধুরা। এরা তাকে চেনে। কিন্তু পদ্ধতিতে ত্রুটি রাখল না। সারা গায়ে মেটাল ডিটেক্টর বুলিয়ে, মেটাল ডিটেক্টর লাগানো ডোরফ্রেমের মধ্যে দিয়ে হাঁটিয়ে ও প্রান্তে পৌঁছে দিল। স্টেডিয়ামের দরজা খুলে দিয়ে বলল, "বেস্ট অফ লাক।"
"থ্যাঙ্ক ইউ!" হালকা হাসল মধুরা।
১০ হাজার স্কোয়ার ফুটের ফ্লোরে বসানো হয়েছে অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এয়ার কন্ডিশনিং মেশিন। ভিতরের তাপমাত্রা বাইরের চেয়ে পাঁচ ডিগ্রি কম। সোয়েটার পরেও শীত করতে লাগল মধুরার।
প্রতিযোগীদের জন্য নির্দিষ্ট রেস্টরুমের দিকে এগোল সে। এখানে প্রতিযোগীদের জন্য একটাই ঘর। বিচারকদের জন্য আলাদা তিনটে ঘর। ক্রুদের জন্য ডরমিটারি। স্কুপ চ্যানেলের অফিস, ল্যাপস্টিক প্রোডাকশন হাউজের অফিস,

রাইটারের ঘর, মেকআপ রুম, টয়লেট, চেঞ্জিং রুম, ছোট-ছোট এসব ঘর একদিকে পরপর তৈরি করা হয়েছে। অন্য দিকে কন্ট্রোল রুম। গাদা-গাদা কম্পিউটার, সাউন্ড সিস্টেম, আলোর যন্ত্রপাতিতে ঠাসা এই ঘর থেকে শুটিংয়ের কার্যকলাপ নির্ধারিত হয়। বাকি পুরো এলাকা জুড়ে, শুটিংয়ের ভাষায়, ফ্লোর। ফ্লোরের পিছনে অতি বৃহৎ স্ক্রিন বা এলসিডি। তাতে প্রোগ্রামের লোগো, বিজ্ঞাপন, পর্ব বিভাজন, সব কিছুর ইনপুট দেওয়া আছে। কন্ট্রোল রুম থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড বদলানো হয়। মেঝের ও দেওয়ালের রং আলো প্রক্ষেপণের ফলে নানা শেড নেয়। ফ্লোরে ক্যামেরার সংখ্যা আট। তিনটে ট্রলি ক্যামেরা। চারটে ফ্লোর ক্যামেরা। একটা জিমি জিব। এই ক্রেনের মুভমেন্ট কম্পিউটার দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্রেনবাহিত হয়ে ক্যামেরা আকাশ থেকে চিলের মতো নেমে প্রতিযোগীর মুখের কাছে চলে আসে। এসব ক্যামেরার একটাও স্ক্রিনে দেখা যায় না। এডিটিং টেবিলে বেছে-বেছে ক্যামেরাওয়ালা শট বাদ দেওয়া হয়। সাউন্ড সিস্টেমে 'পাঁচফোড়ন'-এর থিম মিউজিক, হাততালির আওয়াজ, হর্ষধ্বনি, চিৎকার এবং অন্য মিউজিক বাজানো হয়। অভিজ্ঞতা থেকে মধুরা জানে, এডিটিংয়ের সময় এই মিউজিক বাদ দেওয়া হয়। সাউন্ড রেকর্ডিং স্টুডিয়োয় ফ্রেশ মিক্সিং হয়।
ফাইনাল এপিসোড চলবে পাঁচদিন। আজ সেই পাঁচ পর্বের শুটিং। টেনশনে শুটিং ক্রুদের মুখ থমথম করছে।
রেস্টরুমে ঢুকে মধুরা দেখল রত্নাবলী মেকআপ শুরু করে দিয়েছে। নেহা আর ঐশ্বর্যা পোশাক নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে। গুরপাল খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বিচারক, অ্যাঙ্কর, প্রতিযোগী, সকলের মেকআপ করে সাহানা আর তার সাগরেদ বাবলু। রত্নাবলীর নিজের বিউটি পার্লার আছে বলে সে সাহানাকে পাত্তা দেয় না। নিজে মেকআপ করে।
অর্ণব ঘামতে-ঘামতে রেস্টরুমে ঢুকে বলল, "আধঘণ্টা ম্যাক্স। সাড়ে ন'টায় শুটিং শুরু হবে।"
"ইমপসিব্‌ল!" ঘুমোতে-ঘুমোতে বলল গুরপাল, "নিশিগন্ধা শিলিগুড়ি থেকে মর্নিং ফ্লাইটে আসছে। এয়ারপোর্ট থেকে এখানে আসতে এগারোটা বাজবে।"
"দ্যাট্‌স নট ইয়োর হেডেক। গেট রেডি বাই নাইন ফিফটিন!" ধমক দিয়ে বেরিয়ে গেল অর্ণব।
ন্যাপস্যাক লকারে পুরে বাথরুমে ঢোকে মধুরা। ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে মেকআপ রুমে ঢোকে। সাহানা নেহার মেকআপ করছে। বাবলু মেকআপ করছে ঐশ্বর্যার। কস্টিউম ডিজাইনার ইলিনা মধুরার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল, "কী পরবে?"
"ইউ সাজেস্ট?" মধুরা শ্রাগ করে।
"নেহা জিন্‌স পরছে। ঐশ্বর্যা সালোয়ার-কুর্তা, রত্নাবলী ড্রেস। তুমি কি শাড়ি পরবে? নাইস বট টাচ?"
"নো ওয়ে!" আপত্তি করে মধুরা, "শাড়ি পরে রান্না করা যাবে না। গিভ মি জিন্‌স আর সালোয়ার-কুর্তা।"
"গুরপাল কী পরছে?" মেকআপ নিতে-নিতে প্রশ্ন করে নেহা।
"জিন্‌স অ্যান্ড টি-শার্ট," নেহার প্রশ্নের জবাব দেয় বাবলু।
"মধুরা সালোয়ার বা ড্রেস পরুক। তা হলে একটা ব্যালান্স থাকবে," মন্তব্য করে নেহা। গত পরশু বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে মধুরাকে অপমান করার কথা তার মনে নেই!
নেহার কথায় পাত্তা না দিয়ে পোশাকের আলমারি খুলে অলিভ গ্রিন রঙের ডেনিম বের করে মধুরা। পোশাক নিয়ে ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল ইলিনা দেয়। খুব বিস্ফোরক কিছু না পরলে কোনও মন্তব্য করে না। সাদা টি-শার্ট আর কচি কলাপাতা রঙের শর্ট জ্যাকেট বেছে নেয় মধুরা। সাদা আর সবুজের কম্বিনেশনের কনভার্স শু আর সাদা মোজা বাছে। পোশাক নিয়ে চেঞ্জিং রুমে ঢুকে যায়।
যখন বেরল, নেহা আর ঐশ্বর্যার মেকআপ শেষ। গুরপাল নীল জিনস আর সাদা টি শার্ট পরে মেকআপে বসেছে। পাগড়ির রংও নীল। বাবলু তার মুখে ফাউন্ডেশন লাগাচ্ছে। মধুরা সাহানার সামনে বসে বলল, "চশমার ফ্রেম কী রঙের নেব? সবুজ? না কোনও কন্ট্রাস্ট কালার?"
"ইউজ রেড," ভিজে টিসু পেপার দিয়ে মধুরার মুখ মুছতে-মুছতে বলে সাহানা। মধুরার তেলতেলে ত্বক বলে ফাউন্ডেশন বেশি লাগাতে হয়। না হলে তেলা চামড়ায় আলো পড়ে রিফ্লেক্ট করে। চশমার কাচের রিফ্লেকশন তো আছেই। তা ছাড়া এই গায়ের রং! উফ, অসহ্য!
পাঁচজন প্রতিযোগী রেডি হয়ে রেস্টরুমে ফিরল পৌনে দশটায়। আব্রাহাম আর মিজানের মেকআপ হয়ে গেছে, কিন্তু নিশিগন্ধা এখনও আসেনি।

প্রোডাকশান রুমে অর্ণব, শ্রাবন্তী, সাহানা, ইলিনা, আরও কারা-কারা মিলে মিটিং করছে। টেকনিশিয়ানরা ব্যাকস্টেজে বিড়ি ফুঁকছে। প্রতিযোগীরা মোবাইলে খুটরখুটর চালাচ্ছে। এমন সময় ফ্লোর জুড়ে সাজো-সাজো রব! নিশিগন্ধা এসেছে!

টেকনিশিয়ানরা নিচু গলায় নিশিগন্ধার নামে অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করল। এত বিচিত্র গালি জীবনে শোনেনি মধুরা! ডিওপি রেডি, টেকনিশিয়ানস রেডি, অর্ণব মাইক হাতে রেডি, জিজাও সেজেগুজে রেডি। তিন বিচারক রেডি। নিশিগন্ধা এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় গাড়িতেই মেকআপ করে নিয়েছেন। অর্ণব মাইকে বলল, "রোলিং ক্যামেরা!"

আটটা ক্যামেরা একসঙ্গে রোল করতে শুরু করল। অতীত দিনে র-স্টক বা ফিল্মের দান বেশি ছিল। তখন এত বিলাসিতা করে শুটিং হত না। ডিজিটাল ক্যামেরা আসার পরে র-স্টকের কনসেপ্ট উঠে গিয়েছে। এখন ডিজিটাল রেকর্ডিং আর ডিজিটাল এডিটিংয়ের জমানা। আটটা ক্যামেরা একসঙ্গে রোল করাতে এক্সট্রা খরচ নেই।

"হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম," ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে নমস্কার করে জিজা, "ইয়ং হার্ট কুকিং অয়েল নিবেদিত অনুষ্ঠান 'পাঁচফোড়ন'-এর অন্তিম পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আজ সোমবার। সপ্তাহের প্রথম দিন। আজ থেকে আগামী পাঁচদিন আপনারা দেখতে পাবেন এই গ্র্যান্ড ফিনালে।"

শুটিং ক্রু এসে বিচারকদের মুখে কর্ডলেস মাইক ও কানে রিসিভার লাগিয়ে দিল। শুটিংয়ের ভাষায় টকব্যাক। এই টকব্যাকের মাধ্যমে কন্ট্রোল রুম থেকে অর্ণব এবং শ্রাবন্তী তাদের নির্দেশ দেবে।

"গত সপ্তাহে সেমি ফাইনাল পর্বে আপনারা দেখেছেন, কীভাবে ১০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে থেকে ফাইনাল রাউন্ডে উঠে এসেছে পাঁচ প্রতিযোগী। তাদের ডাকার আগে আমি বিচারকদের আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করব। শ্রী আব্রাহাম সেন, জনাব মিজান চৌধুরী ও নিশিগন্ধা সেনগুপ্ত।"

পারফেক্ট কিউ নিয়ে তিনজন সারিবদ্ধভাবে হেঁটে বিচারকদের আসন গ্রহণ করলেন। মধুরা শুনতে পেল অর্ণব বলছে, "আব্রাহামদা, আপনার চেয়ারটা একটু পিছিয়ে আছে। এগিয়ে নিন।"

"আমাদের বিচারকদের সঙ্গে আরও একবার আলাপ করিয়ে দিই। একদম ডান দিকে রয়েছেন আব্রাহাম সেন, সেলিব্রিটি শেফ, ফুড কলামনিস্ট। বর্তমানে মুম্বইয়ের হিলটন হোটেলের সঙ্গে যুক্ত।"

আব্রাহাম ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে নমস্কার করার ফাঁকে চেয়ার সামনের দিকে টেনে নিলেন। দর্শকরা বুঝতে পারল না।

"মাঝখানে রয়েছেন অভিনেত্রী নিশিগন্ধা সেনগুপ্ত। ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়া অভিনেত্রী এবং গ্রেট ফুডি!"

ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে মুক্তো ঝরানো হাসলেন নিশিগন্ধা।

"একদম বাঁ দিকে রয়েছেন মিজান চৌধুরী। হোটেল টিউলিপ বেঙ্গলের পাকোয়ান ফুড কোর্টের প্রধান শেফ ও ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্টের হসপিট্যালিটি কনসালট্যান্ট।

ক্লিন শেভ্‌ন, মাঝবয়সি, টাকমাথা মিজান ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে নমস্কার করলেন। "তিন বিচারকের পরে এবার আলাপ করানোর পালা আমাদের পাঁচ প্রতিযোগীর সঙ্গে।"

টকব্যাকে অর্ণব বলল, "রত্নাবলী, নেহা, গুরপাল, মধুরা, ঐশ্বর্যা। ইন দ্যাট অর্ডার।"

ক্রম মেনে পাঁচজনে ফ্লোরে ঢুকল। এলসিডি ঝলমলিয়ে উঠল 'পাঁচফোড়ন'-এর লোগোতে। শোনা গেল থিম মিউজিক, হাততালির আওয়াজ। ফ্লোরের ঠিক মাঝখানে পেল্লায় কুকিং রেঞ্জ। তার সামনে পাঁচজন দাঁড়াল। জিমি জিব ক্যামেরা টং থেকে ছবি নিচ্ছিল। মসৃণ উড়াল দিয়ে সে পাঁচজনের ক্লোজআপ নিয়ে আবার টঙে চলে গেল।

"রত্নাবলী শর্মা, আমাদের প্রথম ফাইনালিস্ট। ওর জন্য একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক," জিজার নির্দেশে তিন বিচারক ও পাঁচ প্রতিযোগী হাততালি দিল। নিজের জন্য করতালির কালচার একমাত্র টিভিতেই সম্ভব। ভাবল মধুরা।

"রত্নাবলীকে না বলে, লুকিয়ে-লুকিয়ে ওর বাড়ি, ওর পাড়া, ওর পার্লারে গিয়েছিলাম। একবার দেখে নেব, ওর কাছের লোকেরা ওর সম্পর্কে কী বলছে।"

টকব্যাকে মধুরা শুনতে পেল অর্ণবের গলার আওয়াজ, "এভি স্টিম।"

এলসিডি জুড়ে রত্নাবলীর উত্তর কলকাতার বাড়ির ছবি। চালতাবাগান লোহাপট্টিতে স্বামীর দোকান, বিধবা মা, পার্লারের বিউটিশিয়ান, পাড়ার লোকজন সফট্ ফোকাসে রত্নাবলীর রন্ধন প্রতিভা নিয়ে ভাল-ভাল কথা বলল। ব্যাকগ্রাউন্ডে ইনস্পায়ারিং মিউজিক।

এর পর নেহার পালা। আবার ক্যালকাটা ইস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি, আবার অ্যাকশান এরিয়া ফোর, আবার কটেজ নম্বর সেভেন। লেমনগ্রাস কটেজের মালিক প্রদীপ পারেখকে দিয়ে ইন্ট্রো শুরু হল। গাছে ঢাকা সরনি দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে প্রদীপ নেহার প্রথম রন্ধনকীর্তির কথা শোনালেন। তিন বছর বয়সে পিৎজার বেস তৈরি দিয়ে যার শুরু! তারপর একে-একে অ্যানি, যিশু এবং স্যান্ডি। ডিজিটাল ইন্ডিয়ায়, কাচের কফিনে বসে ক্যামেরার দিকে যখন তাকাল স্যান্ডি, মধুরার মনে হল, তাকেই দেখছে! চোখ ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে মনে পড়ল আটটা ক্যামেরা রোল করছে। কন্ট্রোল রুমের আটটা মনিটরে প্রতিটি মুহূর্তের, প্রতিটি অ্যাঙ্গলের ছবি দেখা যাচ্ছে। এখন কোনওরকম বেচাল করা যাবে না। সাজানো হাসি মুখে লেপটে এলসিডির দিকে তাকিয়ে রইল মধুরা।

ক্লিপিংসের একদম শেষ প্রান্তে, তাকে চমকে দিয়ে পর্দায় এল বাবুলাল। নকল হাসি আর মিথ্যে বডি ল্যাঙ্গোয়েজ দিয়ে সে নেহা ম্যাডামের জয় প্রার্থনা করল!

চোখ কোনও কিছু লুকোতে পারে না। যতই তুমি হাসো, গালে টোল ফ্যালো, দু' আঙুল নেড়ে ভিকট্রি দেখাও, মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে তুলে বলো, "নেহা ম্যাডাম জিতবেই," বাবুলালের চোখ বিষণ্ণ! চোখ মিথ্যে বলে না। মধুরার এসব চিন্তার মধ্যে গুরপালের এভি স্টিম হয়ে গেল। ভবানীপুরের শিখ ফ্যামিলি ভাঙড়া নেচে আসর মাত করে দিল।

টিভির পর্দায় এখন মনোহর, "আমার মেয়ে ছোটবেলা থেকেই ভাল রান্না করে। আমি চাই, ও প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হোক।"

ভৌমিক মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ভিয়েন ঘরে যূথিকা ও বিমল। যূথিকা বলছে, "এখান থেকেই ওর রান্না শেখার শুরু। খুব ভাল মিষ্টি বানায়।" বিমল ব্যাকগ্রাউন্ডে ঘাড় নাড়ে। তিন তলায় মধুরার ঘরে সবিতা। উত্তেজিত হয়ে সে মধুরার আলুপোস্ত রান্নার গল্প বলছে! অফিসের কিউবিকলে শুভ্র, "ইয়া। শি ইজ ফ্যান্টাবুলাস কুক!" নাগেরবাজারের ফ্ল্যাটে কৃশানু, "ওর মলিকিউলার গ্যাস্ট্রনমিতেও ইন্টারেস্ট আছে।" নাগেরবাজারের ফ্ল্যাটে দিয়া, "আমি চাই মধুরার জয়।" নিজের অফিসে মেরি, "মধুরা রকস।" দত্ত ম্যানসনে নিজের ঘরে মঞ্জু ও গুরুপদ, "হ্যাঁ। ও খুব ভাল রান্না করে।"

প্রাণহীন এভি স্টিম। মধুরা বুঝতে পারল, কোনও মুহূর্ত তৈরি হচ্ছে না। কোনও ইমোশনাল কানেক্ট তৈরি হচ্ছে না দর্শকের সঙ্গে। কারণটাও সে বুঝতে পারল।

বাবুলাল যেমন নেহার জয় চায় না, এরাও সেরকম তার জয় চায় না। এরা শুধু রিসার্চ টিমের অনুরোধে বাইট দিয়েছে। সবিতা, মেরি আর দিয়া বাদ দিলে বাকিরা শুধুই কথার জাবর কেটেছে। শুধুই মিথ্যে বলেছে। দুঃখে, রাগে, অনুশোচনায়,

অপরাধবোধে মধুরার বুক ভারী হয়ে আসে। কে যেন তার বুকের বাঁ দিকে কয়লার উনুন জ্বালিয়েছে। নোংরা ধোঁয়া বেরিয়ে চোখে ঢুকে যাচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে। চোখ দিয়ে জল আসছে!

নিজেকে সামলায় মধুরা। আটটা ক্যামেরার যান্ত্রিক চোখকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটিয়ে করতালি দেয়।

টকব্যাকে শোনা যায় অর্ণবের গলা, "ঐশ্বর্যা, তোমার এভি স্টিম!"

এলসিডির দিকে তাকায় মধুরা। পিছন ফিরে থাকলে খুব কম ক্যামেরাই ক্লোজ আপ নেওয়ার চেষ্টা করে। স্ক্রিনে কী দেখাচ্ছে, মধুরার মাথায় ঢুকছে না। সে গত পরশুর কথা ভাবছে। স্যান্ডি আর নেহা মিলে তাকে যাচ্ছেতাইভাবে অপমান করল! সুলতানকে জড়িয়ে আজেবাজে কথা বলল! রাগে মধুরার শরীর জ্বলছে। সে বুঝতে পারছে, সুলতানের কথাই ঠিক! তার ভিতরে জমে থাকা যাবতীয় রাগ আর ঘৃণা আজ রান্নায় ঢেলে দিতে হবে। তবেই সে জিতবে। 'পাঁচফোড়ন' কোনও রিয়্যালিটি শো নয়। এটাই রিয়্যালিটি।

পরশু ক্যালকাটা ইস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটির রিয়্যালিটিতে যতগুলো থাপ্পড় সে খেয়েছে, আজ গ্রিনল্যান্ড ক্লাবের বাস্তবতায় ততগুলো থাপ্পড় সে ফেরত দেবে। পারলে দু'টো এক্সট্রা দেবে। এটা লিভ অ্যান্ড লেট লিভ-এর জমানা নয়। আজকের মন্ত্র হল, লিভ অ্যান্ড লেট ডাই! ঐশ্বর্যার পালা শেষ। মাইক হাতে জিজা আবার মঞ্চে। সে এগিয়ে গেল বিচারকদের দিকে, "আব্রাহাম, মিজান, নিশিগন্ধা, আজ ওরা কী ডিশ বানাবে? এ নিয়ে আপনারা কিছু ভেবেছেন?"

"হ্যাঁ। আমরা ভেবেছি," মাইক হাতে নিয়েছেন আব্রাহাম, 'পাঁচফোড়ন'-এর ফাইনাল রাউন্ড বলে কথা। টাস্ক একটু শক্ত হবে। কি মিজান, "তাই তো?"

"অবশ্যই!" ঘাড় নাড়েন মিজান।

"মুখশুদ্ধি" রাউন্ডে তোমরা স্টার্টার রান্না করেছিলে, "খাই খাই" রাউন্ডে রেঁধেছিলে সাইড ডিশ। ফাইনাল রাউন্ডের নাম "পেটপুজো।" এই রাউন্ডে তোমাদের রাঁধতে হবে তিন রকম পদ, "মেন ডিশ, সাইড ডিশ এবং ডেজার্ট!"

প্রতিযোগীরা ঘাড় নাড়ে। এরকম একটা গুজব হাওয়ায় ভাসছিল। সেটাই সত্যি হল।

"তবে এর মধ্যে একটা টুইস্ট আছে," এবার মাইকে নিশিগন্ধা, "কী রান্না করতে হবে, সেটা আমরা তোমাদের বলে দেব না। সেটা বলে দেবে ম্যাজিক বক্স। যেটা তোমাদের কুকিং রেঞ্জের পাশের টেবিলে রাখা রয়েছে!"

পাঁচজন একসঙ্গে তাদের বাঁ দিকের টেবিলে তাকায়।

"এখন তাকিয়ে কোনও লাভ নেই!" ঝরঝর করে হাসছে জিজা, "ম্যাজিক বক্স ঢাকা দেওয়া আছে। বিচারকমণ্ডলী বললে তবেই ঢাকা খুলবে।"

"যা বলছিলাম," মাইকে আবার মিজান, "ম্যাজিক বক্সে রান্নার যা-যা উপকরণ দেওয়া আছে, তার সবগুলো ব্যবহার করতে হবে। মেন ডিশ, সাইড ডিশ এবং ডেজার্ট, এই তিন রকম প্রিপারেশন রাঁধতে হবে। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, ট্র্যাডিশনাল বাঙালি পদ রাঁধতে হবে। সবক'টি উপকরণ ব্যবহার করে কোনও ফিউশন ডিশ রান্না করলে, সেটা যত ভাল খেতেই হোক না কেন, কোনও নম্বর পাবে না।"

"এখানে একটা কথা বলা ভাল," মিজানকে থামিয়ে আব্রাহাম বলেন, "আমাদের রিসার্চ টিম অনেক খুঁজে এই তিনটি ডিশ তৈরির উপকরণ রেখেছে। আমরা মনে করি, এই উপকরণ দিয়ে এই ডিশগুলোই বানানো সম্ভব। কিন্তু কেউ যদি তিনটি শর্ত মাথায় রেখে নতুন কিছু বানিয়ে আমাদের কনভিন্স করতে পারে, আমরা মেনে নেব। তবে, শর্ত ওই তিনটি। সব উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। তিনটে ডিশ রাঁধতে হবে। বাঙালি ডিশ হতে হবে।"

"ম্যাজিক বক্সের ইনগ্রেডিয়েন্টস দেখে নেওয়ার পর, কী ডিশ বানাবে তা ভাবার জন্য পাঁচ মিনিট সময় পাবে," এবার নিশিগন্ধা কথা বলছেন, "জিজা তোমাদের একটা ট্যাবলেট পিসি দেবে। তাতে তোমরা পদগুলো লিখবে। আমরা আমাদের সামনের মনিটর থেকে তোমরা কী লিখছ, সেটা দেখতে পাব। দর্শকেরা পাবেন না। পাঁচ মিনিট শেষ হলে তোমাদের পিছনের স্ক্রিনে তোমাদের লেখা পদের নাম এক-এক করে ফুটে উঠবে।"

পাঁচ জন চুপ। এসব কথায় এখন তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। এখন একটাই মনোবাসনা। ম্যাজিক বক্সের ঢাকনা সরানো হোক!

"তোমাদের নম্বর দেওয়া হবে পাঁচটি প্যারামিটারের ভিত্তিতে। ওভারঅল অ্যাপিল, কম্পোজিশন, অ্যাপিয়ারেন্স, টেক্সচার এবং টেস্ট," মাইকে আব্রাহাম। "মনে রেখো," মাইকে মিজান, "রান্না করতে হবে দু'জনের জন্য। সময়, দু'ঘণ্টা," নাটকীয় পজ নেন তিনি।

তারপর তিন বিচারক একসঙ্গে বলেন, "ইয়োর টাইম স্টার্টস নাউ!"

পাঁচ প্রতিযোগী একসঙ্গে ম্যাজিক বাক্সর ঢাকনা সরায়। মধুরা উপকরণ দেখতে থাকে, গোবিন্দভোগ চাল, ময়দা, সুজি, ছানা, দুধ, চিনি, বেকিং পাউডার, ঘি, মৌরি, কই মাছ, হলুদ বাটা, লঙ্কা বাটা, সরষে বাটা, লাল রঙের সস, ধনে আর পুদিনাপাতার গোছা...

"রক্তাবলী, কী মনে হচ্ছে?" প্রথম প্রতিযোগীকে গ্রিল করা শুরু করেছে জিজা।

কাঁদো-কাঁদো গলায় রক্তাবলী বলে, "সব গুলিয়ে যাচ্ছে!"

পিছনের স্ক্রিনে একটা কাউন্টডাউন টাইমার। সে ৩০০ সেকেন্ড থেকে ঝড়ের গতিতে শূন্য সেকেন্ডের দিকে আসছে! টকটক-টকটক আওয়াজটা কানে লাগছে খুব।

টক-টক আওয়াজ এখন মধুরার মনে। কী যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে! কী যেন! পাত্তা না দিয়ে মধুরা অন্য উপকরণ দেখতে থাকে। কাঁচা লঙ্কা, সরষের তেল, পাঁচফোড়ন, পাতিলেবু...মৌরি! ইউরেকা! এই উপকরণটা একটা ক্লু। একটা ডিশ ক্লিয়ার হল। ডেজার্টের জন্য এরা ভেবেছে মালপোয়া। নিঃসন্দেহে বাঙালি রান্না। মালপোয়া তৈরি করতে লাগবে... মধুরা টুক-টুক করে উপকরণের বাটি সরাতে থাকে। ময়দা, সুজি, ছানা, চিনি, বেকিং পাউডার, ঘি, দুধ এবং মৌরি। গুড! তা হলে পড়ে রইল...ছোট চামচ নিয়ে লাল সস মুখে দেয় মধুরা। এটা টম্যাটো সস। পেপার ন্যাপকিন দিয়ে চামচ মুছে পুদিনা আর ধনেপাতার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাকি উপকরণ দিয়ে কোন দু'টো ডিশ হবে? তেল কই? পোলাও? মুড়িঘণ্ট?

"হ্যালো নেহা, প্রিপারেশন কত দূর?" জিজা মিষ্টি হেসে নেহার পাশে দাঁড়িয়েছে।

"গোয়িং অন, চেষ্টা চালাচ্ছি," বুকে দু' হাত রেখে বিবেকানন্দর স্টাইলে ক্যামেরা ফেস করছে নেহা, "আমি মোটামুটি গেস করেছি ডিশগুলো কী। তবে পাঁচ মিনিট হাতে আছে। আর একটু ভাবি।"

"আর কিন্তু পাঁচ মিনিট নেই," জিজা এবার মধুরার পাশে, "কী গো? কত দূর? সময় কমে তিন মিনিট হয়ে গেছে। কিছু ভেবে উঠতে পারলে?"

"না...মানে...হ্যাঁ...মানে, চেষ্টা করছি," ঘাবড়ে গিয়ে তোতলায় মধুরা। বোকার মতো চশমা ঠিক করে। অ্যাপ্রনে হাত ঘষে।

"চেষ্টা চালাও। আমি ততক্ষণে দেখি ঐশ্বর্যার কী অবস্থা!" মধুরাকে টপকে জিজা পরের প্রতিযোগীর কাছে চলে গিয়েছে।

মধুরা টেবিলের দিকে তাকিয়ে থাকে। পোলাও রান্না করার মতো উপকরণ নেই। তা হলে কি সাদা ভাত? পুদিনা আর ধনেপাতার সবুজ রং তার মাথায় নানা

নকশা তৈরি করছে। নকশা তৈরি করছে টম্যাটো সসের লাল রং। পুদিনা আর টমেটো...সবুজ আর লাল..এদিক আর ওদিক...ইউরেকা এগেন! পুরো নকশাটা পরিষ্কার হয়ে যায় মধুরার কাছে। কই মাছ, পুদিনার চাটনি, টমেটো সস, এসবই একদিকে যাচ্ছে। মশলাপাতি ঘেঁটে দেখে সে। হ্যাঁ, একদম খাপে খাপ! এসব দিয়ে একটা রান্নাই করা যায়। কই মাছের হরগৌরী! তার মানে মেন ডিশে থাকবে ভাত। সাইড ডিশে কই মাছের হরগৌরী। ডেজার্টে মালপোয়া।

"টাইম আপ!" জিজা ঘোষণা করে, "তোমরা সকলে নিজেদের টেবিলের ড্রয়ারে থাকা ট্যাবলেট হাতে নাও। স্টাইলাস দিয়ে লিখে ফেলো কোন-কোন ডিশ তোমরা তৈরি করছ।"

মধুরা ড্রয়ার খোলে। ট্যাবলেটের টাচ স্ক্রিনে বৈদ্যুতিন কলম ঠেকিয়ে মেনু লিখে ফেলে। ভীষণ ইচ্ছে করছে পিছন ফিরে দেখতে।

"কেউ পিছন ফিরবে না,"

প্রতিযোগীদের মাইন্ড রিড করে জিজা বলে, "স্ক্রিনের দিকে তাকালে এখনই তোমরা ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে যাবে!" একে-একে সকলের হাত থেকে ট্যাবলেটগুলো নেয় সে। বিচারকদের উদ্দেশে বলে, "এবার আমরা দেখে নিই, কে কী লিখেছে।"

আব্রাহাম, মিজান ও নিশিগন্ধা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়েন।

"রত্নাবলী লিখেছে, পোলাও, তেল কই আর গোকুলপিঠে। হ্যাঁ, এখন তোমরা স্ক্রিনের দিকে তাকাতে পারো,"

প্রতিযোগীদের অভয়বাণী দেয় জিজা। রত্নাবলীর মেনু শুনে মধুরার মাথায় বাজ পড়ে। সব ক'টা ডিশ ভুল লিখল সে? "পাঁচফোড়ন" থেকে এখনই তাকে বেরিয়ে যেতে হবে? হায় রে! এই ছিল কপালে?

জিজা এখন নেহার পাশে, "তুমি লিখেছ..." পিছনের পর্দায় ফুটে ওঠে, "ভাত, কই মাছের হরগৌরী, মালপোয়া।"

মধুরার বুকের বাঁদিকে কেউ হামানদিস্তায় মশলা বাটছে! ধুপধাপ আওয়াজ হচ্ছে। মশলার ঝাঁঝে নাক-চোখ জ্বালা করছে।

"এবার আমরা দেখব, মধুরা কী লিখেছে," জিজা এখন মধুরার পাশে, "ভাত, কই মাছের হরগৌরী, মালপোয়া।"

জিজা চলে গিয়েছে ঐশ্বর্যার পাশে, "তুমি কী লিখেছ ঐশ্বর্যা?"

পর্দায় ভেসে ওঠে, ভাত, কই মাছের হরগৌরী, মালপোয়া।

"লাস্ট, বাট নট দ্য লিস্ট, আওয়ার সুইট সর্দার। তুমি কী লিখেছ আমরা এবার দেখে নেব," গুরপালের পাশে গিয়ে বলল জিজা।

পর্দায় আবার ভেসে ওঠে, "ভাত, কই মাছের হরগৌরী, মালপোয়া।"

বিচারকরা হাততালি দিচ্ছেন। হাততালি দিচ্ছে প্রতিযোগীরাও। টকব্যাকে মধুরা শুনতে পায় অর্ণবের গাল, "কাট ইট।" ক্যামেরার রোলিং বন্ধ হয়ে যায়। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত আলোর খেলা বন্ধ হয়ে যায়। ক্যানড মিউজিক এখন বোবা। ফ্লোর জুড়ে শোনা যাচ্ছে রত্নাবলীর কান্নার শব্দ, "মেরে কো অউর এক চান্স দিজিয়ে, প্লিজ! অউর এক চান্স! নহি তো উওলোগ মুঝে ঘর মেঁ ঘুসনে নহি দেঙ্গে। প্লিজ স্যার। প্লিজ!"

১৪

ভাত রান্না করার মতো শক্ত কাজ আর হয় না, মধুরার ধারণা এই রকম। একটা দানা অন্য দানার গায়ে লেগে থাকবে না, ঝুরঝুরে অথচ সুসিদ্ধ হবে, টাফ জব! হাঁড়ির একটা দানা টিপে বিচারকরা নিদান দেবেন, "উতরোয়নি!"

অন্য কাজ শুরুর আগে মধুরা তাই ভাত রাঁধতে শুরু করল। চাল ধুয়ে নেওয়া, মাপমতো জল দেওয়া, বার্নারে চাপানো, সব ধাপে-ধাপে করল। কুকিং রেঞ্জের পাশে একটা টাইমার রাখা আছে। তাতে সময় অ্যাডজাস্ট করল। তারপর কই মাছ নিয়ে পড়ল। জিজা আপাতত রত্নাবলীর পাশে। মধুরাকে বিরক্ত করতে আসছে না।

অর্ণব "কাট ইট!" বলার পর রত্নাবলী পুরো পেগলে গিয়েছিল। হাউ-হাউ করে কাঁদছে, কপাল চাপড়াচ্ছে, হেঁচকি তুলে, ককিয়ে-ককিয়ে একটানা আর্তনাদ করছে, ফুঁপোচ্ছে। দেখার মতো সিন! সব ক্যামেরা বন্ধ ছিল কি না কে জানে! এই সব দেখতে পেলে দর্শক খুশি হয়। সিকিওরিটির লোকেরা তাকে ধরে রেস্ট রুমে নিয়ে গেল। দফায়-দফায় অর্ণব, সাহানা, ইলিনা, শ্রাবন্তী, আব্রাহাম, মিজান, নিশিগন্ধা বোঝাল যে, সে প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে যায়নি। যদি বুদ্ধি করে ওই উপকরণ দিয়ে সে তার মেনু রাঁধতে

পারে, তাহলে প্রথম হওয়ার সম্ভাবনা একচুলও কমবে না।
রত্নাবলী কতটা কনভিন্সড হয়েছে, কে জানে। আপাতত সে শান্ত। নেহা, ঐশ্বর্য, মধুরা আর গুরপাল নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে বোঝার চেষ্টা করেছে, তাদের মেনুটা ঠিক, নাকি রত্নাবলীর। কেউ কোনও সদুত্তর পায়নি।
কই মাছের আঁশ ছাড়ানো আছে।
পরিমাণমতো নুন আর হলুদ মাখিয়ে ছ'টা মাছকে মধুরা বড় বোওলে রাখল। আধঘণ্টা ম্যারিনেটেড হোক।
জিজা রত্নাবলীকে ছেড়ে নেহার কাছে, "কী নেহা, কী করছ?"
"মালপোয়া।"
"কেন?"
"দু'ঘণ্টা পরে সব রান্নাই ঠান্ডা হয়ে যাবে। মালপোয়া মাইক্রোআভেনে গরম করে নিতে পারব। ভাত ওভাবে গরম হয় না। তাই ভাত শেষে। গোড়ায় মালপোয়া আর মাঝখানে কইয়ের প্রিপারেশন," ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে চমৎকার হাসি ছড়িয়ে বলল নেহা।
স্মার্ট গার্ল! নেহার বুদ্ধির তারিফ করল মধুরা। সহজ যুক্তিটা তার মাথায় আসা উচিত ছিল। তবে আপাতত এসব ভেবে লাভ নেই। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করতে হবে। ইনফ্যাক্ট, দু' ঘণ্টার মাথায়, মালপোয়া গরম করার মতো সময় নেহা পাবে কি না সন্দেহ। অন্য একটা বোওলে হলুদ, সরষে বাটা, লঙ্কা বাটা, নুন ও এক চামচ তেল মেশাল মধুরা। তারপর ম্যারিনেট হওয়া মাছের গায়ে মিশ্রণটা ঢেলে দিল। তার চোখ টাইমারের দিকে। ভাত হতে আর মিনিটদশেক বাকি।
পুদিনাপাতা, ধনেপাতা আর গোটাকয়েক কাঁচালঙ্কা চপিং বোর্ডে রেখে ছুরি দিয়ে কুচি-কুচি করে কেটে মিক্সিতে ফেলে দেয়। ঘরঘর আওয়াজ তুলে মিক্সির ব্লেড ঘুরতে থাকে। মিক্সির স্বচ্ছ দেওয়ালে সবুজ পুদিনার চাটনি ছড়িয়ে পড়ে। চাটনিকে আরও স্বাদু আরও রসালো করতে মিক্সি থামিয়ে মধুরা নুন আর চিনি মেশায়। পাতিলেবুর টুকরো চিপে মিশিয়ে দেয় অম্লরস। আবার মিক্সি অন করে।
"হাই মধুরা!" পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জিজা।
"হ্যালো!" জিজার দিকে না তাকিয়ে, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলল মধুরা।
"আমি কিন্তু এদিকে!" ফচকে হেসে বলে জিজা।
ঘাবড়ে গিয়ে জিজার দিকে তাকিয়ে মধুরা বলে, "সরি!"
জিজা কিছু বলার আগে মধুরাকে চমকে দিয়ে ঠনঠন শব্দে টাইমার বাজতে থাকে। আঁতকে উঠে মধুরা বলে, "উফ! যা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম! টাইমার বাজছে। ভাত হয়ে গেল।"
"আমিও ঘাবড়ে গিয়েছিলাম!" একগাল হেসে পরিস্থিতি ম্যানেজ করার চেষ্টা করে জিজা, "ভাত রান্না কমপ্লিট? এবার কী করবে?"
ইডিয়ট! নিজেকে মনে-মনে গালাগাল দিচ্ছে মধুরা। ক্যামেরার সামনে এরকম আনস্মার্ট আচরণ করার কোনও মানে হয়? টাইমারটাও এখনই বাজতে হল? রাগ মনের মধ্যে পুষে রেখে মধুরা বলে, "পুদিনার চাটনি তৈরি করব।"
ঐশ্বর্যার কাছে যাওয়ার আগে জিজা বলে যায়, "আমি তোমার জায়গায় থাকলে ভাতের ফ্যানটা গেলে নিতাম।"
ধুত্তেরিকা! এই রকম ক্লামজি আচরণ মধুরা কেন করছে? নিজেকে আর এক প্রস্ত গালাগাল দিতে-দিতে সে ভাতের ফ্যান গালে। হটপটে ভাত ঢুকিয়ে কই রান্নায় মন দেয়। কড়াই বার্নারে বসিয়ে অনেকটা সর্ষের তেল দেয়। তেল গরম হলে পাঁচফোড়ন ছড়ায়। খানিকটা ধোঁয়া ওঠে। চিমনি সেই ধোঁয়া নিঃশব্দে শুষে নেয়। ফোড়নের গন্ধ আসছে। আহা! সুঘ্রাণে মধুরার মন ভাল যায়। মশলা মাখানো মাছগুলোকে অত্যন্ত সাবধানে একটা-একটা করে কড়াইতে ছাড়ে। শেষ মাছটা ছাড়ার পরে আবার গন্ধ শোঁকে। উতরোচ্ছে! রান্না উতরোচ্ছে! মশলার চমৎকার গন্ধ আসছে! মাছগুলোকে এবার উল্টে দেয় সে। এক কাপ জল ঢেলে ঢিমে আঁচে কষতে থাকে।
জিজা এখন ঐশ্বর্যার কাছে, "ঐশ্বর্যা, রান্না কদ্দুর?"
"মালপোয়া হয়ে গেছে। আয়্যাম ইনটু হরগৌরী নাও!" উত্তর দেয় ঐশ্বর্যা।
"তুমিও আগে মালপোয়া তৈরি করছ?" জিজা অবাক!
"হ্যাঁ। পরে এটাকে মাইক্রোতে ঘুরিয়ে নেব।!"
"ভেরি গুড!" গুটি-গুটি পায়ে জিজা গুরপালের দিকে এগোয়।
জল শুকিয়ে গিয়েছে। কাঠের স্প্যাচুলা দিয়ে এক-এক করে সন্তর্পণে ছ'টা মাছ তুলে বড় থালায় পাশাপাশি রাখে মধুরা। পুদিনার চাটনি মিক্সি থেকে নামিয়ে কাচের বোওলে ঢালে। বোওলটা রাখে টম্যাটো সসের বোওলের পাশে। তারপর পুদিনাপাতার চাটনি মাছের এক পিঠে পুরু করে মাখায়। তিনটে মাছের এক পিঠে চাটনি মাখানোর পরে ফাইনাল প্রোডাক্টটা মনে-মনে ভিশুয়ালাইজ করে। মাছের দু'দিক দেখা যাওয়া জরুরি। শুধু লাল বা শুধু সবুজ মাছের বদলে, লাল-সবুজের কম্বিনেশন বেশি সুন্দর দেখাবে। অর্থাৎ একটা মাছের সবুজ পিঠ উপর দিকে। পরের মাছটার লাল পিঠ উপর দিকে। পুদিনার চাটনি মাখানো থামিয়ে মধুরা টম্যাটো সসের বোল নেয়। অন্য একটা স্প্যাচুলা দিয়ে বাকি তিনটে মাছের গায়ে পুরু করে ঝাল-ঝাল টকটক টম্যাটো সস মাখায়। এবার একটা বড় সাদা পোর্সেলিনের থালা ড্রয়ার থেকে বের করে, পরিষ্কার লিনেন দিয়ে ভাল করে মোছে। মাছগুলো থালায় উল্টো করে রাখে। এখন চাটনি আর সস লাগানো পিঠগুলো নীচের দিকে। পুরো স্প্যাচুলা দিয়ে পুদিনার চাটনি লাগাতে থাকে মধুরা। একটা ছেড়ে-ছেড়ে। সবুজের সমারোহ শেষ হলে স্প্যাচুলা পরিবর্তন। বাকি তিনটি মাছের পিঠে টম্যাটো সস গাঢ় করে বুলিয়ে দেয়। ব্যস! কাজ কমপ্লিট। ভাত আর কই মাছের হরগৌরী রেডি!
জিজা আপাতত গুরপালকে নিয়ে ব্যস্ত। গুরপাল মজা করে এককলি গান শুনিয়ে দিল। তার লাইনগুলো এই রকম, "হাম ভি বংগালি আছি। তুম ভি বংগালি আছো। হামরা ভারতবাসী আছি! বোলো তাররারা..."
গান শুনে আব্রাহাম আর মিজান স্বতঃস্ফূর্ত হাততালি দিলেন। নিশিগন্ধা মুখে আঙুল ঢুকিয়ে "পুঁই পুঁই" করে সিটি মারলেন। গান শুনতে-শুনতে ময়দা চেলে নিয়েছে মধুরা। ঘিয়ের ময়ান দিয়ে বেকিংপাউডার মিশিয়ে নিয়েছে। জলে সুজি ঢেলে রেখেছে। সুজি নরম হতে সময় লাগছে।
জিজা এসে জানতে চাইল, "মধুরা, রান্না কদ্দুর?"
"দু'টো প্রিপারেশন কমপ্লিট। তিন নম্বরটায় হাত দিয়েছি," ভেজানো সুজিতে ছানা চটকাতে-চটকাতে বলে মধুরা। হঠাৎ রত্নাবলী ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।
"কী হল?" মধুরাকে ছেড়ে রত্নাবলীর দিকে এগিয়ে যায় জিজা।
"পোলাওয়ের জন্য সব মেটিরিয়াল নেই। তা ছাড়া, পুদিনাপাতা এক্সেস হয়ে যাচ্ছে।"
"কোনও ব্যাপার নয়। মাথা খাটাও। সব ঠিক হয়ে যাবে," রত্নাবলীর পিঠে হাত বুলিয়ে আশ্বাস দেয় জিজা।
এমন সময় সকলকে চমকে দিয়ে পিছনের স্ক্রিনে হাজির হয় কাউন্টডাউন টাইমার। নিশিগন্ধা মাইক্রোফোনে বলেন, "আর মাত্র আধঘণ্টা আছে। তোমরা তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করো। মনে রেখো, প্রেজেন্টেশন এবং গার্নিশিংয়ের জন্য আলাদা নম্বর আছে।"

নিশিগন্ধার কথা শেষ হওয়া মাত্র টক-টক শব্দে ফ্লোর ভরে গেল।
মিশ্রণের মধ্যে দুধ ঢালে মধুরা। মৌরি দেয়। খুব শক্ত নয়, আবার খুব পাতলাও নয় এমন টেক্সচারের লেই তৈরি করে। লিনেনে হাত মুছে বার্নারে কড়াই চাপিয়ে রিফাইনড তেল ঢালে। হাতায় মালপোয়ার মিশ্রণ তুলে গরম তেলে ভাজতে থাকে। এই অংশটাই সবচেয়ে শক্ত।
হঠাৎ তার মনে হয়, চিনির রস তৈরি করা হয়নি! সর্বনাশ করেছে! দ্বিতীয় বার্নার জ্বেলে জলভরা পাত্র চাপায় মধুরা। তারপর চিনি ঢালতে থাকে আর হাতা দিয়ে নাড়তে থাকে। পাশাপাশি মালপোয়ার মিশ্রণও ভাজতে থাকে। শেষ হবে না নাকি? আর কতক্ষণ সময় আছে? একবার পিছন ফিরে দেখবে নাকি, কাউন্টডাউন টাইমার কী বলছে? এপাশ-ওপাশ ফিরে দেখবে নাকি, বাকিদের প্রিপারেশন কদ্দুর? না! দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে শাসন করে মধুরা। একদম নয়। কোনও দিকে ঘোরা যাবে না। নিজের কাজে কনসেনট্রেট করো। মালপোয়া তৈরিতে ফোকাস করো। বাকিরা গোল্লায় যাক!
রস গাঢ় হচ্ছে ধীরে-ধীরে। টাইমার টক-টক আওয়াজ করছে। মেশিনের মতো একের পর এক মালপোয়া ভাজছে মধুরা। কতক্ষণ বাকি আছে আর? কতক্ষণ? এই ডিশ শেষ করতে না পারলে অটোমেটিক্যালি সে ফাইনাল রাউন্ড থেকে আউট হয়ে যাবে। তা হতে দেওয়া যাবে না। রান্নাবান্নার প্রতি ভালবাসার জন্য সে যত জায়গা থেকে অপমানিত হয়েছে, বাড়িতে, অফিসে, বন্ধুদের কাছে...সব একে-একে এসে মাথায় ছবি তৈরি করতে থাকে। মনোহরের ক্ষোভ, যূথিকার ঝাঁঝ, অ্যানির বিরক্তি, শুভ্রর অসন্তোষ, স্যান্ডির ভিলেনি, নেহার অপমান — সব মিশতে থাকে মালপোয়ায়।
রস তৈরি। মালপোয়াগুলো দ্রুত রসভরা পাত্রে রাখে মধুরা।
মাইক্রোফোনে আব্রাহাম ঘোষণা করছেন, "আর দশ মিনিট। আমার মনে হয় এবার তোমাদের গার্নিশিংয়ে মন দেওয়া উচিত।"
রত্নাবলীর কান্না শুনতে পেল মধুরা। তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না। ভাতের পাত্রর দিকে হাত বাড়াল। দু' ঘন্টা আগে তৈরি ভাত ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। সামান্য কাঠ-কাঠ লাগছে। এখন উপায়? ঝটপট আভেনসই পাত্রে ভাত ঢেলে মাইক্রোওয়েভে এক মিনিটের জন্য ঘুরিয়ে নেয়। হ্যাঁ, ভাত গরম হয়েছে। বড় বাটিতে অর্ধেক ভাত নিয়ে সাদা থালায় উল্টে দেয়। চমৎকার ভাতের চুড়ো হল। দু'নম্বর থালাতেও চুড়ো তৈরি করে মধুরা।
"আর তিন মিনিট!" মাইকে ঘোষণা মিজানের।
ঝনঝন করে একটা শব্দ হল। বোধ হয় ঐশ্বর্যার হাত থেকে পড়ে কিছু ভাঙল। ভাঙুক!
মালপোয়াগুলো দু'টো বাটিতে ভাগ করে রাখে মধুরা। উপরে রস ছড়িয়ে দেয়। কাজু আর চেরি দিয়ে গার্নিশ করে। দুটো ডিশ কমপ্লিট। এবার হরগৌরীর গার্নিশিং নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে সে। হরগৌরী দু'ভাগ করবে না। তা হলে এত সুন্দর সাজানোটা নষ্ট হয়ে যাবে।
"আর এক মিনিট! সকলে কাজ বন্ধ করে দাও। তোমাদের পাশে রাখা ট্রলিতে ডিশগুলো সাজিয়ে রাখো!" মাইকে নাটকীয় ঘোষণা করে জিজা। সঙ্গে-সঙ্গে মধুরার পাশে আবার ঝনঝন শব্দ হয়! ট্রলিতে যত্ন করে ভাতের থালা সাজায় মধুরা। মাঝখানে কই মাছের হরগৌরী রাখে। দু'পাশে রাখে মালপোয়া। পরীক্ষা শেষ। এবার রেজাল্ট।
আটটা ক্যামেরা একসঙ্গে রোল করছে। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ডিশের ক্লোজ় আপ। জিমিজিব ক্যামেরা নেমে এসে সকলের গাল চেটে গেল।
"রত্নাবলী, ট্রলি নিয়ে এগিয়ে এসো," আব্রাহাম বললেন।
এগিয়ে গেল প্রথম প্রতিযোগী। নির্দিষ্ট জায়গায় ট্রলি রেখে তার পিছনে দাঁড়াল।
"নেহা নেক্সট," মিজান।
নেহা স্মার্টলি হেসে রত্নাবলীর ট্রলির পাশে নিজের ট্রলি দাঁড় করাল।
"এবার মধুরা," নিশিগন্ধা।
"ঐশ্বর্যা এসো," জিজা, "গুরপাল, তুমিও।"
এখন পাঁচটা ট্রলি পাশাপাশি রাখা। ট্রলির পিছনে দাঁড়িয়ে মধুরা দ্রুত সকলের ডিশগুলো মেপে নেয়।
রত্নাবলীর পোলাও আর গোকুল পিঠে খেতে কেমন হয়েছে কে জানে, দেখতে খুবই ভাল হয়েছে। ধনেপাতা আর পুদিনাপাতা দিয়ে চমৎকার গার্নিশ করা। গোকুল পিঠে, গায়ে চেরির টুকরোও অপরূপ। নেহা আর তার ডিশের মধ্যে কোনও তফাত নেই। প্লেট সাজানো থেকে গার্নিশিং, একদম এক। ঐশ্বর্যা মালপোয়ার পাত্র ভেঙে ফেলেছে। ছোট বাটিতে মালপোয়াগুলো স্তূপ করে রেখেছে। গুরপালের প্রিপারেশনে কোনও গন্ডগোল চোখে পড়ছে না। তবে কই মাছের হরগৌরীর সব ক'টা মাছের লাল পিঠ উপর দিক করা।
"ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল..." চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন আব্রাহাম, "তোমাদের পরিশ্রম শেষ। এবার আমাদের মূল্যায়নের পালা। আমি, মিজান আর নিশিগন্ধা এক-এক করে তোমাদের তৈরি ডিশ চেখে দেখব, আলোচনা করব, তারপর নম্বর দেব। প্যারামিটার তোমাদের জানা। তার ভিত্তিতে আমাদের প্রত্যেকের হাতে ৫০ নম্বর আছে। সব মিলিয়ে ১৫০। দেখা যাক, কে কত নম্বর পাও।"
"তার আগে অন্য একটা কথা বলার আছে," মিজানের হাতে মাইক, "পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড থাকে। তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ সেগুলো হবে। তবে তার আগে পরীক্ষাটা সফলভাবে দিতে হবে। কোয়েশ্চেন পেপার পুরোটা পড়ে, সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একজন সেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়নি। তার নাম..."
হু-হু করে কেঁদে ওঠে রত্নাবলী।
দ্রুত চেয়ার থেকে উঠে রত্নাবলীর পাশে দাঁড়ান নিশিগন্ধা, "দিস ইজ় আ রিয়্যালিটি শো। নট রিয়্যালিটি। দিস ইজ় আ স্মল পার্ট অফ ইয়োর লাইফ। নট দ্য লাইফ ইটসেল্ফ। জীবন অনেক বড় একটা ব্যাপার। একটা দু'মাসের রিয়্যালিটি শো তাকে ছুঁতে পারে না। আজকের এই ছোট্ট পরীক্ষায় তুমি অকৃতকার্য হয়েছ। বাকি জীবনটা পড়ে রয়েছে জয় করার জন্য।"
রত্নাবলী নিশিগন্ধাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে যাচ্ছে। সিকিওরিটির দু'জন মহিলা রত্নাবলীকে ধরে শুটিং জ়োনের বাইরে নিয়ে চলে গেল। মধুরা ভাবল, শ্রাবন্তী নিশিগন্ধাকে এই সংলাপ দিয়েছে, না ও নিজে থেকে কথাগুলো বলল? কে জানে!
"এবার বাকি চার জনের প্রসঙ্গ। যারা পরীক্ষাটা ঠিকঠাক দিয়েছ। যাদের উত্তরপত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করছি," আব্রাহাম টুক-টুক করে হেঁটে এসে ফ্লোরের মাঝখানে দাঁড়ালেন, "সমস্ত উত্তরপত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য পাঁচ নম্বর থাকে। এখানেও আছে। সেটা হল, অ্যাপিয়ারেন্স বা প্রেজেন্টেশন। সেই ক্যাটিগরিতে, আমরা তিন জনই ঐশ্বর্যাকে দশে শূন্য দেব। লাইভ ক্যামেরার সামনে, কুকিং শোতে, বাসন ভাঙার চেয়ে বড় অপরাধ আর হয় না।"
ঐশ্বর্যা রত্নাবলীর মতো মেন্টালি আনস্টেবল নয়। নিজের পরিণতি সে আন্দাজ করেছিল। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে সে ঘাড় নাড়ল।
প্রথমে এগিয়ে এলেন নিশিগন্ধা। নেহার ট্রলিতে সাজানো খাবার দেখলেন। কই মাছের প্রিপারেশন থেকে সামান্য ঝোল ভাতে মাখিয়ে এক চামচ খেলেন। নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লেন। শুটিং ক্রু এক গ্লাস জল

এগিয়ে দিল। এক চুমুক জল খেয়ে, টিসু পেপার দিয়ে মুখ মুছে মালপোয়ার কোনা কাঁটা চামচ দিয়ে কেটে মুখে পুরলেন। খুশি-খুশি মুখে আবার জল চাইলেন। পরবর্তী ট্রলি মধুরার। একই রুটিন ফলো করলেন নিশিগন্ধা। মুখের জ্যামিতি দেখে বোঝা যাচ্ছে না, কেমন লাগছে তাঁর। একইভাবে ঐশ্বর্যা আর গুরপালের ট্রলি থেকে সামান্য অংশ চেখে দেখে, জল খেয়ে, টিসু পেপার দিয়ে মুখ মুছে নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। স্কোর শিট টেনে নম্বর দিতে লাগলেন।

এগিয়ে এলেন মিজান। নিশিগন্ধার মতো চার জন প্রতিযোগীর তৈরি করা খাবার চেখে দেখলেন তিনি। মাঝখানে জলপান ও মুখ মোছার বিরতিসহ। তবে মিজানের এক্সপ্রেশন আছে। ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি ঝুলিয়ে খাবার খেলেন তিনি। হাসি দেখে মধুরার হার্টবিট বেড়ে গেল।

সব শেষে এলেন আব্রাহাম। রুটিন পুরনো। তরিকা আলাদা। নিশিগন্ধার মতো নীরব বা মিজানের মতো রহস্যময় নন, আব্রাহাম ভোকাল। সকলের ডিশ থেকে বেশি পরিমাণে খেলেন, প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল ডিশ নিয়ে একটা করে শব্দ খরচ করলেন। যেমন, মধুরার ভাত খেয়ে, "ঠান্ডা!" কই মাছ খেয়ে, "মার্ভেলাস!" মালপোয়া খেয়ে, "অসামান্য!" অবশেষে নিজের সিটে গিয়ে বসলেন।

অর্ণব চেঁচাল, "কাট!"

"এখন কাটলে কেন?" প্রশ্ন করলেন আব্রাহাম, "একবারে পুরোটা টেনে দিতে পারতে। বেচারিরা টেনশান খাচ্ছে।"

"সরি আব্রাহামদা! নিশিগন্ধা চিরকুট পাঠিয়েছে, দাঁত মাজবে।"

"আয়্যাম সরি!" একগাল হেসে বলেন নিশিগন্ধা, "একবার টয়লেটেও যাব। মিনিটদশেকের জন্য মাফ চাইছি," চেয়ার ছেড়ে উঠে যান নিশিগন্ধা।

মধুরাদের দিকে তাকিয়ে অর্ণব বলে, "কম্পিটিটাররাও বসে নাও। সাহানা তোমাদের ব্রাশআপ করবে।"

কেউ নড়ল না। যে যার ট্রলির পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। সাহানা আর বাবলু দৌড়ে এসে ভিজে তোয়ালে দিয়ে সকলের মুখ মুছিয়ে দিল। চুলে জল স্প্রে করে, চুল আঁচড়ে দিতে-দিতে সাহানা বলল, "কাল সারা রাত দার্জিলিংয়ে মদ খেয়ে বেলেল্লাপনা করেছ। আজ একটু বেশি হিসি তো পাবেই!"

বাবলু বলল, "শাট আপ সাহানা! নিশির পরের ছবিতে তুমি ওর মেক-আপ আর্টিস্ট।"

ফিল্ম লাইনের কেচ্ছা শুনতে মধুরার ভালই লাগছে। একই সঙ্গে পেটের ভিতরটা মোচড় দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, দশ মিনিটের এই ব্রেক কতক্ষণে শেষ হবে? কখন নিশিগন্ধা ফেরত আসবেন? কখন তিন জন বিচারক মিলে ঘোষণা করবেন "পাঁচফোড়ন"-এর ফাইনালিস্টের নাম? কখন এই অত্যাচার শেষ হবে? রান্না করার সময়ে দু' ঘণ্টা ফুড়ুত করে উড়ে গেল, আর এখন দশ মিনিটকে মনে হচ্ছে অনন্তকাল!

নিশিগন্ধা ফিরে এসেছেন। সাহানা আর বাবলু দৌড়ল নিশিগন্ধার কাছে। চুল আর মুখ ঠিক করে তিনি নিজের আসনে বসলেন। অর্ণব বলল, "লাইটস!"

ঝলমলিয়ে উঠল গোটা ফ্লোর। "ক্যামেরা রোলিং।" জিমিজিব ক্যামেরা শকুনের মতো ঘুরপাক খেতে লাগল মধুরার মাথায়। "অ্যাকশন!"

যেখানে শেষ করেছিলেন, ঠিক সেখান থেকে কিউ নিলেন আব্রাহাম, "সকলের তৈরি ডিশ আমরা চেখে দেখেছি। আমাদের স্কোরশিট রেডি। এই শিট আমরা

তুলে দিলাম জিজার হাতে।"
"থ্যাঙ্ক ইউ আব্রাহামদা, থ্যাঙ্ক ইউ মিজানদা, থ্যাঙ্ক ইউ নিশিগন্ধা,"
তিনজনের হাত থেকে তিনটি কাগজ নিয়ে শুটিং ক্রুয়ের হাত তুলে দিল জিজা। "ক্যালকুলেশন হতে সামান্য সময় লাগবে। তারপরই আমরা জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখতে পাব আজকের বিজেতার নাম। তার আগে আমাদের এই অনুষ্ঠানের স্পনসরদের নাম আপনাদের জানিয়ে দিই। আমাদের স্পনসর হল আশারানি কুকিং রেঞ্জ, অ্যাসোসিয়েট স্পনসর, বনিটা কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস, বদলে ফেলুন আপনার জীবন, সাহা গুঁড়ো মশলা, চুটকিতে চমক। আমাদের প্রিন্ট পার্টনার হল "আজ সকাল" এবং "দ্য ক্যালাকাটা পোস্ট, অডিওভিশুয়াল পার্টনার হল..."
জিজার মুখস্থ করার ক্ষমতা দেখে মধুরা হাঁ! ২০টা স্পনসরের নাম একটানা মুখস্থ বলে গেল। ক্যামেরার লেন্সের চৌহদ্দির বাইরে, একটা মনিটরে বড়-বড় হরফে নামগুলো স্ক্রল করছে। ভুলে গেলে দেখে নেওয়ার স্কোপ আছে। সেদিকে তাকিয়েও দেখল না।
"এবার পালা বিজেতাদের নাম ঘোষণার," সকলকে চমকে দিয়ে বললেন মিজান, "পাঁচফোড়ন"-এর ফাইনাল রাউন্ডে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে ঐশ্বর্যা। ফার্স্ট রানার আপ হয়েছে..."
নৈঃশব্দ্য। টক-টককরে ঘড়ির শব্দ!
"১৫০ নম্বরের মধ্যে ১২০ নম্বর পেয়ে ফার্স্ট রানার আপ হয়েছে..."
ঐশ্বর্যা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বডি ল্যাঙ্গোয়েজে পরাজয়ের গ্লানি। পড়ে রইল নেহা, সে নিজে আর গুরপাল। এই তিন জনের মধ্যে কে সেকেন্ড হয়েছে?
"আজ যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করবে সে পাবে আশারানি কুকিং রেঞ্জের তরফ থেকে ৫০ হাজার টাকার গিফ্‌ট কুপন, স্কুপ চ্যানেলের পক্ষ থেকে তিন লক্ষ টাকা এবং "পাঁচফোড়ন"-এর সিঙ্গন টুতে মেন্টর হওয়ার সুযোগ!"
চোখ বড়-বড় করে, হাতের আঙুল নেড়ে, রহস্যময় গলায় জানাল জিজা, "তা হলে মিজানদা, আপনিই বলুন আজকের ফার্স্ট রানার আপ কে?"
"পাঁচফোড়ন"-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে, গুরপাল সিংহ!" গলার স্বর চড়িয়ে ঘোষণা করলেন মিজান।
ফিস্ট পাম্পিং করে, ফ্লোরে হাঁটু গেড়ে বসে মেঝেয় চুমু খেয়ে, চোখে জল এনে গুরপাল বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ!"
"এবার আমরা ঘোষণা করব আজকের সেকেন্ড রানার আপ এবং উইনারের নাম। কে হয়েছে প্রথম? কে-ই বা তৃতীয়?" মাইকে এখন নিশিগন্ধা। নিজের তৈরি করা ডিশগুলোর দিকে তাকিয়ে, দাঁতে-দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে মধুরা। এই নাটক বন্ধ হোক, বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হোক! এই চাপ সে আর নিতে পারছে না! যা খুশি হোক, যা খুশি! শুধু এই রিয়্যালিটি শো শেষ হোক!
"মধুরা না নেহা? নেহা না মধুরা! পাঁচফোড়ন সিজন ওয়ানের বিজেতা কে? স্কুপ চ্যানেলের পক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা, আশারানি কুকিং রেঞ্জের তরফ থেকে এক লক্ষ টাকার গিফ্‌ট কুপন আর "পাঁচফোড়ন" সিজন টু-তে মেন্টর হওয়ার সুযোগ পকেটে ভরে কে বাড়ি যাবে? আর কে ফিরবে শূন্য হাতে?" মধুরা আর নেহার চারদিকে গোল হয়ে ঘুরতে-ঘুরতে বলছে জিজা।
"মধুরা!" তাকে চমকে দিয়ে নিশিগন্ধা বললেন, "তুমি তোমার জায়গা থেকে তিন পা বাঁ দিকে সরে দাঁড়াও। আর নেহা! তুমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো!"
নিশিগন্ধার কথামতো নেহার থেকে তিন পা দূরে সরে দাঁড়ায় মধুরা।
"এই রকম কেন করলে নিশিগন্ধা?" সাজানো বিস্ময়ে প্রশ্ন করে জিজা।
"কারণ, সেন্টার স্টেজ সবসময় শুধু উইনারদের জন্য এবং ১২৫ নম্বর পেয়ে আজকের উইনার হল নেহা পারেখ!" নাটকীয় চিৎকার করেন নিশিগন্ধা।
মুহূর্তের মধ্যে ফ্লোর জুড়ে ঝরে পড়তে থাকে রাংতা আর কনফেটি, পরপর স্মোক বোম্ব ফাটতে থাকে, জায়ান্ট স্ক্রিনে স্পনসরদের তরফ থেকে একের পর এক অভিনন্দন বার্তা ভেসে ওঠে, ক্যান্ড মিউজিক নিজের টেম্পো বদলে ফেলে, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত আলোকসম্পাতে ঝলমল করতে থাকে প্রথম স্থানাধিকারী নেহা পারেখের মুখ!
সেন্টার স্টেজ থেকে তিন হাত দূরে, অন্ধকারে, একা দাঁড়িয়ে থাকে হেরো মধুরা।

১৫

"অ্যায়াম সরি মধু। আমার কিছু

করার ছিল না," মন্টুর ঝুপসের সামনে দাঁড়িয়ে মধুরার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল অ্যানি, "ডাবল ওয়র্কলোড টেনে দিতে আমার আপত্তি ছিল না। করছিলামও। কিন্তু কাজে ভুল হতে শুরু করল। স্যান্ডি ঝাড় দিল শুভ্রকে। শুভ্র আমাদের। এইচ আর একদিন শুভ্রকে ডেকে পাঠিয়ে কী সব কোয়্যারি করল, তারপর..."

"জানি," নিজের হাত ছাড়িয়ে মধুরা বলে, "দাদা পরামর্শ দিয়েছিল ই-মেলে রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দিতে। টারমিনেশনের চেয়ে সেটা বেশি সম্মানজনক। কিন্তু গতকাল 'পাঁচফোড়ন'-এর শুটিং শেষ হওয়ার পরে, বাড়ি ফিরে পার্সোনাল মেল খুলে দেখলাম ডিজিটাল ইন্ডিয়া আমাকে টারমিনেট করেছে। আমার অ্যাক্সেস কার্ড ডি-অ্যাক্টিভেট করে দেওয়া হয়েছে। অফিশিয়াল মেল আই ডি ব্লক করে দেওয়া হয়েছে।"

"ও নিয়ে চিন্তা করিস না। আমার ভিজিটর হিসেবে তুই ভিতরে যাবি। তোর পার্সোনাল বিলংগিং কী আছে?"

"বই আর ম্যাগাজিন ছাড়া কিছু নেই। একবার এইচ আরে যেতে হবে। অ্যাকাউন্টসেও যেতে হবে। কিছু টাকাপয়সা পাওনা আছে।"

"শুভ্র বলছিল ষাট হাজার টাকার কাছাকাছি।"

"ও," ডিজিটাল ইন্ডিয়ার গেটের দিকে এগোতে এগোতে বলে মধুরা।

"বাই দ্য ওয়ে, কালকের শুটিংয়ের পরে শুভ্রর সঙ্গে তোর কথা হয়নি?" আড়চোখে মধুরার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে অ্যানি।

"না, আমি ফোন করেছিলাম। রিং হয়ে গেল।"

অ্যাক্সেস সোয়াইপ করে গেট দিয়ে ভিতরে ঢোকে অ্যানি। পিছন-পিছন মধুরাও ঢোকে। গতকাল অবধি সে এই অফিসের কর্মচারী ছিল। আজ, অতিথি।

কর্পোরেট মেশিনের নাট একবার ছিটকে গেলে আর ফিরে আসে না। রিপ্লেসড হয়ে যায়।

লিফটে উঠে নিজের ফ্লোরে পৌঁছয় মধুরা। ওঃ, সরি! নিজের নয়, অ্যানির ফ্লোর। শুভ্র, যিশু, স্যান্ডির ফ্লোর। করিডর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে স্যান্ডির কাচের কফিনের দিকে তাকায়। স্যান্ডি মাথা নিচু করে কাজ করছে। জেট ব্ল্যাক চুল ব্যাকব্রাশ করা। হঠাৎ দেখলে আগেকার দিনের সেভেনটি এইট আরপিএম রেকর্ডের কথা মনে পড়ে। স্যান্ডির চোখে যাতে চোখ না পড়ে তার জন্য দ্রুত অ্যানির পিছু-পিছু নিজের ওয়ার্কস্টেশনের দিকে এগোয় মধুরা।

ওঃ, এটা আর তার ওয়ার্কস্টেশন নেই। এখন এখানে রোহন বসছে। রোহন বিশালদের টিমে কাজ করে। ১৫ অগস্ট বিশালের গ্রুপ করা পার্টিতে ট্যাংরায় গিয়েছিল, অ্যানি মধুরাকে নিজের চেয়ারে বসিয়ে রোহনের কাঁধে টোকা মেরে বলল, "হ্যালো রোহন!"

"হাই!" মধুরার দিকে তাকিয়ে রোহন যেভাবে হাসল, বোঝা গেল মধুরা আসবে সে জানত, "আমি তোর বিলংগিংস ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছি। ইউ ক্যান চেক দ্য ড্রয়ারস।"

পেপার পাল্পের তৈরি ব্যাগের ভিতরে উঁকি মারে মধুরা। গোটাচারেক সিনেমার ডিভিডি, দু'টো পেন ড্রাইভ, একটা বই আর টুকটাক মেক-আপের সামগ্রী। বইটা দেখে হেসে ফেলল মধুরা। আব্রাহাম সেনের লেখা "বাদশাহি কুইক্সিন।"

"থ্যাঙ্কস!" ড্রয়ার না ঘেঁটে, রোহনকে ধন্যবাদ জানিয়ে মধুরা শুভ্রর ওয়র্কস্টেশনে গেল। ইন্ডিয়ান রেলওয়েজের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট খুলে সে ট্রেনের টিকিট বুক করছে। মধুরাকে বলল, "তুমি স্যান্ডির সঙ্গে দেখা করে এসো। তারপর তোমাকে আমি এইচআরে নিয়ে যাব।"

"স্যান্ডি কি আমাকে দেখা করতে বলেছে?" প্রশ্ন করে মধুরা।

"হ্যাঁ," অন্যমনস্কভাবে হাত নাড়ে শুভ্র, "অ্যানি, তুই যাস না।"

"ওকে বস!" নিজের চেয়ারে বসে পড়ে অ্যানি।

মধুরা কাচের কফিনের সামনে দাঁড়ায়। বলে, "আসব?"

"এসো মধুরা," ইংরিজি কাগজের পেপার কাটিং স্ক্যান করতে-করতে স্যান্ডি বলে, "তোমায় এক্সপেক্ট করছিলাম।"

"বলুন," চেয়ারে বসে মধুরা।

"আজকের ইংরেজি কাগজের মেট্রো সেকশনে খবরটা কভার করেছে। দেখবে?" স্ক্যান শেষ করে, পেপার কাটিং মধুরার দিকে বাড়িয়ে দেয় স্যান্ডি। কাগজ নিয়ে মধুরা দেখে, হেডলাইন হল, "ক্যালকাটা গেটস ইটস ফার্স্ট কিচেনকুইন!" তলায় বড় একটা ছবি। কনফেন্তি আর রাংতার বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে নেহা পারেখ। তার দু'পাশে আব্রাহাম, মিজান ও নিশিগন্ধা। খবরে দ্রুত চোখ বোলায় মধুরা। শ'দুয়েক শব্দের রাইট আপে নিখুঁত তথ্য সাজানো। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী গুরপাল সিংহর নামও রয়েছে। কাটিং ফেরত দেয় মধুরা।

"পাঁচফোড়ন-এ জিতবে বলে তুমি দীর্ঘদিন অফিস কামাই করেছ। এখন চাকরি গেল, টোফিও গেল। নাউ হোয়াট?" মধুরার দিকে তাকিয়ে বলে স্যান্ডি।

"জানি না," নিস্পৃহ গলায় জবাব দেয় মধুরা, "ভাবিনি।"

"ফেয়ার এনাফ!" শ্রাগ করে স্যান্ডি, "তোমার মাথা, তুমি ভাববে! তবে আমি একটা পরামর্শ দিই? বাবার মিষ্টির দোকানের দায়িত্ব নাও। তোমায় সুট করবে। শেফ হওয়ার মতো অনিশ্চিত, চ্যালেঞ্জিং কেরিয়ারের জন্য অন্য রকম মাইন্ড সেট চাই। অন্যরকম ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড চাই। অন্য রকম এডুকেশনাল লেভেল চাই। অ্যান্ড ইয়েস, অন্য রকম জিন চাই। সেটা তোমার নেই। ইউ ওয়্যার আ লুজার ফ্রম দ্য বিগিনিং!"

"অন্য রকম জিন মানে কি 'বেওসায়ি' জিন?" ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করে মধুরা।

"আমি কিছু বলতে চাইনি। তুমি বললেই যখন..." আবার শ্রাগ করে স্যান্ডি।

"অন্য রকম ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড মানে কি ফিলদি রিচ হওয়া?"

"রিচের বিশেষণ হিসেবে 'ফিলদি' শব্দটা ব্যবহার করা থেকেই তোমার মাইন্ডসেট বোঝা যাচ্ছে। দ্যাটস হোয়াই ইউ আর আ লুজার।"

"ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কেটারিংয়ের টেন্ডার নিয়ে দু' নম্বরি করে পয়সা রোজগার করলে তাকে আমি ফিলদিই বলব। অন্য কোনও বিশেষণ জানা নেই।"

খটখট করে হেসে স্যান্ডি বলে, "উপস! অ্যায়াম সরি! সুলতান নামের ওই ফুটপাতের ডাব্বাওয়ালাটার সঙ্গে তুমি তো আবার ইমোশনালি ইনভলভড।"

হঠাৎ মধুরার গলার কাছে কী একটা দলা পাকিয়ে উঠল। চোখ জ্বালা করতে লাগল। নাকের পাটা ফুলে উঠল। এসবই কান্নার পূর্বলক্ষণ। নিজেকে সামলাতে ডিপ ব্রিদ করে মধুরা। বলে, "আমাকে অপমান করা ছাড়া অন্য কোনও কারণে ডেকে থাকলে বলুন।"

"অন্য কারণে ডাকিনি। এটাই উদ্দেশ্য ছিল। নেহা যখন বলল, তুমি সুলতান নামের ওই চোরটার পাল্লায় পড়েছ, তখন মনে হয়েছিল তোমাকে সাবধান করে দেব। কিন্তু তুমি ওকে যেভাবে ডিফেন্ড করলে, তাতে মনে হল ইউ হ্যাভ ক্রসড দ্য লাইন। তোমাকে সাবধান করে কোনও লাভ নেই। এবার শুভ্রকে সাবধান করতে হবে।"

"মানে?" চিৎকার করে ওঠে মধুরা। তার গলার আওয়াজ কাচের কফিন ছাড়িয়ে বাইরে পৌঁছেছে। দু'-একটা কৌতূহলী মাথা উঁকিঝুঁকি মারছে।

"চেঁচিও না!" ঠান্ডা মাথায় কেটে-কেটে বলে স্যান্ডি, "আজ আমার আনন্দের

দিন। আমার বোন ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার বিগেস্ট কুকারি কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে। লেট মি রেলিশ দ্য মোমেন্ট। এই সময় চিল্লিয়ে মুড অফ কর না।"

"আমি যাচ্ছি," এক ধাক্কায় চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ায় মধুরা।

"যাচ্ছি" বলতে নেই। বলো, "আসি,"

হাত নাড়ে স্যান্ডি।

কাচের কফিনের দরজা ঠেলে বেরোয় মধুরা। শুভ্রকে বলে, "তোমার টিকিট কাটা হল? আমি এইচআরে যাব।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে শুভ্র বলে, "বসের সঙ্গে ঝগড়া করলে নাকি?"

মধুরা উত্তর দেওয়ার আগে স্যান্ডি কাচের কফিনের দরজা খুলে বলল, "শুভ্র, এক মিনিট!"

মধুরা শুভ্রর কনুই চেপে ধরে বলল, "আগে এইচ আরে চল। পরে বসের কাছে যাবে।"

"তুমি আর ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় নেই মধুরা। কিন্তু আমি আছি। স্যান্ডি এখনও আমার বস। আমাকে ওর কথাই আগে শুনতে হবে। তুমি এইচআরে যাও। আমি আসছি," মধুরাকে ছেড়ে কাচের কফিনের দিকে এগিয়ে গেল শুভ্র।

মধুরা ধীর পায়ে করিডর পেরোল। সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামল। এইচআর ডিপার্টমেন্টে ঢুকে জয়শ্রীর সামনে বসল। হিউম্যান রিসোর্সের জয়শ্রীর মুখটা বোটক্স ইঞ্জেকশন দেওয়া বুড়ি আমেরিকানদের মতো। দেখে মনে হয়, সমস্ত পেশি প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছে। তাপ, উত্তাপ, কৌতূহল, বিস্ময়, আনন্দ, দুঃখ, এসব মানবিক অনুভূতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। নতুন যে জয়েন করেছে, তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার চেক করার সময় যেরকম এক্সপ্রেশনলেস, মধুরাকে চেক ধরানোর সময় সেরকমই এক্সপ্রেশনলেস। বলল, "তোমার স্যালারি থেকে কিছু টাকা কাটা হয়েছে। কোন গ্রাউন্ডে, সেটা পে স্লিপে স্পেসিফাই করা আছে।"

"আচ্ছা," শুভ্রর জন্য অপেক্ষা করতে-করতে মধুরা বলে, "আর কিছু?"

"হ্যাঁ। তোমার আই কার্ডটা।"

অ্যাক্সেস কার্ড টেবিলে রেখে, কাগজের ঠোঙা নিয়ে এইচআর থেকে বেরয় মধুরা। শুভ্র এখনও এল না তো? লিফ্টের সামনে দাঁড়িয়ে মোবাইলে শুভ্রর নাম্বার ডায়াল করে। এনগেজড আসছে। এনিওয়ে, পরে কথা হবে। লিফ্টের দরজা খুলে গেছে। টুক-টুক করে ভিতরে ঢোকে মধুরা। একবার সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ক্যালকাটা ধাবায় সুলতান নেই। পারুল বাসন ধোওয়াধুয়ি করছিল। মধুরা বলল, "সুলতানদা কোথায়?"

পারুল বাসন মাজা থামিয়ে বলল, "কাল সন্ধেবেলা এখানে ৩০ জন লোকের খাওয়াদাওয়া আছে। মোগলাই মেনু। তোমার দাদা মশলাপাতি কিনতে চিৎপুর গেছে। ফিরতে দেরি হবে। তা ছাড়া..."

"তা ছাড়া?" পারুলের মুখে হালকা দুশ্চিন্তার ছোঁয়া দেখে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় মধুরা।

"ফুটপাত জবরদখল করে আমরা দোকান করেছি। এই নিয়ে কেউ থানায় লাগিয়েছে," বাসনমাজা শেষ করে হাত ধোয় পারুল, "আজ সকালে থানা থেকে লোক এসেছিল। বলেছে উঠে যেতে হবে।"

"তোমাদের ধাবা তো অনেক দিনের পুরনো। পুলিশকে হপ্তা দাও না?"

"দিই। যে খোচড়টা এসেছিল, সে বলল, এত দিন কেউ থানায় রিপোর্ট করেনি, তাই ওরাও কিছু বলেনি। এখন রিপোর্ট হয়েছে।"

"থানায় কে রিপোর্ট করেছে জান?"

বাসন মুছতে-মুছতে পারুল বলে, "তোমার দাদার পুরনো শত্রুর। তোমার অফিস।"

মধুরা বলে, "তোমাকে একটা কথা বলি।

আমি আর ওই অফিসের কেউ নই।"
"ও!" পারুলের কোনও হেলদোল নেই। টেবিল সাফ করতে-করতে বলল, "তুমি আর একটা চাকরি পেয়ে যাবে। আমাদের কী হবে, কে জানে!"
মধুরা অপরাধীর মতো বসে থাকে।
পারুল বলে, "বাড়ি যাও। তোমার দাদার আসতে দেরি হবে। থানার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে ফিরবে।"
"আচ্ছা," কাগজের ব্যাগ নিয়ে বেঞ্চ ছাড়ে মধুরা। চশমা ঠিক করে নিয়ে ভাবে ট্যাক্সি ধরবে, না বাসে ফিরবে। জয়শ্রী ৫০ হাজার টাকার চেক দিয়েছে। ব্যাঙ্কে ২৫ হাজার আছে। আর একটা চাকরি জোটানোর আগে এই টাকা দিয়ে চালাতে হবে। বাবার কাছে হাত পাতলে টাকা পাওয়া যাবে, কিন্তু মধুরা পাতবে না।
"ভাল কথা," পিছু ডাকে পারুল, "তোমার দাদা বলেছে, আগামী কাল সন্ধেবেলা তাড়াতাড়ি আসতে। অতজনের রান্না হবে। তোমার হেল্প লাগবে।"
নাচাল। সবিতার পলিটিক্যালি কারেক্ট হওয়ার কোনও দায় নেই। সে বলল, "টিভির রান্না অনেক হল। এবার শ্বশুরবাড়ির রান্নাবাটিতে মন দাও।"
হাসিখুশি পরিবেশের থমথমে হয়ে যাওয়া আটকাতে মধুরা বলল, "মা, তুমি বউদির অনারে সত্যনারায়ণ পুজো করো। অনেকদিন সিন্নি খাইনি।"
"তোমার বাজে বকা বন্ধ হলে আমার দু'-একটা কথা আছে," অ্যাশট্রেতে বিড়ি গুঁজে বলে মনোহর।
"বলো," চেয়ারে বসে টেবিলে কনুই আর হাতের তালুতে চিবুক রেখে বলে মধুরা।
"পাঁচফোড়ন শেষ?"
"ভেরি স্যাড বাট টু। হ্যাঁ।"
"চাকরি শেষ?"
"ভেরি, ভেরি স্যাড বাট টু, হ্যাঁ। এই যে পে চেক," ব্যাগ থেকে চেক বার করে হাওয়ায় নাড়ায় মধুরা।
"এখন কী প্ল্যান?"
"বাড়িতে বসে কয়েক দিন পা দোলাব আর

তুমি শুভ্রকে বিয়ে করো, আমরা ব্যবস্থা করছি। শুধু ওই লোকটার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখা যাবে না।

ফিক করে হেসে মধুরা বলে, "সুলতানদা এই কথা বলল?"
মধুরা রাস্তা টপকায়। হাঁক পাড়ে, ট্যাক্সি..."

ভৌমিক ভবনে খুশির আবহাওয়া। দিয়ার ইউরিনের প্রেগন্যান্সি রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। গাইনোকলজিস্টকে দেখানোর পরে বাড়িতে খবর দিয়েছে কৃশানু। কৃশানু আর দিয়া দু'জনেই আজ রাজচন্দ্রপুরে। মনোহর-যুথিকা ঠাকুরদা-ঠাকুরমা হতে চলেছে। সেলিব্রেশন টাইম।
মনোহর অলরেডি নেশা করে ফেলেছে। বিড়ি ধরিয়ে ঘন-ঘন পা দোলাচ্ছে, যুথিকা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মধুরা দোতলার ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছল। তার কাছে বাড়ির চাবি থাকে। সে বেল বাজায়নি। তাকে এই সময় কেউ এক্সপেক্ট করেনি।
মনোহরের পা নাচানো বন্ধ হয়ে গেল। দিয়া মধুরার দিকে তাকিয়ে দু'বার ভুরু
বিভিন্ন কোম্পানিতে রেজুমে মেল করব। একটা চাকরি জোটানো খুব জরুরি।"
"এত যে রোজগার করো, একদিনও বাড়িতে এক পয়সা ঠেকিয়েছ?" এবার জেরা করার দায়িত্ব যুথিকা নিয়েছে।
"উমম..." ভাবে মধুরা, "না।"
"ন্যাকামি কোরো না!" ঝনঝনিয়ে ওঠে যুথিকা, "ন্যাকা সেজে থাকার দিন শেষ। ভুলে যেও না, তুমি আমাদের মেয়ে। এত বছর ধরে খাইয়ে-পরিয়ে বড় যখন করেছি, তখন আমাদের কথা শুনতে হবে। বেলেল্লাপনা আর চলবে না।"
"বেলেল্লাপনা মানে? তুমি এগজ্যাক্টলি কী বলতে চাইছ?" জানতে চায় মধুরা।
যুথিকার চাঁচামেচি শুনে কৃশানু নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে বলল, "গলা নামিয়ে কথা বলতে পার না? আর সবিতাদি, তুমি একটু নীচে যাও।"
সবিতা কিছু বলার আগে মধুরা বলল, "না, সবিতাদি থাকবে।"
"বেলেল্লাপনা মানে একটা আধবুড়ো লোকের সঙ্গে বাইকে চড়ে ঘোরাঘুরি করা," চিৎকার করে বলে যুথিকা, "এখানে-ওখানে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া। লোকের কাছ থেকে এসব শুনতে আমার ভাল আর লাগছে না!" যুথিকার গলা কান্নায় বুজে আসে।
"এটা তোমাকে কে বলেছে?" রাগে ফোঁস-ফোঁস করে বলে মধুরা।
"যেই বলে থাকুক! তুই বল যে, কথাটা সত্যি নয়!" ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে যুথিকা।
"ওঃ, মা। নাটক বন্ধ করো," বিরক্ত হয়ে বলে কৃশানু। চেয়ার টেনে বসে মধুরার দিকে ঘুরে বলে, "আমি বলেছি। সুলতানদার সঙ্গে তোর ঘোরাঘুরি নিয়ে আমি বলার না করলেও শুভ্র এতে ইরিটেটেড।"
"শুভ্র জানে, সুলতানদার ধাবায় আমি কেন যাই। শুভ্র কোনও ইসু নয়। ওকে পলিউট করছে অন্য কেউ," দাবড়ে ওঠে মধুরা।
"জানি," বোনের হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে কৃশানু, "এই সবের পিছনে স্যান্ডির হাত আছে। আজ তোর সঙ্গে কথা বলার পরে নিজের ঘরে শুভ্রকে ডেকে সাবধান করে দিয়েছে যে তোর সঙ্গে যেন না মেশে। বলেছে সুলতান একজন পিম্প। বলেছে ও নিউ টাউন এলাকায় হোটেলে এসকর্ট সাপ্লাই করে। এসব কথা শুভ্র বিশ্বাস করেনি। কিন্তু ও অত্যন্ত ডিপ্রেসড। আমাকে ফোন করে সব বলল। ওদের বাড়িতে এসব কথা পৌঁছলে খুব খারাপ রিপারকেশন হবে।"
মধুরা মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল। ফালতু চাপের কাছে মাথা নিচু করার মতো মেয়ে সে নয়। গলা খাঁকরে সে বলল, "দ্যাখো মা, সুলতানদার সঙ্গে আমার..."
"আমরা গপ্‌পো শুনতে চাই না," হাত তুলে প্রতিবাদ করে যুথিকা, "এসব আমাদের জানা। তুমি সুলতান না মুলতানের সঙ্গে লটরপটর করছ, এটা আমি বিশ্বাস করি না, তোমার বাবা করে না, তোমার দাদা-বউদি করে না, শুভ্র করে না। কিন্তু এই বিশ্বাসটুকুই সব নয়। শুভ্রর বাবা-মা কোনওভাবে খবরটা জানতে পারলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে। সেটাই তোমাকে ভেবে দেখতে বলছি।"
"এ তো কাকে কান নিয়ে উড়ে গেছে মার্কা গপপো হয়ে গেল! ইশপের ফেবল।"
"ইশপের সময়ের চেয়ে এখনকার সময় একটুও বদলায়নি!" বলল দিয়া।
"তুমি পাগলকে সাঁকো নাড়া দিয়ো না বউমা!" দিয়াকে ধমকায় যুথিকা। আর একটা পান মুখে পুরে মধুরাকে বলে, "তুমি নতুন চাকরি খোঁজো, আমাদের

আপত্তি নেই। তুমি টঙের ঘরে শুয়ে পা নাচাও, আমাদের আপত্তি নেই। তুমি শুভ্রর সঙ্গে ঘুরে বেড়াও, আমাদের আপত্তি নেই। তুমি শুভ্রকে বিয়ে করো, আমরা ব্যবস্থা করছি। শুধু ওই লোকটার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখা যাবে না।"

"এই একটাই শর্ত?" হতাশ হয়ে বলে মধুরা।

"হ্যাঁ, একটাই," যূথিকা বলে।

"এই শর্তটা কি তোমার? না অন্য কারও?"

"দ্যাখ মধু," পাশ থেকে মিহি গলায় বলে কৃশানু, "সুলতানদা তোকে ব্যবহার করছে ওর ব্যক্তিগত ঝামেলার শোধ তুলতে। রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হল। তার মধ্যে তুই একটা বোড়ে। বোড়েদের সকলের আগে স্যাক্রিফাইস করা হয়। ইউ ওয়্যার ডেস্টিনড টু বি আ লুজার।"

"লুজার" শব্দটা আজ দ্বিতীয়বার শুনল মধুরা। প্রথমে বলেছিল স্যান্ডি, এখন বলল দাদা। বাবা-মাও কি বলছে না? হয়তো শব্দটা ব্যবহার করছে না। কিন্তু ওদের কথায় ফুটে উঠছে, ইউ আর আ লুজার!

মধুরা কৃশানুকে বলে, "এই শর্তটা শুভ্র চাপিয়েছে?"

"শর্ত কেন বলছিস মধু?" কৃশানু দাদাসুলভ গাম্ভীর্য দেখাচ্ছে, "ছেলেটা রিয়্যালি তোর জন্য কনসার্নড।"

"কনসার্নটা আনইম্পর্ট্যান্ট," দিয়া মাঝখানে গলা খুলেছে, "মধুরা জানতে চাইছে, সুলতানের সঙ্গে যোগাযোগ না করার কথাটা শুভ্র কীভাবে বলেছে।"

"শর্ত নয়," দিয়ার ইঙ্গিত বুঝে কৃশানু নিজেকে সামলে নেয়, "সুলতানের সঙ্গে তোর সম্পর্কটা গুরু-শিষ্যের মতো। এটা আমরা জানি। দু'জনে মিলে একটা ভেঞ্চারে নেমেছিলি। সেটা ফেল করেছে। এখন যোগাযোগ রাখার আর কোনও প্রয়োজন নেই। দ্য জার্নি ইজ ওভার।"

মধুরার মাথায় আবার মন খারাপের মেঘ জমতে শুরু করেছে। আবার বিষণ্ণতার পাতলা কুয়াশা জড়িয়ে ধরছে তাকে। ডিপ্রেশন নোংরা ন্যাতার মতো ছুঁয়ে যাচ্ছে তার আঙুল, তার ঘাড়, তার মাথার চুল। মুখ তেতো হয়ে আসছে। মধুরা হেরে যাচ্ছে। হেরে যাচ্ছে মানে কী? সে তো একজন হেরো। ফেকলু লুজার। বাবা-মা, দাদা, প্রাক্তন অফিসের সহকর্মী ও বস, বন্ধু, সকলেই তার বিরুদ্ধে। শুধুমাত্র রান্নার প্রতি প্যাশনের জন্য এত জনের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল সে। রিয়্যালিটি টিভির সেটে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত। রিয়্যাল লাইফে একটা শেষ ফাইট দেয় মধুরা, "কাল সন্ধে নাগাদ একবার ক্যালকাটা ধাবায় যাব।"

"না, তুমি যাবে না," হুঁশিয়ারি দেয় যূথিকা।

তার কথায় পাত্তা না দিয়ে তিনতলায় উঠতে থাকে মধুরা।

নীচ থেকে মনোহরের গলা শোনা যায়, "যে কথাটা এতক্ষণ তোমার দাদা তোমাকে বলেনি, সেটা শুনে রাখো। আর একবার ওই লোকটার সঙ্গে দেখা করলে শুভ্র তোমার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখবে না। ভেবে নেবে, সুলতানের সঙ্গে সত্যিই তোমার লটরপটর আছে।"

নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয় মধুরা। রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে শুভ্রকে ফোন করে। একবার, দু' বার, তিনবার...রিং হয়ে গেল। শুভ্র ফোন ধরল না। এতক্ষণ নিজের ছিন্নভিন্ন হওয়া আটকে রেখেছিল মধুরা। আর পারল না। বালিশে মুখ গুঁজে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল।

একজন হেরো মানুষের চোখের জলে ভিজতে লাগল বালিশ।

১৬

সকালবেলা ঘুম ভাঙল সবিতার চিৎকারে, "দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছ কেন? মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? দাদা-বউদি বেরিয়ে গেল..."

"উফ! চেঁচিও না তো!" চোখ মুছতে-মুছতে দরজা খুলে দেয় মধুরা, "ক'টা বাজে?"

"ন'টা! কাল রাতে খাওয়াদাওয়া না করে ঘুমিয়েছ। রাত উপোসে হাতি পড়ে। নীচে চলো," মধুরার হাত ধরে টানতে-টানতে নীচে নিয়ে যায় সবিতা। মনোহরকে দেখা যাচ্ছে না। সে এখন মিষ্টির দোকান নিয়ে ব্যস্ত। যূথিকা শোওয়ার ঘরের খাটে বসে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছে।

মধুরাকে চেয়ারে বসিয়ে ঠক করে এক কাপ কফি রেখে সবিতা বলে, "বউদির ওয়াক উঠছে বলে ঝাল-ঝাল আলু চচ্চড়ি রেঁধেছি। সঙ্গে হাতে গড়া রুটি। এখন খাবি, না মুখ ধুয়ে খাবি?"

"এখন খাব," মস্ত বড় হাই তোলে মধুরা, "সঙ্গে একটা স্ক্র্যাম্বল্ড এগ করে দাও। লঙ্কা, পেঁয়াজ আর

ক্যাপসিকাম কুচি দিয়ে। একটা কমলাকান্ত আর এক একটা আশাপূর্ণা দাও।"
"বাবা! সক্কাল-সক্কাল এত খাবার? দুপুরে খাবে না নাকি?" টেবিলে রুটির থালা আর আলু চচ্চড়ির বাটি রেখে ডিম ফেটাতে শুরু করেছে সবিতা।
"দুপুরেও খাব। কেন, তোমার আপত্তি আছে নাকি?" কফিতে চুমুক দিয়ে পরিতৃপ্তির শব্দ করে মধুরা।
"আমার আপত্তি আর কে কবে শুনেছে?" বক-বক করতে-করতে মধুরার কাছে চলে এসেছে সবিতা। ফিসফিস করে বলছে, "যে ছেলে বিয়ের আগেই শর্ত দেয়, এর সঙ্গে মিশো না, ওর সঙ্গে মিশো না, তার গলায় মালা দেওয়ার আগে ১০ বার ভেব," কথাটা বলে দ্রুত বার্নারের কাছে চলে গিয়েছে। গলা চড়িয়ে বলছে, "সকালে এত লঙ্কা খেও না, পেট জ্বলবে।"
মুচকি হেসে রুটি-আলু চচ্চড়ি মুখে পোরে মধুরা।
যূথিকা খোঁড়াতে-খোঁড়াতে পাশে এসে বসে, "শুভ্র কৃশানুকে ফোন করেছিল। কাল রাতে তুই যখন ফোন করিস, তখন বাইক চালাচ্ছিল। তাই ফোন ধরতে পারেনি। পরে যখন ও তোকে ফোন করে, তখন তোর মোবাইল সুইচড অফ। তুই তো কখনও মোবাইল অফ করিস না।"
"গত রাতে করেছিলাম। মোবাইলটা আমার দরকারের জন্য," 'আমার' শব্দটায় জোর দেয় মধুরা, "অন্য লোকের দরকারের জন্য নয়।"
"ওভাবে বলছিস কেন মা!" ছলছল চোখে মেয়ের দিকে তাকায় যূথিকা।
মায়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে মধুরা আন্দাজ করে, মহিলা এতক্ষণ কাঁদছিল, "মুখটা ভেটকি মাছের মতো করে আছ কেন?" রুটি-আলু চচ্চড়ি শেষ করে জানতে চায় মধুরা, "কান্নাকাটি করছিলে নাকি? সকালে আবার কোন মেগা সিরিয়াল হয়?"
"তুইও তো কেঁদেছিস মধু! চোখ এখনও ফুলে আছে," সবিতার হাত থেকে স্ক্র্যাম্বলড এগের বাটি নিয়ে টেবিলে রেখে যূথিকা বলে, "বাপ-মা কখনও ছেলেপুলের শত্রু হয় না। যা বলছি, তোর ভালর জন্যই বলছি। একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দ্যাখ। শুভ্র অন্যায় কিছু বলছে? ওদের জয়েন্ট ফ্যামিলি। পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবে। সেখানে যদি একবার কেউ তোর নামে একটা বাজে কথা রটিয়ে দেয়..."
"ঠিক বলেছ, ওটা বাজে কথা এবং মিথ্যে কথা," যূথিকাকে সংশোধন করে মধুরা। কাপ্রির পকেট থেকে মোবাইল বের করে পাওয়ার অন করে।
"হ্যাঁ, মিথ্যে কথা। আমি একমত। কিন্তু মিথ্যের শক্তি অনেক। তুই একবার শুভ্রর জায়গায় নিজেকে বসিয়ে দ্যাখ, ও তোর জন্য কতটা ভাবছে। আর সেই জন্যই..." যূথিকার কথা বন্ধ।
মধুরার ফোনে পিঁক-পিঁক করে একের পর এক মেসেজ এবং মিস্‌ড কল অ্যালার্ট ঢুকছে। এক চামচ ডিমের ঝুরি মুখে দিয়ে মধুরা মেসেজ দেখতে থাকে। শুভ্র পাঁচবার ফোন করেছিল। একটা মেসেজ পাঠিয়েছে, 'সকালে আমায় ফোন কোরো।' সুলতান একবার ফোন করেছিল। একটা মেসেজও পাঠিয়েছে, 'মাটন বিরিয়ানি, চিকেন চাঁপ, শামি কাবাব, শাহি টুকরা। ৩০ জনের জন্য। কাল বিকেল পাঁচটায় চলে আসিস।' মেরি একবার ফোন করেছিল। ফোন টেবিলে রেখে আর এক চামচ ডিমভাজা মুখে দিয়ে মধুরা বলে, "একটু নুন কম হয়েছে।"
"কার ফোন ছিল ওগুলো?" নুনদানি এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে যূথিকা। বাটিতে নুন মিশিয়ে মধুরা বলে, "শুভ্র আর মেরিমাসির।"
"মেরিকে পরে ফোন করলেও চলবে। একবার শুভ্রর সঙ্গে কথা বলে নে সোনা..." কাতর মুখে মিনতি করে যূথিকা।
"করছি," শুভ্রর নম্বর ডায়াল করে মধুরা। সবিতার উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ে, "আর এক কাপ কফি খাব।"
"এত তড়পানি বাপের বাড়িতেই চলবে," গজগজ করতে-করতে বার্নারে কফি চাপিয়েছে সবিতা। কান যদিও ফোনালাপের দিকে।
"সরি, কাল ফোন ধরতে পারিনি। বাইক চালাচ্ছিলাম," শুভ্রর সুভদ্র কণ্ঠস্বর শুনতে-শুনতে ডিম খাওয়া শেষ করে মধুরা, "পরে যখন ফোন করলাম, তোমার মোবাইল সুইচড অফ।"
"মোবাইল বন্ধ রেখেছিলাম। বলো, কী বলবে?"
"তুমি সুলতানদার কাছে আর যেও না মধু," মিনতি করে শুভ্র, "স্যান্ডি ইজ় বিহেভিং লাইক আ ফিল্মি ভিলেন। তোমার উপর শোধ নিয়েছে, কারণ, তুমি ওর বোনের সঙ্গে পঙ্গা নিয়েছ। তুমি হেরে যাওয়ার পরে ও আনন্দেই ছিল। কিন্তু ওর চেম্বারে গিয়ে ওকে অপমান করার পর..."
"আমি স্যান্ডিকে অপমান করিনি। স্যান্ডি আমাকে অপমান করছিল। আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, আমার আপ ব্রিঙ্গিং, আমার ক্যারেক্টর, আমার চেহারা নিয়ে বাজে কথা বলছিল। আমি তার জবাব দিয়েছি।"
"হোয়াটএভার! ডিজিটাল ইন্ডিয়ার বসের বিরুদ্ধে করাপশনের অভিযোগ করতে গিয়ে তুমি সিচুয়েশনটা ক্যান্টাকারাস করে দিয়েছ। তোমার কী দরকার ছিল পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটার? কী দরকার ছিল সুলতানের প্রসঙ্গ তোলার?"
"অনেক দিন কাসুন্দি খাইনি!" জিভে জল আনা গলায় বলে মধুরা, "ঝাল-ঝাল, ঝাঁঝালো..."
"বি সিরিয়াস মধু!" শুভ্র ধমকাতে গিয়ে হেসে ফেলল, "স্যান্ডি ভেবেছিল, সুলতান পাস্ট টেন্স। তোমার ঘাড়ে চেপে সুলতানের ভূত আবার ফেরত আসবে, ও ভাবতেও পারেনি। এখন ও তোমাদের দু'জনকেই নিকেশ করবে। তার জন্য আমাদের বাড়িতে ফোন করে তোমাকে আর সুলতানকে জড়িয়ে বাজে কথা বলতেও পিছপা হবে না। অ্যান্ড ফর দ্যাট হি উইল ইউজ় আওয়ার কোলিগস।"
"কাকু-কাকিমা এসব ঢপের চপ বিশ্বাস করবেন?"
"করবেন না, কিন্তু কেউ তো করবে। তারা যুক্তি দেবে, 'ধোঁয়া থাকলেই আগুন থাকে!' একবার এসব কথা ঠাম্মার কানে গেলে হল। সব বাতিল।"
"আমি এভাবে ভাবিনি," গলায় এক ছিপি কনসার্ন ঢালে মধুরা।
"যাক! আমার কথায় কনভিন্সড হলে তা হলে!" হাঁফ ছেড়ে বাঁচে শুভ্র, "তা হলে আর সুলতানদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছ না?"
"আমায় ডিকটেট কোরো না শুভ্র। তা হলে আমি তোমার কথা শুনব না। কেউ আমাকে কোনও একটা কাজ করতে বারণ করলে আমার মনে হয়, সেই কাজটা ১০ বার করব! ওই লাইনে তুমি হেঁটো না। অ্যায়াম গিভিং ইউ আ টিপ, হাউ টু ডিসোসিয়েট মি ফ্রম সুলতানদা..."
"আমি এত তত্ত্বকথা বুঝি না। আই নিড অ্যান আনসার। ইয়েস অর নো।"
"টিপিক্যাল টেস্টোস্টেরন ড্রিভ্‌ন গামবাটদের মতো আচরণ কোরো না," টায়ার্ড গলায় বলে মধুরা, "লাইফ ইজ় নট দ্যাট ইজ়ি। ধরো, তোমার আর আমার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তারপরও আমার কিছু কাজ বাকি থাকে। তোমাদের বাড়ি যাব, কাকু-কাকিমার সঙ্গে দেখা করব। হয়তো একটা নতুন রেসিপিও শিখব। সব তরফের সঙ্গে দেখা করে, তবে মুক্তি।"
"আমি অত ছেনালি করতে পারব না। আই উইল জাস্ট স্টপ রিসিভিং ইয়োর ফোন কলস। ইজ় দ্যাট ক্লিয়ার?" শুভ্রর কণ্ঠস্বর

কয়েক পর্দা উঁচুতে। বলার ধরন রূঢ়।
"জানি তো!" ক্যাজুয়ালি বলে মধুরা, "যে যার নিজের মতো কাজ করবে! এনিওয়ে, আজ সন্ধেবেলা আমি ক্যালকাটা ধাবায় যাচ্ছি। বাই।"
পাল্টা 'বাই' শুনতে পেল না মধুরা। শুভ্র লাইন কেটে দিয়েছে।
দু'জনের ম্যারাথন ফোনালাপের মধ্যে একাধিক ফোন ঢুকেছে। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে মধুরা ফোনকর্তার সন্ধান করে। মেরি তিনবার ফোন করেছে। কেন কে জানে! ভাবতে না-ভাবতেই আবার মেরির ফোন। এই মহিলার উদ্দেশ্য এখনও বুঝে উঠতে পারল না মধুরা। সবুজ বোতাম টিপে বলল, "বলো মেরি মাসি।"
"আজ সন্ধেবেলা সুলতানের ধাবায় আসছিস তো?" কোনও ভণিতা ছাড়া মেরি প্রশ্ন করল।
মধুরার অবাক লাগল। রিয়ালিটি শোতে হেরে যাওয়ার প্রাথমিক ধাক্কা সে কাটিয়ে উঠেছে। 'যে-কোনও খেলায় হার-জিত আছে,', 'একজনই ফার্স্ট হয়,' 'হোপ ফর দ্য বেস্ট বাট প্রিপেয়ার ফর দ্য ওয়র্স্ট'— এসব তত্ত্বকথা তার জানা। কিন্তু সুলতানের সঙ্গে যোগাযোগ করা নিয়ে চেনাশোনা লোকজন যেরকম রি-অ্যাকশন দেখাচ্ছে, তাতে অদ্ভুত লাগছে। সুলতানের ধাবায় তার যাওয়া নিয়ে মেরি মাসি বলরাড কেন? প্রশ্নটা সে করেই ফ্যালে, "কেন বলো তো?"
"আঃ, তর্ক করিস না। যাচ্ছিস কি না বল।"
"যাচ্ছি না," না ভেবে আলটপকা উত্তর দেয় মধুরা।
"হোয়াই?" ফোনে চেঁচিয়ে ওঠে মেরি, "সুলতান তোকে যেতে বলেনি?"
"বলেছে। বাট আই অ্যাম নট গোয়িং," ক্যাজুয়ালি বলে মধুরা। যদিও সে প্রচণ্ড উত্তেজিত এটা জানতে যে, মেরি কেন ক্যালকাটা ধাবায় তার উপস্থিতি চাইছে।
"আমার এই রিকোয়েস্টটা রাখ মধু, প্লিজ," মিনতি করে মেরি।
"রাখব। কিন্তু একটা কথা বলো তো মেরি মাসি, তোমার উদ্দেশ্যটা কী? তুমি অনাদির কেবিনে ডেকে পাঠিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কম্পিটিশনের খবর নিলে। কারণ বললে না। এখন আমাকে জোর করে সুলতানদার ধাবায় পাঠাচ্ছ। কারণটা বলছ না। কিছুদিন আগে বলছিলে কোনও একটা প্রোডাকশন হাউজে ডিপ ফোকাসের প্রেজেন্টেশন দেখিয়েছিলে ফর আ পার্টিকুলার শো। কী শো, বললে না। তুমি সিলেক্টেড কি না, বললে না। এত হাশ-হাশ কেন?"
ওদিকে মেরি চুপ। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। মেরি বলল, "একটা রেসে একজনই ফার্স্ট হয়। বাকিরা হারিয়ে যায়। এই রকমটা আমরা জানি। হারিয়ে গিয়ে তারা কোথায় যায় বল তো? মরে যায়? সন্ন্যাসী হয়ে যায়?"
"এসব কিছুই হয় না। তারা নিজেদের জীবনে ফিরে যায়। যেমন আমি ফিরে এসেছি," কাঠ-কাঠ উত্তর দেয় মধুরা।
"ঠিক বললি না রে মধু। যারা যে কাজটাকে ভালবাসে, তারা সেই কাজটাকে নিয়েই ঘষে যায়। ঘষতে-ঘষতে সবাই কোথাও না-কোথাও পৌঁছয়। ইন্ডাস্ট্রির স্ট্রাকচার পিরামিডের মতো। বেসলাইনে স্ট্রাগলাররা, চূড়োয় অবস্থান তারকাদের। আমার মতো ভেটেরান স্ট্রাগলাররা মাঝামাঝি বিলং করে। এই অবস্থানগত কারণে কালিনারি ইন্ডাস্ট্রির কোনও কথা আমার অজানা নয়। প্রতিটি গসিপ, প্রতিটি কেচ্ছা, প্রতিটি ব্যাক বাইটিং, প্রতিটি হোয়াইট লাই, প্রতিটি বদমাইশি, দালালি, চুকলি, চামচাগিরির খবর আমি পাই। তুই শিয়ার হার্ড ওয়র্ক আর ডেডিকেশন দিয়ে এত দূরে এসে ফেল করলি, আমার মতো ভেটেরান স্ট্রাগলাররা তোর প্রতি সহানুভূতিশীল।"
"ইন্টারেস্টিং!" মুচকি হাসে মধুরা, "আমার ফেলিওর নিয়ে আমি চিন্তিত নই।"
"অনেকে চিন্তিত। তাদের তুই চিনিস না। চেনার প্রয়োজনও নেই। জাস্ট আ রিকোয়েস্ট, আজ সন্ধেয় সুলতানের ধাবায় যাস। প্লিজ!"
"ওখানে আজ একটা পার্টি আছে। ৩০ জনের জন্য বিরিয়ানি অ্যান্ড আদার ফুডস। সুলতানদা মেসেজ করে বিকেল পাঁচটায় পৌঁছতে বলেছে।"
"সো, আর ইউ গোয়িং?" আকুলতা নিয়ে প্রশ্ন করে মেরি।
"মোস্ট প্রব্যাবলি, ইয়েস।" ফোন কাটে মধুরা। মোবাইলে সময় দেখে। সকাল দশটা। স্নান করবে, না মায়ের সঙ্গে খানিকটা বকবক করবে? কোনওটাই না করে মধুরা ল্যাপটপ খোলে। রেজুমে তৈরি করা আছে। টুকটাক পরিবর্তন করতে হল। তারপর ক্যাপজেমিনি, আরটিসি আর ম্যাট্রিঞ্জে মেল করে দিল। দেখা যাক কীরকম রেসপন্স আসে।
"মধু, তোমার ফোন!" নীচ থেকে যূথিকার চিৎকার শোনা যায়।
সবিতা দৌড়তে-দৌড়তে এসে বলে, "তাড়াতাড়ি নীচে চলো। শারুক খানের মা ফোন করেছে।"
"মঞ্জু?" সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বলে মধুরা। সেই মহিলার কানেও স্যান্ডি খবর পৌঁছে দিয়েছে নাকি?
যূথিকা খাবার টেবিল সংলগ্ন চেয়ারে বসে টেলিফোনের হ্যান্ডসেট মধুরার দিকে বাড়িয়ে দেয়। তার চোখমুখে দুশ্চিন্তার ছায়া।
"বলুন," ক্যাজুয়ালি ফোন ধরে মধুরা।
"শুভ্রর কাছ থেকে স্যান্ডির বদমাইশির কথা জানলাম," তেতে ওঠা গলায় বলেন মঞ্জু, "আমি আর আমার কর্তা, দু'জনেই শুভ্রর উপরে রেগে আছি। কুৎসা রটার ভয়ে কোনও কাজ থেকে পিছিয়ে আসা উচিত না। তুই নিশ্চিত থাক, তোকে নিয়ে এই বাড়িতে কোনও প্রবলেম নেই।"
"থ্যাঙ্ক ইউ!" স্বস্তির শ্বাস ফেলে মধুরা। শুভ্রটা স্পাইনলেস!
"তবে..." মঞ্জু আবার কথা বলছেন। এসব 'তবে', 'কিন্তু', 'যদি'কে চিরকাল অপছন্দ করে মধুরা। এর মানেই হল, একটা আড়াই প্যাঁচ আসছে। আসছে কোনও শাণিত বদমাইশি!
"তুই কি নিজের কাছে ক্লিয়ার, কেন ওই ধাবায় যাবি? এটা কি শুধুমাত্র জেদ, না ডেফিনিট কোনও কারণ আছে?"
প্রশ্নটা পছন্দ হল মধুরার। এর মধ্যে কোনও প্যাঁচ নেই। ঠিকঠাক কনসার্ন আছে। মধুরা এই প্রশ্নের সৎ উত্তর দেবে, "জানি না কাকিমা। আমার কাছে যাওয়াটা ইনিশিয়ালি জেদের ব্যাপার ছিল। সবাই আপত্তি করছিল, তাই। এখন আর সেটা নেই। জাস্ট সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের জন্য যাব। সুলতানদা রান্না করতে বলেছে। সেটা করব না। রান্না নিয়ে পাগলামিটা আর আগের মতো নেই।"
"কম্পিটিশনে হারার পর একটা খারাপ সময় যায়। সেই সময় নিজেকে ভাসিয়ে রাখা শক্ত কাজ। রান্না তোর প্যাশন। সেই প্যাশন মরে গেলে কী নিয়ে থাকবি? যাক গে। তুই যা ভাল বুঝিস, কর। আমি এর মধ্যে নাক গলাব না," ফোন কেটে দেন মঞ্জু।
হ্যান্ডসেট যূথিকার হাতে ধরিয়ে মধুরা বলে, "আমি স্নান করতে চললাম। খেয়ে দেয়ে দুপুরে তোফা ঘুমাব। বিকেল নাগাদ বেরব।"
"যাবিই তা হলে?" হতাশ হয়ে ফোনটা ঠক করে টেবিলে রাখে যূথিকা।
সবিতা বলে, "আমি আধঘণ্টা বাদে ভাত বাড়ব। তুমি চান করে এসো।"

চান করে, খেয়েদেয়ে এক প্রস্থ ঘুমোয় মধুরা। ঘুম থেকে উঠে, ফ্রেশ হয়ে একটা ফেডেড জিন্স গলায়। হালকা গোলাপি রঙের টি-শার্ট পরে। চোখে তোলে মোটা ফ্রেমের চশমা। কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা চুল সযত্নে

ব্যাককোম্ব করে। গায়ের রং আর হাইটের কথা ভেবে আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচে, ফশশশ করে সারা শরীরে ছড়িয়ে দেয় ডিও। হোবো ব্যাগ নিয়ে তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। যুথিকার গালে চুমু খেয়ে, দরজা খুলে বলে, "সবিতাদি, বন্ধ করে দাও।"

ভৌমিক মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বিমলকাকা ঝিমোচ্ছে। চোখ খুলে বলল, "অবেলায় কোথায় চললে?"

সামনে বাস। তড়াক করে উঠে মধুরা বলল, "নদীর ওপারে।"

বাসটা কলেজ মোড়ের আগে ঘুরে যায়। মিনিটপাঁচেক হেঁটে যখন ক্যালকাটা ধাবায় পৌঁছল মধুরা, তখন পৌনে ছ'টা বাজে। মন্টু লাফাতে-লাফাতে এসে বলল, "মা তোমার উপর খচে আছে। দেরি করলে কেন?"

"চুপ কর," মন্টুর গাল টিপে বেঞ্চে বসে মধুরা।

পারুল ভাতের হাঁড়ি ধুচ্ছিল। বলল, "বাসমতী চালের প্যাকেট ওই দিকে রাখা আছে।"

"আমি কী করব?" অবাক হয়ে বলে মধুরা।

"মানে?" ডবল অবাক হয়ে পারুল বলে, "আজকের বিরিয়ানি তুমি রাঁধবে, এরকমই তো কথা।"

"কে ঠিক করল?" ইরিটেটেড হয়ে বলে মধুরা।

"না...মানে..." ঢোঁক গেলে পারুল, "তোমার দাদা বলছিল..."

"আমি রান্না করতে ভালবাসি মানে এই নয় যে, তোমাদের ধাবায় এসে দু'বেলা রেঁধে যাব!" মধুরার গলা থেকে বিরক্তি যায়নি, "আমার অন্য কাজ আছে।"

হাঁড়ি মাজতে-মাজতে পারুল বলে, "আমায় এসব বলে লাভ নেই। তোমার দাদা মাংস কিনতে বানতলা গিয়েছে। সে ফিরলে বোলো।"

মধুরা মনস্থির করতে পারে না, অতক্ষণ বসবে কি না। আড়চোখে ঘড়ি দেখে।

"আজ টিভি পার্টি আসছে। শুটিং করতে জয়নগর গিয়েছিল, ফেরার পথে এখানে খাবে। সাহেব-মেম থাকবে, দিল্লি-বম্বের লোকজন থাকবে। ৩০ জনের রান্না। টিভির লোকগুলো বড্ড বেলেল্লাপনা করে। মদ খেয়ে আউট হয়ে নাচানাচি, খেস্তাখিস্তি! আমরা সামলাতে পারি না বলে তোমায় ডাকা," পারুলের কথার মধ্যে একটা এসি বাস ধাবার সামনে দাঁড়াল। তার থেকে নামল একগাদা মাঝবয়সি ছেলেমেয়ে। ভাষা শুনে মালুম হয়, সারা ভারতের লোকজন রয়েছে। রংচঙে পোশাক-আশাক, বিচিত্র সানগ্লাস, অদ্ভুতুড়ে হেড গিয়ার দেখে আন্দাজ করা যায়, এরা সিনেমা বা টিভির সঙ্গে যুক্ত। গাড়ি থেকে নেমেই কয়েকজন বিশাল ক্যামেরা নিয়ে স্টিল ফোটো তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কয়েকজন ডিজিটাল ক্যামেরায় মুভি তুলতে লাগল। রিফ্লেক্টর, লাইটোমিটার, ট্রাইপড ট্রলি — সব মিলিয়ে হট্টগোলের একশেষ। ড্রাইভার হতাশ হয়ে প্রশ্ন করল, 'আপলোগ হোটেল নহি জায়েঙ্গে?"

হোটেল যাওয়া প্রসঙ্গে মেয়েরা একমত। একজন বলল, 'আই নিড আ লিক।" একজন বলল, 'আই মাস্ট চেঞ্জ।' একজন বছরষাটেকের লোক বলল, 'তোরা ঘুরে আয়। তারপর আমরা যাব।' মেয়েদের নিয়ে গাড়িটা চলে গেল। থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট, হাওয়াই চপ্পল, ফ্লোরাল প্রিন্টেড শার্ট পরা, নেড়া মাথা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা লোকটা পারুলকে প্রশ্ন করল, 'রান্নাবান্না কদ্দুর? মেয়েরা হোটেল থেকে ফিরলেই শামি কাবাবটা দিয়ে দিতে হবে।' মধুরা এতক্ষণে লোকটাকে চিনতে পারল। রাহুল গোয়েঙ্কা! আগের বার এই ধাবাতেই দেখা হয়েছিল।

আঁচলে হাত মুছে পারুল স্মার্টলি বলল, "মেয়েদের ফিরতে ঘণ্টাখানেক লাগবে। আপনারাও স্নান-টান করে আসুন। তার মধ্যে সব রেডি হয়ে যাবে।"

"সুলতান কোথায়?" টাকে হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করল রাহুল।

"এই তো আমি," রাস্তায় স্কুটার দাঁড় করিয়ে সুলতান হাঁক পাড়ল, "মন্টু, মধু, এগুলো নিয়ে যা।"

মধুরা দেখল, চার ব্যাগ ভর্তি প্রায় ২০ কেজি মাংস আছে। মন্টু ছুটে গিয়ে স্কুটারের ফুটরেস্ট থেকে দুটো ব্যাগ তুলল।

"তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম," বেঞ্চ থেকে উঠে সুলতানের দিকে তাকিয়ে বলল মধুরা, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"তোর বউদি বলেনি? বানতলা গিয়েছিলাম," বাকি ব্যাগ দুটো নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে সুলতান বলে, 'এ কী, রান্নাবান্না শুরু করিসনি?"

"তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম," পুরনো বাক্য রিপিট করে মধুরা। "শুধু দেখা করতে, রান্না করতে নয়। চললাম," তারপর ব্যাগ কাঁধে নিয়ে রাস্তার দিকে এগোয়।

"চললি মানে?" হাতের ব্যাগ ছুড়ে ফেলে হুঙ্কার ছাড়ে সুলতান। তার বাঘডাকা চিৎকারে মধুরা চমকে ওঠে। টিভির লোকগুলো ছবি তোলা বন্ধ করে দেয়। পারুল মন্টুকে কোলে টেনে নেয়। রাহুল আর একবার টাকে হাত বুলোয়।

মধুরা বলে, "চললাম মানে, চললাম! রান্নাবান্না নিয়ে অনেক পণ্ডশ্রম হল। এবার বিয়ে-থা করব, চাকরিবাকরি করব, সংসার করব। জীবনটা তানানানা করে কাটিয়ে দেব। আনসার্টেনটি, অ্যাংজাইটি, স্পটলাইটের জন্য কামড়াকামড়ি, এই সব আমার জন্য নয়। আমি সাধারণ মেয়ে। সাধারণই থাকতে চাই।"

"এই হচ্ছে বাঙালির বাচ্চার কলজের জোর!" রাহুলের দিকে ফিরে বলে সুলতান, "খালি বড়-বড় কথা। খালি বাতেলা। খালি নিজেকে প্রতিভাবান ভাবা আর দুনিয়াকে দোষ দেওয়া, যে তোরা আমাকে বুঝলি না! কিন্তু সামনে যেই হার্ডল আসবে, পাছা ঘুরিয়ে দাঁড়াবে! একবার ঝাড় খাবে আর অ্যাব্সিডেন্ট হওয়া কুত্তার মতো নিজের ঘা চাটবে আর শুয়ে-শুয়ে ঘেউ-ঘেউ করবে। পাল্টা ঝাড় দেওয়ার মুরোদ নেই!"

"এটা কি ভোকাল টনিক?" বিদ্রূপ করে মধুরা, "যদি তা-ই হয়, তা হলে বলি, সব খেলা শেষ। যারা জিতেছে, তারা ভিকট্রি স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে। আমি আপাতত দর্শক।"

সুলতান কোনও কথা না বলে মধুরার দিকে পাঁচ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে। তার জ্বলজ্বলে শ্বাপদ দৃষ্টির সামনে মধুরা কুঁকড়ে যায়। নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে সম্মোহন কাটানোর চেষ্টা করে মধুরা।

সুলতান বড়-বড় পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে আসে। ডান হাত তুলে সর্বশক্তি দিয়ে গালে এক থাপ্পড় কষায়। মধুরার নরম গালে সুলতানের কেঠো হাত চাবুকের মতো আছড়ে পড়ে। গাল লাল হয়ে যায়, মাথা ঝনঝন করতে থাকে, ব্যথার প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় চোখ উপচে টপটপ করে জল পড়ে। পারুল মন্টুকে ছেড়ে মধুরার দিকে দৌড়ে আসে।

বাঁ হাত দিয়ে পারুলকে আটকায় সুলতান। মধুরাকে বলে, "ক্যালকাটা ধাবায় এসেছিস নিজের ইচ্ছেয়। যাবি আমার ইচ্ছেয়। যা বলছি, শোন। রান্না শুরু কর। না হলে আরও মার খাবি। থানাপুলিশের ভয় দেখাস না। ওসব ঘাটের জল আমার খাওয়া আছে। যা।"

শেষ 'যা'টা নির্দেশ! মধুরার মাথা কাজ করছে না। গাল জ্বালা করছে। ভিতরে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে, যার কোনও নির্দিষ্ট নাম নেই। রাগ? ঘৃণা? বিতৃষ্ণা? ভয়? প্রতিশোধস্পৃহা? নাঃ, কোনওটাই নয়। অধিকারবোধের কাছে মাথা নত করার তৃপ্তি? সাবমিশন? আত্মগ্লানি? এগুলোও নয়। ভাল লাগা? মন্দ লাগা? কিছু না লাগা? কে জানে! সব মিলেমিশে পঞ্চব্যঞ্জনের মতো, চর্বচোষ্যলেহ্যপেয়র মতো, দুধ-দই-ঘি-মধু-চিনির মতো, টক-ঝাল-মিষ্টি-নোনতার মতো মিশ্র অনুভূতি তৈরি করছে তার মাথায়, তার হৃদয়ে। টিভি ক্রু-রা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে রাহুল, পারুল, মন্টু। তাকিয়ে রয়েছে সুলতান। কাউকে পাত্তা না দিয়ে মধুরা কাঁধের ব্যাগটা বেঞ্চের উপর রাখে। এক ঝটকায় একটা মাংসের ব্যাগ রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে হাঁক পাড়ে, "পারুলদি, শামি কাবাবের জন্য মশলাপাতি কোথায়?"

১৭

মস্ত বড় কড়াইয়ে টগবগ করে ফুটছে ঘি। তার মধ্যে জুলিয়েন কাট পেঁয়াজ ছাড়ে মধুরা। পেঁয়াজের টুকরো নরম আর সাদা হয়ে এলে, একে-একে ঢালে রসুন, কাঁচালঙ্কা, আদাবাটা, গরমমশলা, হলুদগুঁড়ো। ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে যায় চারদিক। খুন্তি দিয়ে পেঁয়াজ কষতে-কষতে মধুরা ভাবে, কেন সে এই রান্নাটা করছে? সুলতানের থাপ্পড় খেয়ে নয়। দ্যাট্স ফর শিওর। ওটা ট্রিগারিং এফেক্ট দিয়েছে। কিন্তু ওটা থট প্রসেস নয়। থট প্রসেস তা হলে কী? হেরে যাওয়ার পরও আর একবার নিজেকে প্রমাণ করার মরিয়া চেষ্টা? না। আবার ঘাড় নাড়ে মধুরা।

"হাই মধু!" তার পিঠে টোকা মেরে হাসি-হাসি গলায় বলে মেরি।

"তুমি এখানে?" অবাক হয়ে বলে মধুরা। টিভি ক্রুদের মধ্যে মেরি ছিল? মধুরা খেয়াল করেনি। তিন-চার মিনিট মশলা কষা হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে মাংসের কিমা মিশিয়ে সে খুন্তি নাড়তে থাকে।

"হাই লাইফ চ্যানেল ইন্ডিয়ায় লঞ্চ করার জন্য কয়েকটা ইন্ডিয়া-সেন্ট্রিক শো ডিজাইন করছে। তার মধ্যে একটা শো ইন্ডিয়ান স্ট্রিট ফুড নিয়ে। সেখানে মেট্রোপোলিটান সিটি থেকে মফস্সল থেকে গ্রাম, সব জায়গার স্ট্রিট ফুড নিয়ে কথা হবে। এই শো-টার বেঙ্গল চ্যাপ্টারের শুটিংয়ের সময় ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব পেয়েছে ডিপ ফোকাস।"

"তুমি এত বড় খবরটা চেপে রেখেছিলে?" ভাজা কিমায় লেবুর রস চিপে দেয় মধুরা। বেসন মেশায়।

"ওরা খুব হ্যাশ-হ্যাশ। গত দু'দিনে জয়নগরের মোয়া কভার করে, সুন্দরবন বেড়িয়ে, এই ফিরলাম," টেকো রাহুলকে ডেকে নেয় মেরি, "আলাপ করিয়ে দিই, 'নৌটঙ্কি' সফ্টওয়্যার কোম্পানির এম ডি, এই প্রোগ্রামের লাইন প্রোডিউসর। আর এ হল মধুরা ভৌমিক। আমার মেয়ের বন্ধু, 'পাঁচফোড়ন'-এর সেকেন্ড রানার আপ।"

"আমাদের আগে আলাপ হয়েছে," বিড়-বিড় করে বলে মধুরা। সেই আলাপের কথা রাহুলের বোধ হয় মনে নেই। 'পাঁচফোড়ন' প্রোগ্রাম সম্পর্কেও হয়তো কিছু জানেন না। মধুরাকে পাত্তা না দিয়ে সে বলল, "শামি কাবাব তৈরি হতে কতক্ষণ লাগবে?"

দু'হাতে ন্যাকড়া জড়িয়ে বিশাল কড়াই উনুন থেকে তুলে, একটা ডেকচিতে মাংস ঢালে মধুরা। রাহুলকে বলে, "কতক্ষণ সময় দেবেন?"

"শুনেছি, সবুরে মেওয়া ফলে," ডিজিটাল ক্যামেরায় মধুরার ঘাম গড়ানো মুখের ছবি তোলে রাহুল।

নাকের ডগায় চশমা। ঘর্মাক্ত, তেলতেলে মুখ। চুলগুলো গালের উপরে ঝামরে পড়েছে। এই অবস্থায় ছবি? মধুরা একবার ভাবল, আপত্তি করবে। পরে মনে হল, দরকার নেই। সুলতানের থাপ্পড় খেয়ে সে অলরেডি অপ্রস্তুত। নতুন করে অপ্রস্তুত হওয়ার কোনও দরকার নেই। ক্যাজুয়ালি রাহুলকে বলল, "মেওয়া ফললেও লাভ নেই। আজকের যা মেনু, তাতে মেওয়া লাগবে না।"

"হোয়াটস কুকিং?" প্রশ্ন করেছে একটি অবাঙালি ছেলে। সে ট্রাইপডের উপরে ক্যামেরা বসিয়ে ছবি তুলতে শুরু করেছে। ক্যামেরা অ্যাঙ্গল বেশ উদ্ভট। উনুনের পিছন দিক গিয়ে সে একইসঙ্গে রান্না এবং রাঁধুনির ছবি তুলছে।

যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে। অবাধ্য চুল দিয়ে একটা বড়ি খোঁপা বানিয়ে, ছোকরার দিকে তাকিয়ে মধুরা বলল, "শামি কাবাব। ফিঙ্গার ফুড ফর ইয়োর ড্রিঙ্ক।" সেদ্ধ কিমা ব্লেন্ডারে দিয়ে ফুলকোর্সে চালিয়ে বলল, "শিলনোড়ায় বাটলে আরও খোলতাই হত, তবে তাড়াতাড়িতে মেশিনই ভরসা," বলে ব্লেন্ডারের ঢাকনা খুলে ডিম ফাটিয়ে ফটাফট মিশ্রণের মধ্যে ফেলল।

মন্টু কয়েকটা সেদ্ধ ডিম এগিয়ে দিয়েছে। অভ্যস্ত হাতে ছুরি দিয়ে পিস-পিস করে কেটে সেগুলো অন্য পাত্রে রাখে মধুরা। তাতে মেশায় কিশমিশ, বাদাম, কাটা

পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, সরু-সরু করে কাটা পুদিনাপাতা। রাহুলের দিকে তাকিয়ে বলে, "এগুলো দিয়ে পুর হবে। ব্লেন্ডার দু'মিনিট ঘোরানো যাক।"

ক্রুরা টুলি পাতছে, আলো জ্বালছে, রিফ্লেক্টর সাজাচ্ছে। এদের উদ্দেশ্য কী? মধুরার আন্দাজ, ইন্ডিয়ান স্টিট ফুড নিয়ে হাই লাইফের সিরিজটায় ক্যালকাটা ধাবা নিয়ে একটা সেগমেন্ট থাকবে। সেই জন্য তাকে এই ডিশ তৈরি করতে হচ্ছে। এইজন্য সুলতানদার এত হম্বিতম্বি? মেরি মাসির এত রহস্য? ধুস!

মাথা থেকে চিন্তার জাল ছাড়ায় মধুরা। ব্লেন্ডার অফ করে, পাত্রে মাংসের পুর ঢালে। বেশ মাখো-মাখো হয়েছে। ডেকচির মাংস লেচির আকারে কেটে লেচির মধ্যে পুর ভরে। মিনিটপনেরোর মধ্যে ষাটটা পুরভরা লেচি তৈরি হয়ে যায়। লেচিতে শুধু পুর ভরছে না মধুরা। প্রতিটি লেচিতে মিশিয়ে দিচ্ছে এক চামচ ভালবাসা। 'পাঁচফোড়ন'-এর ফাইনাল রাউন্ডকে সে যুদ্ধ হিসেবে নিয়েছিল। প্রতিটি ডিশ তৈরির সময় তার বুকের মধ্যে টগবগ করে ফুটছিল স্যান্ডির প্রতি ক্রোধ। মাথায় গনগন করছিল নেহার প্রতি ঘৃণা। তার রান্নায় মিশে গিয়েছিল সেসব অনুভূতি। আর কোনওদিন ওই ভুল করবে না মধুরা। সুলতানের থাপ্পড় তাকে আমূল বদলে দিল। রন্ধনশিল্প শুধু উদরপূর্তির জন্য নয়। মানুষের মন জয় করার জন্য। মধুরা একজন শিল্পী। নির্দিষ্ট ফরম্যাটের রিয়্যালিটি শোতে বিজেতার শিরোপা না পেলেও সে শিল্পী। শিল্পী হওয়ার প্রাথমিক শর্ত, ভালমানুষ হওয়া। যার মন পোড়া কড়াইয়ের মতো কালো, তার হাতে মধু নেই! সমস্ত কালোকে বিসর্জন দিয়ে, শুদ্ধ চিত্তে আজ মধুরা রাঁধবে। ক্যালকাটা ধাবার কাস্টমাররা খেয়ে খুশি হলেই সে তৃপ্ত। অন্য কোনও পুরস্কারের প্রয়োজন নেই। মধুরা স্বপ্নের মধ্যে রান্না করতে থাকে। তাওয়ায় ঘি ঢালে। ঢালে এক চামচ ভালবাসা। শামি কাবাবের টুকরো সেঁকে-সেঁকে ভাজে। পেপার ন্যাপকিনে রেখে তেল ঝরায়। প্লেটে সাজিয়ে, লেবু চিপে দেয়। অনিয়ন রিং দিয়ে গার্নিশ করে। গার্নিশ করে ভালবাসা দিয়ে।

মেয়েরা চলে এসেছে। ধাবার পার্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। পারুল কাবাব পরিবেশন করছে, মেরি সুরা ঢেলে দিচ্ছে পানপাত্রে। ক্রুরা এক জায়গায় বসে না থেকে ধাবায় ঘুরছে, মধুরার ছবি তুলছে, আলো ঠিক করছে, টুলি শট নিচ্ছে। মধুরা বিরিয়ানির জন্য বাসমতী চাল ভেজাচ্ছে, মটনের টুকরো ধুয়ে-মুছে রাখছে, অল্প তেলে টুকরোগুলো ভেজে আদা-রসুন-লঙ্কা দিয়ে কষছে। পেস্তা ছাড়িয়ে কুচিয়ে রাখছে, কিশমিশ ও খুবানি ভেজে নিচ্ছে, হাঁড়িতে ঘি গরম করে ভেজানো চাল ভেজে নিচ্ছে, জল ঢালছে। রাহুল তাকে বিরিয়ানির ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন করছে। গরমে ঘামতে-ঘামতে, নাকের চশমা ঠিক করতে-করতে, খুলে যাওয়া বড়ি খোঁপা ঠিক করতে-করতে মধুরা উত্তর দিচ্ছে।

একজন মেমসাহেব ভডকার পাত্র মধুরাকে অফার করে বলল, "হাই, আয়্যাম এলিজাবেথ! ইউ ক্যান কল মি লিজ।"

পাত্র নিয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে এক চিমটি লাস্য, আর অনেকটা ভাল লাগা মিশিয়ে মধুরা বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ লিজ, আই অ্যাম মধুরা। অ্যান্ড আই অ্যাম আ টিটোটেলার।"

সন্ধে গড়াচ্ছে রাতের দিকে। ভাত দু'ভাগ করছে মধুরা। অর্ধেক ভাতে কেশর মেশাচ্ছে। হাঁড়ির একদম নীচে সাদা ভাত রাখছে, তার উপরে এক স্তর পাঁঠার মাংস রাখছে, তার উপরে রাখছে এক স্তর কেশর মেশানো হলুদ ভাত। প্রতি স্তরে ছড়িয়ে দিচ্ছে কিশমিশ, পেস্তা, খুবানির কুচি। একদম উপরের স্তরে সাদা ভাত সাজানোর পর ডেকচির মুখে থালা বসিয়ে ময়দা দিয়ে সিল করছে। টিমে আঁচে ডেকচি বসিয়ে দিচ্ছে। মিনিটকুড়ি পরে ঢাকনা খুলে হাঁড়িতে ঢেলে দিচ্ছে গরম ঘি। ঢালছে জায়ফল, জয়ত্রি, কেওড়া, গোলাপজলের এসেন্স। ঢালছে এক চামচ ভালবাসা। আবার ঢাকনা বন্ধ করছে। বিরিয়ানির খোশবাইতে আমোদিত হয়ে যাচ্ছে ক্যালকাটা ধাবা। কলেজ মোড়ের সিগন্যালে দাঁড়ানো বাস আর ট্যাক্সির যাত্রীরা ঘন-ঘন নাক টানছে। লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

মধুরাকে নিয়ে লিজের প্রবল কৌতূহল। সে একের পর-এক প্রশ্ন করে চলেছে। বিরিয়ানির প্রস্তুতপ্রণালী থেকে সে চলে গিয়েছে রাঁধুনির জীবনচরিতে। জেনে নিচ্ছে শিক্ষাগত যোগ্যতা, ঠিকানা, পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড, লাভ ইন্টারেস্ট, চাকরির অভিজ্ঞতা। রাহুল আর এক পেগ ভডকা তার হাতে তুলে দিয়ে বলছে, "লিজ, ডোন্ট বি সো নোঙ্গি। গিভ হার টাইম।"

"ইট্স অলরাইট," ডিমসেদ্ধ হাফ করতে-করতে বলছে মধুরা। নিজেকে বলছে, তাড়াতাড়ি করো। এখনও চিকেন চাঁপ আর শাহি টুকরো বানানো বাকি। কুইক! মধুরা কুইক!

লিজ বলল, "সো, ইউ ওয়্যার গ্রোন আউট ফ্রম ফাইনাল রাউন্ড অফ আ কুকারি শো। হাউ ওয়াজ দ্য ফিলিং?"

"ইনিশিয়ালি, দেয়ার ওয়াজ আ লো ফেজ," ঢোলা চশমা নাকের ডগায় তুলে জবাব দেয় মধুরা, "বাট দেন, আই হ্যাভ গট আ সাপোর্ট সিস্টেম। মাই ফ্যামিলি, মাই ফ্রেন্ড ফিলজফার অ্যান্ড গাইড সুলতানদা..." এদিক-ওদিক তাকিয়ে সুলতানকে খোঁজে মধুরা। সুলতানকে দেখতে পাওয়ার বদলে দেখে দূরের টেবিলে কাঁসার থালায় সাজানো চিকেন চাঁপ থেকে ধোঁয়া উঠছে।

মধুরা যখন টিভি ক্রুদের ফ্ল্যাশব্যাক, রিফ্লেক্টর, টুলি ক্যামেরা, হ্যান্ডিক্যামের সামনে রান্না করছিল, তখন স্পটলাইটের আড়ালে থেকে চিকেন চাঁপ রান্না করে মধুরার মান রক্ষা করেছে সুলতান।

"থ্যাঙ্কস সুলতানদা!" মনে-মনে সুলতানকে ধন্যবাদ দেয় মধুরা। লিজকে বলে, "কাম। লেট মি সার্ভ ইউ ডিনার," তারপর চিকেন চাঁপের থালা দু'হাতে ধরে রান্নাঘরে থেকে তুলে ডাইনিং এরিয়ায় রাখে। মধুরার শারীরিক ক্ষমতা দেখে টিভি জুরা হই-হই করে ওঠে। পারুল পাশ থেকে মধুরার কনুই ধরে বলে, "তোমার দাদা শাহি টুকরাও বানিয়ে রেখেছে। তুমি ওদের খেতে দাও। আমি সাহায্য করছি।"

জার্মান সিলভারের থালায় পরিবেশিত হচ্ছে মটন বিরিয়ানি। বড় বাটিতে চিকেন চাঁপ। সাহেব-মেমরা কাঁটা চামচ ভুলে হাত দিয়ে বিরিয়ানি খাচ্ছে আর বলছে, 'ইন্ডিয়ান স্টাইল! ইন্ডিয়ান স্টাইল!' রাহুল লিজকে ইন্ডিয়ান স্পাইসের গুণাগুণ বোঝাচ্ছে। ভডকা উড়ে যাচ্ছে জলের মতো। বড় এক হাঁড়ি বিরিয়ানি শেষ হয়ে গেল। শেষ হয়ে এল চিকেন চাপ। এখন শাহি টুকরা খাচ্ছে লোকজন।

লিজ তার ল্যাপটপে এতক্ষণ ধরে তোলা ছবি দেখছে। পাশে রাহুল। দু'জনে শাহি টুকরা খেতে-খেতে থামস আপ করছে। জুরা খাওয়াদাওয়া শেষ করে হাত ধুচ্ছে, যন্ত্রপাতি গুটাচ্ছে, উঠে যাচ্ছে এসি বাসে। ক্যালকাটা ধাবা ফাঁকা হয়ে আসছে। এখন রাহুল, লিজ, পারুল, আর মধুরা ছাড়া কেউ নেই। মন্টু বাবাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

"সো ইটস অফিশিয়াল?" পেপার ন্যাপকিনে মুখ মুছে, মুখে মৌরি ফেলে প্রশ্ন করছে রাহুল।

"ইয়াপ। ইটস মাই শো। আয়্যাম দ্য এগক্বিকিউটিভ প্রোডিউসর। আয়্যাম গিভিং ইউ গ্রিন সিগন্যাল। অ্যাজ আ লাইন প্রোডিউসর, ইউ লক হার," অ্যাপলের ল্যাপটপ বন্ধ করতে-করতে বলছে লিজ। লক হার? লিজ তাকে গ্রেফতার করবে? নিজের কল্পনাশক্তির দৌড় দেখে মুচকি হাসে মধুরা। সে মনে-মনে জানে, ব্যাপারটা কী হল। হাই লাইফের ইন্ডিয়ান স্ট্রিট ফুড নিয়ে সিরিজটার কলকাতা এপিসোডে সে থাকছে।

"মধুরা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে," গম্ভীর গলায় বলে রাহুল। এতক্ষণ যে হাসি-খুশি ভাব তার মুখে খেলা করছিল, তা উধাও। নৌটঙ্কি প্রোডাকশন হাউসের এম ডি এখন মধুরার সঙ্গে কথা বলছে।

মধুরা বলল, "বলুন।"

"হাই লাইফ একটা নতুন কুকারি শো লঞ্চ করতে চলেছে। ইন্ডিয়ান স্ট্রিট ফুড সিরিজ শেষ হলে এটা শুরু করা হবে। কিন্তু এর ফরম্যাট আলাদা।"

"ইন্ডিয়ান স্ট্রিট ফুডের এই এপিসোডটায় আমি থাকব তো?" বেচারা-বেচারা মুখ করে জানতে চায় মধুরা। স্পটলাইট একটা অ্যাডিকশন। 'পাঁচফোড়ন'-এর ফাইনাল পর্যন্ত গিয়ে সে বুঝতে পেরেছে। রিজিওনাল প্রোগ্রামে মুখ দেখানোর পরে ইংরিজি চ্যানেলে মুখ দেখানো ইয়ার্কির ব্যাপার নয়।

"তুমি আমার কথা মন দিয়ে শুনছ না," মধুরার কাঁধে হাত রেখে বলে রাহুল।

"তুমি আমার কথা মন দিয়ে শুনছ না," মধুরার কাঁধে হাত রেখে বলে রাহুল।

লিজের দিকে তাকিয়ে ইংরিজিতে বলে, "আমরা একটা নতুন ফরম্যাটের কুকারি শো লঞ্চ করতে চলেছি। হোস্ট বেস্ড শো, অ্যাজ ইন নাইজেলা লসন শো। বা সঞ্জীব কপূরের খানা-খাজানা। যেখানে একজন হোস্ট প্রতি এপিসোডে নতুন-নতুন রান্না করবে।"

"তো?" অবাক হয়ে বলে মধুরা।

"লন্ডনকে বলা হয় মেল্টিং পট। সারা পৃথিবীর মানুষ জীবিকার সন্ধানে গ্রেট ব্রিটেনকে নিজের দেশ তৈরি করে ফেলেছে। ইন্ডিয়ান, বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, তিব্বতি, শ্রীলঙ্কান, চাইনিজ, জাপ, আমেরিকান, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, ইজরায়েলি মানুষে লন্ডন ভর্তি। এই স-অ-ব দেশের রান্না লন্ডনে পাওয়া যায়। পাঁচতারা হোটেলের বাইরে, মিশেলিন স্টারবিহীন রেস্তোরাঁয়। ফুটপাতে, ঘেটোয়, ডরমিটরিতে, কমন পিপলের রান্নাঘরে। এই ইন্টিগ্রেশন থ্রু ফুডকে সেলাম জানিয়ে হাই লাইফ নতুন শো লঞ্চ করছে। যার নাম, মেল্টিং পট।"

"মেল্টিং পটের হোস্ট হিসেবে আমরা একজন নন-ইংলিশ, কালারড ইন্ডিভিজুয়াল খুঁজছি। শো-এর কনসেপ্ট আমাদের ইউএসপি। আমরা কোনও হোয়াইট-অ্যাংলো স্যাক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট স্টার শেফ চাইছি না," মধুরার চোখে চোখ রেখে কথা বলছে লিজ, "আমরা এমন একজনকে খুঁজছি, যার ইংরেজি বলায় ত্রুটি নেই, যে ক্যামেরার সামনে স্বচ্ছন্দ, যে ভাল কথা বলতে পারে, এবং কথা বলতে-বলতে সব রকমের রান্না করতে পারে। গত ছ'মাস ধরে আমরা ৫০০ জনকে ট্রাই করেছি। ইট ওয়াজ আ ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল হান্ট। অ্যাট লাস্ট, আমরা তোমাকে সিলেক্ট করলাম।"

মধুরার মনে এখন পাঁচশো প্রশ্ন পপকর্নের মতো ফুটছে! সে প্রথম প্রশ্নটা করল, "হোয়াই মি? আমার মধ্যে কী এমন আছে, যাতে ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল হান্টে ৪৯৯ জনকে হারিয়ে এই শোয়ের হোস্ট হলাম?"

"তুমি কাউকে হারাওনি ডার্লিং! দিস ইজ নট আ রিয়্যালিটি শো। দিস ইজ লাইফ। আমরা সবাই ডেস্টিনিজ চিলড্রেন। ঈশ্বর আমাদের সকলকে কোনও একটা কাজ দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমাদের মধ্যে কেউ পলিটিশিয়ান হয়, কেউ টিচার। কেউ সমাজবিরোধী, কেউ সিইও। কেউ চাকুরিজীবী, কেউ ফিল্ম ডিরেক্টর। ইটস ফেট। ইউ ওয়্যার ডেস্টিনড টু বি আ শেফ। অপরচুনিটি তোমার সামনে। তুমি অ্যাকসেপ্ট করবে, না টেকনো-কুলি হবে, সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে।"

"আমি আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। আমি জানতে চাইছি, আমার মধ্যে আপনারা কী পেলেন যে মুহূর্তের মধ্যে ঠিক করে ফেললেন, 'মেল্টিং পট' হোস্ট করার যোগ্যতা আমার মধ্যে আছে?"

"লেট মি এক্সপ্লেন," লিজকে থামিয়ে দিয়ে রাহুল বলে, "আমরা এক মুহূর্তে কিছু ঠিক করিনি। ইটস ওয়াজ আ লং অ্যান্ড স্ট্রেনুয়াস প্রসেস ফর লাস্ট সিক্স মান্থস। এই টিম নিউকামারদের অডিশন নিয়েছে, আমার মতো অন্য দেশের লাইন প্রোডিউসরদের ট্যাপ করে বিভিন্ন কুকারি শোয়ের কম্পিটিটারদের উপরে নজর রেখেছে। তোমাকে আমরা 'পাঁচফোড়ন' দেখে স্পট করেছি। আই টোল্ড মেরি অ্যান্ড সুলতান টু গেট ইন টাচ উইথ ইউ।"

"কিন্তু আমি তো 'পাঁচফোড়ন'-এ হেরে গেলাম!"

"সেটা ওই শোয়ের প্যারামিটার। আমাদের প্যারামিটার আলাদা। আমাদের রিসার্চ

বলছে, দর্শকের সঙ্গে তোমার ইমোশনাল কানেক্ট খুব ভাল। তোমার শ্যামলা রং, তোমার মাঝারি হাইট, তোমার তেলতেলে মুখ, তোমার ওভারসাইজড চশমা, তোমার ঘন-ঘন চুল ঠিক করার কায়দা...এগুলো তোমাকে 'গার্ল নেক্সট ডোর'-এর ইমেজ দিয়েছে। তোমার র-নেস, তোমার দিলখোলা হাসি, ভারী বাসন তুলে ধরার মধ্যে রান্নার প্রতি তোমার যে প্যাশন ফুটে উঠেছে, দ্যাট্স ইয়োর এক্স ফ্যাক্টর। তোমার চুলের লেংথ বাড়াতে হবে। লং হেয়ারের এগজ়টিক ভ্যালু আছে। দরকার হলে হেয়ার এক্সটেনশনও লাগাতে হতে পারে।"

"আমার চুল কোমর পর্যন্ত। মেনটেন করতে অসুবিধে হয় বলে ছেঁটে ফেলেছি। বাই দ্য ওয়ে, আপনি কী বললেন? এক্স ফ্যাক্টর? আমার?" হো-হো করে হেসে ওঠে মধুরা।

"সকলের মধ্যেই এক্স ফ্যাক্টর থাকে মধু," চেয়ার থেকে উঠে বলে লিজ়, "শুধু জানতে হয়, কোন ফিল্ডে।

বেশিরভাগ মানুষ খেয়ে, ঘুমিয়ে আর টাকা রোজগারের ধান্দা করে সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। তারা জানতেও পারে না, তাদের জন্য অন্য একটা জীবন অপেক্ষা করে আছে। যার ফুটবল প্রতিভা আছে, সে সাংবাদিক হয়। যে চমৎকার ভরতনাট্যম নাচে, সে শিক্ষকতা করে। যার টিম লিডার হওয়ার যোগ্যতা আছে, সে ছবি আঁকে। সকলে ভুল জীবনযাপন করতে থাকে। ইউ আর ব্লেসেড মধু, যে জীবনের গোড়াতেই দিকনির্দেশ পেয়ে গেলে!"

লিজ়ের কথার মধ্যে আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকায় মধুরা। সাড়ে দশটা বাজে। বাবা-মা চিন্তা করছে। সেটা ম্যানেজ করা যাবে। কিন্তু সুলতানদার পাত্তা নেই কেন? মন্টু অনেকক্ষণ হল তার বাবাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। এখনও ফিরল না। পারুল আপনমনে বাসন ধুচ্ছে। তার মুখে দুশ্চিন্তার কোনও ছাপ নেই।

"তোমাকে বাড়ির পারমিশন নিতে হবে?" রাহুল প্রশ্ন করে।

"ফর্ম্যালিটি," উত্তর দেয় মধুরা, "আমার কোনও ডিসিশনে বাড়ির লোক না বলবে না।"

"ইয়োর কারেন্ট জব? ছাড়তে প্রবলেম হবে না?" লিজ়ের প্রশ্ন।

"অ্যায়াম বিটুইন জবস।"

"দ্যাট্স ফ্যান্টাস্টিক!" খুব খুশি লিজ়, "পাসপোর্ট আছে? এনি পুলিশ রেকর্ডস? এনি হিডন অ্যাজেন্ডা টু ডিক্লেয়ার?"

"পাসপোর্ট আছে। পুলিশের রেকর্ড নেই। নো হিডন অ্যাজেন্ডা। নো স্কেলিটন ইন কাবার্ড। আমি একজন সৎ ভারতীয় নাগরিক।"

"দ্যাট্স গুড!" রাহুল বলে, "তুমি আগামীকাল সকাল এগারোটায় হোটেল সুবর্ণ-র রুম নম্বর ৩০৪-এ এসো। কিছু পেপার ওয়র্ক আছে। কোনও ল-ইয়ার আনতে চাইলে, আনতে পার। বাট বেসিক কন্ডিশনস আর, নাম্বার ওয়ান: আগামী এক বছর তুমি লন্ডনে 'মেল্টিং পট' টিমের সদস্য হয়ে থাকবে। তোমার যাবতীয় দায়িত্ব হাই লাইফ চ্যানেলের। নাম্বর টু: 'মেল্টিং পট' উইল বি অ্যান ওয়ান আওয়ার শো, যেটা প্রতিদিন টেলিকাস্ট হবে। সুতরাং ইনিশিয়ালি একটা এপিসোড ব্যাঙ্ক তৈরি করতে হবে। তার জন্য দিনে ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হবে। পরের দিকে পরিশ্রম কমবে। তখন দিনে অ্যারাউন্ড ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। এই স্ট্রেস নিতে পারবে তো?"

"পৃথিবীতে যত রকমের অ্যাক্টিভিটি আছে, তার মধ্যে ঘুমনো আর খাওয়া বাদ দিলে বাকি সবগুলোই আমার কাছে কাজ। রান্না আমার কাছে বিশ্রাম। রান্না আমার স্ট্রেস বাস্টার।"

"ইউ আর স্টিল আ ভার্জিন?" হা-হা করে হেসে ওঠে লিজ়, "নট টকিং অ্যাবাউট সেক্স অ্যাজ় স্ট্রেস বাস্টার?"

রাহুল তড়িঘড়ি লিজ়ের কাঁধে হাত দিয়ে বলে, "ইউ আর ড্রাঙ্ক লিজ়। কাম, লেট্স গো।"

"উপ্স, সরি!" মধুরার পিঠ থাবড়ে গাড়ির দিকে এগোয় লিজ়।

ড্রাইভার দরজা খুলে দেয়। রাহুল আর লিজ় গাড়িতে উঠলে লম্বা, কালো, এসইউভি-টা নিঃশব্দে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে উধাও হয়ে যায়।

এগারোটা বাজে। কলেজ মোড়ে দুটো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এত রাতে রাজচন্দ্রপুরে যেতে ডবল ভাড়া চাইবে। আজ মধুরা আপত্তি করবে না। আজ তার খুশির দিন!

ব্যাগ থেকে মোবাইল বার করে মধুরা। শুভ্র, কৃশানু, দিয়া, বাড়ি... অনেকগুলো মিস্ড কল জমেছে। ট্যাক্সিতে উঠে এক-এক করে ফোন করতে হবে। পারুলকে মধুরা বলে, "এলাম তা হলে।"

"এসো," থমথমে মুখে বলে পারুল, "ভাল খবরটা আমি বুঝতে পেরেছি। ইংরিজি না জানলে কী হবে, ব্যাপারটা আমি আগে থেকেই জানি। লিজ় ম্যাডাম তোমার দাদার ছবিও তুলেছিল। ওদের পছন্দও হয়েছিল। তোমার দাদা ইংরিজি জানে না বলে কেসটা কেঁচে গেল।"

"সুলতানদা এই শো-টার জন্য শর্ট লিস্টেড হয়েছিল?" অবাক হয়ে বলে মধুরা।

"এখন এসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। অনেক রাত হল। তুমি বাড়ি যাও। লোকটা এখনও ফিরছে না কেন, কে জানে! যখন শাহি টুকরায় ফিনিশিং টাচ দিচ্ছিল, একটা ধুতি পরা লোক এসে ওকে ডেকে নিয়ে গেল। দেখে মনে হল খোচড়।"

"খোচড়? মানে পুলিশ?"

"হ্যাঁ, এই ধাবার দিকে পুলিশের নজর পড়েছে। এখানকার চাটি-বাটি গোটাতে হবে বলে মনে হচ্ছে।"

দোটানার মধ্যে পড়ে অসহায় লাগে মধুরার! লিজ় আর রাহুলের মুখে ভাল খবর শুনে উৎফুল্ল ছিল। নতুন পেশায় প্রবেশ, নতুন জীবনের হাতছানি, লন্ডনে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের চ্যালেঞ্জ, বাড়িতে সুখবর দেওয়ার অ্যাপ্রিহেনশন— সব মিলিয়ে সুখকর স্বাদের সিম্ফনি। পারুলের মুখে ক্যালকাটা ধাবার সাম্প্রতিক খবর শুনে সিম্ফনিতে মিশে গেল তিক্ত ও কটু স্বাদ। যে লোকটাকে সে 'গুরু' বলে মেনেছে, যে লোকটার জন্য সে নিজের পোটেনশিয়ালিটি চিনতে পেরেছে, যে লোকটা তাকে হাত ধরে পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যের দোরগোড়ায় — তার সঙ্গে অবিচার হচ্ছে। এখন মধুরার কর্তব্য কী?

"তুমি বাড়ি যাও," মধুরার সংশয় আন্দাজ করে পারুল বলে, "আমাদের নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।"

নিরুত্তর মধুরা রাস্তা পেরিয়ে ট্যাক্সিওয়ালার কাছে গিয়ে বলে, "রাজচন্দ্রপুর যাব।"

"কুড়ি টাকা বেশি দেবেন," ড্রাইভার মিটার ডাউন করছে।

"এত কম এক্সট্রা চাইলেন?" পিছনের সিটে বসে অবাক হয়ে বলে মধুরা।

"আমার গ্যারাজ ডানকুনিতে। প্যাসেঞ্জার না পেলেও ফিরতে হত। আর আপনি আমাদের এলাকার স্টার। বেশি চাইব না। একটা অটোগ্রাফ দিয়ে দেবেন," উত্তর দেয় ড্রাইভার।

'পাঁচফোড়ন'-এর আফটার এফেক্ট! রাতের ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি যাচ্ছে শাঁ-শাঁ করে। ফোনে দিয়াকে ধরে মধুরা। এই অ্যাচিভমেন্টের গুরুত্ব ও-ই বুঝতে পারবে। হলও তাই। সুখবর শুনে হইহই লাগিয়ে দিল সে। আজও দিয়া আর কৃশানু রাজচন্দ্রপুরে। মুহূর্তের মধ্যে যূথিকা এবং মনোহর খবর পেয়ে গেল। তারা এই কৃতিত্বের গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। মধুরা শুনতে পেল, যূথিকা বলছে, "ওকে তাড়াতাড়ি বাড়ি আসতে বলো।" মনোহর বলল, "কোথায় শুটিং হবে? গ্রিনল্যান্ড ক্লাবে?"

ফোনে কথা বলতে-বলতে হঠাৎ

বিরিয়ানির গন্ধ পেল মধুরা। জায়ফল, জয়ত্রি, কেওড়া, গোলাপজল আর ঘি মেশানো টিপিক্যাল বিরিয়ানির গন্ধ। রান্না করার পরে ভাল করে হাত ধোয়নি নাকি? হাত শুঁকতে-শুঁকতে মধুরা খেয়াল করল, সে এয়ারপোর্টের ভিতরের রাস্তা দিয়ে আড়াই নম্বর গেটের সামনে চলে এসেছে। এই রকম একটা গন্ধওয়ালা স্বপ্ন চাকরিতে জয়েন করার দিন ভোরবেলা মধুরা দেখেছিল না? তার কিছুক্ষণ বাদেই কলেজ মোড়ে সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছিল। দেখা হয়েছিল সুলতানদার সঙ্গে। কী আশ্চর্য সমাপতন!

মধুরাকে অবাক করে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ ভ্যানের পিছন থেকে ছুটে বেরিয়ে এল সুলতান! তার টি-শার্টের কলার পাকড়ে রয়েছে এক ধুতিপরা পুলিশ। পুলিশটা বাঁশের তেল চুকচুকে লাঠি তুলেছে সুলতানকে মারার জন্য। অপেক্ষাঘড়ির ডিজিটাল টাইমার এখন দু'টো শূন্য দেখাচ্ছে। সিগনাল সবুজ। ড্রাইভার ট্যাক্সিতে স্টার্ট দিল। ট্যাক্সি পুলিশ ভ্যান পেরিয়ে যাচ্ছে। সুলতান মধুরাকে দেখতে পায়নি, কারণ, সে নিজের মাথা বাঁচাতে ব্যস্ত। ধুতিওয়ালার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। ধুতিওয়ালা কিছু করার আগেই ভ্যানের পিছন থেকে দৌড়ে এল আর একজন। জিন্স আর না গোঁজা টি-শার্ট, পায়ে স্নিকার্স, চওড়া গোঁফ, আর এক পুলিশ। জিনসওয়ালা সুলতানের পিঠে কনুই চালিয়ে মাটিতে পেড়ে ফেলল। ধুতিওয়ালা এর মধ্যে নিজের লাঠি কুড়িয়ে নিয়েছে। "দাঁড়ান!" ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাঁধ খিমচে ধরেছে মধুরা। ড্রাইভার ব্রেক কষেছে। ট্যাক্সির দরজা খুলে লাফিয়ে নেমেছে মধুরা। হাতাহাতি করতে থাকা তিন ব্যাটাছেলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেঁচাচ্ছে "মারবেন না, ওকে মারবেন না। আমি ওকে চিনি!"

ধুতিওয়ালার লাঠির বাড়ি পড়ছে সুলতানের পিঠে। সে কুঁকড়ে শুয়ে রয়েছে। জিন্সওয়ালা তার পেটে লাথি কষিয়ে হিংস্র চোখে মধুরার দিকে তাকিয়ে বলল, "এত রাতে এখানে কী করছেন?"

রাস্তায় পড়ে থাকা সুলতান গোঙাতে-গোঙাতে বলল, "তুই পালা। তোর নামে পুলিশ কেস হয়ে গেলে ভিসা পাবি না।" মধুরা থমকে যায়। ধুতিওয়ালা এখনও সুলতানকে পেটাচ্ছে। জিন্সওয়ালা সুলতানকে ছেড়ে এক পা-এক পা করে এগিয়ে আসছে মধুরার দিকে। দেশি মদের গন্ধে দম আটকে আসছে মধুরার। জিন্সওয়ালার চোখে চোখ রেখে সে বলে, "আপনারা পুলিশ হয়ে একটা লোককে পেটাচ্ছেন?"

"মধু, তুই যা!" আবার চিৎকার করে সুলতান, "আমার কিচ্ছু হবে না। কিন্তু তোর বাইরে যাওয়া আটকে যাবে।"

ধুতিওয়ালার থাপ্পড়ে সুলতান চুপ করে যেতে বাধ্য হয়।

জিন্সওয়ালা আর এক পা এগিয়ে এসে বলে, "মুখটা চেনা-চেনা লাগছে!"

ট্যাক্সির হর্ন শুনে মধুরা হুঁশে আসে। ট্যাক্সি ড্রাইভার পুলিশের ভ্যান পার করে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। ইঞ্জিন বন্ধ করেনি। হর্ন শুনে বোঝা যাচ্ছে, প্যাসেঞ্জার স্টার হোক বা আম আদমি, না ফিরলে এবার সে পালাবে।

ঠান্ডা মাথায় জিন্সওয়ালার দু'পায়ের ফাঁক লক্ষ করে পা চালায় মধুরা। ঘাপ! মোক্ষম জায়গায় ঘা খেয়ে পুলিশটি 'ওঁক' করে রাস্তার ধারে লুটিয়ে পড়ে। মধুরা দৌড়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠে বলে, "চলুন।"

ড্রাইভার যশোহর রোড আড়াআড়ি টপকে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ধরে। তারপর ফাঁকা রাস্তায় শাঁ-শাঁ করে গাড়ি হাঁকায়।

মধুরা মোবাইল থেকে শুভ্রকে ফোন করেছে। শুভ্র ফোনে একটা রিং হওয়া মাত্র সে ফোন ধরল, "কৃশানুদা বলল তুমি লন্ডন যাচ্ছ? কী একটা টিভি-ফিভির শো করতে। সত্যি না ঢপ?"

মধুরা শুভ্রর বকবক থামিয়ে বলে, "কাকু কোথায়?"

"বাবা আমার পাশে। আমরা এখন খাচ্ছি। তুমি কথা বলবে?" শুভ্র গুরুপদকে ফোন দেয়।

"কী ব্যাপার? তুই নাকি বিদেশ যাচ্ছিস?" রুটি চিবোতে-চিবোতে প্রশ্ন করে গুরুপদ।

"কাকু, দুটো পুলিশ মিলে সুলতানদাকে মারছে, এয়ারপোর্টের আড়াই নম্বর গেটের কাছে। তুমি প্লিজ কিছু করো। প্লিজ, প্লিজ..." কাঁদতে-কাঁদতে বলছে মধুরা। সে খেয়াল করেনি সুলতানের নাম শুনে গুরুপদ লাইন কেটে দিয়েছে।

১৮

নেতাজি সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পার্কিং লটে, সকাল সাড়ে ন'টায় এসে দাঁড়াল কৃশানুর গাড়ি। গাড়ি থেকে একে-একে নামল মনোহর, যুথিকা, দিয়া, এবং মধুরা। সবশেষে কৃশানু। ডিকি খুলতে-খুলতে লিফ্টকে ফোন করে মধুরা। ফোন কেটে বলে, "পুরো টিম ভেতরে ঢুকে গিয়েছে।"

ঘড়ি দেখে মনোহর বলল, "ফ্লাইট সাড়ে এগারোটায়। চেক ইন কতক্ষণ আগে হয় রে কৃশানু?"

"ঘণ্টাখানেক," একটা বড় ট্রলি ব্যাগ আর একটা হ্যান্ডব্যাগ এয়ারপোর্টের ট্রলিতে রেখে কৃশানু মধুরাকে বলল, "এখন থেকে এইটুকুই তোর সম্পত্তি। মালের দায়িত্ব আরোহীর। নিজের জিনিস বুঝে নে।"

সামান্য এই কথায় ডুকরে কেঁদে উঠল যুথিকা, "কত দূরে চলে যাচ্ছে। অকারণে!"

সেই রাতে বাড়ি ফেরার পরে যা-যা ঘটেছিল, তা ভেবে মুচকি হাসে মধুরা।

ফিরতে রাত সাড়ে এগারোটা বেজেছিল। কৃশানু নেট থেকে স্টার শেফদের বার্ষিক আয় দেখছিল আর আঁতকে উঠছিল। মধুরাকে বলেছিল, "তুই তো এখন মিলিয়নেয়ার! রান্না করে যে বছরে লাখ-লাখ পাউন্ড রোজগার করা যায়, এ আমার ধারণা ছিল না!"

"পাঁচতারা হোটেলে থাকা খাওয়া, শোফার ড্রিভন কারে ঘুরে বেড়ানো, ভ্যানিটি ভ্যান, পার্সোনাল সিকিওরিটি, হেয়ার স্টাইলিস্ট, মেক-আপ আর্টিস্ট —সব ফ্রি!" মুচকি হেসে বলেছিল দিয়া।

"এমন করে বলছ, যেন আমি এক বছরের পেড হলিডেতে লন্ডন যাচ্ছি!" দিয়াকে ভেংচি কেটেছিল মধুরা, "শোয়ের লাইন প্রোডিউসর অলরেডি বলে দিয়েছে যে দিনে ১৬-২০ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। আগামী এক বছর নো ছুটিছাটা।"

"লন্ডন? তুই সত্যি যাবি নাকি? দু'টো লোক তোকে কী বোঝাল আর তুই বুঝে গেলি?" এতক্ষণে মুখ খুলেছে মনোহর, "এর মধ্যে নানা জালিয়াতি থাকে। র‍্যাকেট থাকে। খারাপ মতলবে এরা মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করে।"

"বাবা প্লিজ! বাংলা নভেলের মতো ডায়ালগ দেবেন না," দিয়া মনোহরকে আওয়াজ দেয়, "এলিজাবেথ আর্চার হাই লাইফের অত্যন্ত এফিশিয়েন্ট প্রোডিউসার। ওর হাত দিয়ে একাধিক রিয়্যালিটি শোয়ের জন্ম হয়েছে। আমরা ইন্ডিয়ায় বসে তার জোলো হিন্দি ভার্শন দেখি বছর তিনেক বাদে। শি ইজ় আ জিনিয়াস। আপনি শিয়োর থাকুন, মধুরা উইল বি আ স্টার।"

"কিন্তু বাঙালিরা তোকে চিনবে না। 'শাশুড়ির কিস্তিমাত বউমা কুপোকাত' কিংবা 'নাচ ময়ূরী নাচ' শোতে অ্যাপিয়ার না করলে বাঙালি তাকে স্টার বলে মনে করে না!" ফুট কেটেছিল কৃশানু।

"তা বলে লন্ডন? সে তো অনেক দূরের পথ!" বিড়-বিড় করেছিল মনোহর।

যুথিকা কোনও কথা বলছিল না। ব্যথার

তেল মালিশ করতে-করতে নিঃশব্দে কাঁদছিল।

"আমরা এসে গেছি!" সকলকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করে সবিতা। কৃশানুর গাড়িতে আঁটবে না বলে সে আর বিমল ট্যাক্সিতে এসেছে। ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হয়েছে মধুরাকে।

"ওই দোকানটায় শিঙাড়া আর খাস্তা গজা পাওয়া যাচ্ছে। তোমরা খাবে নাকি?" সকলের কাছে জানতে চায় বিমল,"এখানকার বাউনগুলো কেমন রাঁধে, একটু দেখতুম।"

"মধুকে দিও না," চোখের জল মুছে বলে যূথিকা, "তোমাদের সকলের জন্য নিয়ে এসো। আর দ্যাখো, ওখানে চা পাওয়া যায় কি না। আমি শুধু চা খাব।"

"এয়ারপোর্টের গজা! চেখে দেখলে পারতে!" মাকে খোঁচা মারে মধুরা।

"না, তুমি ওদেশে পৌঁছানো পর্যন্ত আমি কিছু খাব না। মানত আছে," পান চিবোতে-চিবোতে জানায় যূথিকা।

সকলের হাতে শিঙাড়া আর গজার ঠোঙা ধরিয়ে বিমল বলে, "চা আর পান মানতের লিস্টি থেকে বাদ। কেমনধারা মানত কে জানে!"

বিমলের কথা শুনে সকলে হাসলেও মধুরা বলে, "মা, এই ফ্লাইটের হিথরো পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে। ততক্ষণ না খেয়ে থেকো না।"

"তুই খাওয়াদাওয়া ছাড়া অন্য বিষয়ে কথা বল," বিরক্ত হয়ে বলে মনোহর।

"রান্না করা, খাওয়া আর খাওয়ানো, এর বাইরে তোর জীবনে আর কিছু নেই? শুভ্র কোথায়?"

"কী জানি! বলেছিল, এয়ারপোর্টে আসবে। মাসিমা-মেসোমশাইও আসবেন। এখনও তাদের টিকি দেখা যাচ্ছে না।"

শুভ্রদের দেখা না গেলেও অন্য দুই চেনা মুখ দেখা গেল। অ্যানি এবং মেরি। মেরি ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে ঝগড়া করছে। অ্যানি দৌড়তে-দৌড়তে এসে মধুরাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কনগ্র্যাচুলেশনস কিচেনকুইন!" তারপর মধুরাকে জড়িয়ে ধরে দু' গালে টপাটপ চুমু খেয়ে বলল, "আমাদের রকস্টার! আমাদের ইনস্পিরেশন। লাভ ইউ ডার্লিং!"

মেরিকে দেখে আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে মধুরা। মেরির মতো ভেটেরান ষ্টাগলাররা কখনও হারিয়ে যায় না। গোপনে মনোকষ্ট লুকিয়ে রেখে তারা বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যকে অন্য খাতে বাহিত করে। মেরির ইচ্ছে ছিল শেফ হওয়ার। ইভেন্ট ম্যানেজার হিসেবে জীবন কাটাচ্ছে। মেরির সামনে নিজেকে খুব ছোট, খুব ভালনারেবল লাগে মধুরার। স্বপার্জিত সাফল্যের জন্য নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। অনুভূতি চাপা দিতে মধুরা তাড়াতাড়ি বলে, "সো, হোয়াটস কুকিং?"

"নেহার অবস্থা খুব খারাপ। স্টার হয়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

খবরটা মধুরা জানে। ক্যালকাটা ধাবায় এলিজাবেথের আনঅফিশিয়াল আমন্ত্রণ আর আজকের প্লেনযাত্রা, এর মধ্যে ব্যবধান পনেরো দিনের। এই সময়টা প্রচণ্ড ব্যস্ততা এবং খাটনির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। পরের দিনই হোটেল সুবর্ণতে গিয়ে কাগজপত্রে সইসাবুদ করা দিয়ে কর্মযজ্ঞের শুরু। তারপর ভিসার জন্য আবেদন, ভিসার ইন্টারভিউ, ব্যাগ গোছানো, বাবা-মায়ের সঙ্গে দফায়-দফায় আলোচনা, শুভ্র এবং দত্তবাড়ির সঙ্গে মিটিং, এসবের মধ্যে দিয়ে দিনগুলো হুশহুশ করে পেরিয়ে গিয়েছে।

সুসংবাদ শুনে অর্ণব ফোন করেছিল। সে নেহার ওপরে প্রচণ্ড বিরক্ত। বলল, "পাঁচফোড়ন-এর সাকসেস ওর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। 'নাচ ময়ূরী নাচ'-এর সেটে গেস্ট হিসেবে ডাকা হল। বসে থাকা, হাততালি দেওয়া, দু'-একটা কথা বলা, এই তো কাজ। প্রথম দিন ১০ ঘণ্টা শুটিংয়ের শেষে রেগেমেগে সেট থেকে বেরিয়ে গেল। পরের দিন আর এল না। স্টুপ টিভি ওর পেমেন্ট স্টপ করে দিয়েছে। 'পাঁচফোড়ন'-এর সিজন টু তে ওকে ডাকা হবে না। ম্যাপস্টিক-এর পক্ষ থেকে আমি ওর এগেনস্টে কনট্র্যাক্ট ভায়োলেশনের জন্য লিগাল অ্যাকশন নিচ্ছি।"

মধুরা অর্ণবের কথা নিঃশব্দে শুনছে। অর্ণব বলছে, "হাই লাইফের সঙ্গে কনট্র্যাক্ট শেষ হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করিস।"

মেরিকে এসব কথা বলার কোনও মানে হয় না। মধুরা চুপ করে থাকে।

অ্যানি তড়বড় করে বলে, "অফিসে স্যান্ডির অবস্থা দেখলে তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। একদিন লিগাল সেলের ল-ইয়ারকে নিজের চেম্বারে ডেকে স্টুপ টিভি আর ম্যাপস্টিক প্রোডাকশন হাউজের বিরুদ্ধে মামলা করার প্ল্যান করেছিল। খবরটা ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দিল্লি অফিসের কানে গিয়েছে। অফিসের হিউম্যান রিসোর্সকে পার্সোনাল কাজে ব্যবহার করার জন্য স্যান্ডি ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়্যারির মুখোমুখি হচ্ছে। হয়তো ও নিজেকে সেভ করে নেবে। কিন্তু ওর ভালমানুষির ইমেজটা ভেঙে গেল।"

অ্যানির কথা শুনে মধুরা বলল, "দিল্লি অফিসে খবরটা গেল কী করে? ক্যালকাটা অফিসের লিগাল সেলের সঙ্গে স্যান্ডির তো হেবি দোস্তি!"

নীচের ঠোঁট কামড়ে সামান্য ভাবে অ্যানি। অবশেষে বলে, "এটা শুভ্র করেছে।"

"ওই দ্যাখ!" উত্তেজিত হয়ে মধুরার কনুই খামচে ধরেছে যূথিকা, "শুভ্র এসেছে।"

গাড়ি থেকে নামছে শুভ্র। সেদিকে এগিয়ে যেতে-যেতে মনোহর যূথিকাকে বলল, "শুভ্রর বাবা-মাও এসেছেন। ওঁদের কাছে হাঁটুর ব্যথা নিয়ে কাঁদুনি গাওয়া শুরু কোরো না!"

মনোহরের কথায় পাত্তা না দিয়ে যূথিকা বিমলকে বলল, "দোকান থেকে আরও শিঙাড়া আর গজা নিয়ে এসো। প্লেটে আনবে।"

শুভ্রকে দেখে অন্যরকম অনুভূতি হল মধুরার। দীর্ঘদিন ধরে সে বুঝতে পারত না, শুভ্রকে সে ভালবাসে, না বাসে না। তার প্রতি শুভ্রর ভালবাসায় অবশ্য কোনও খাদ ছিল না। মধুরা তাই শুভ্রকে মানসিকভাবে গ্রহণ করেছিল। হয়তো বিয়ের প্রস্তাবে রাজিও হয়ে যেত। হাই লাইফের অফারটা মেটিরিয়ালাইজ় করার পরে মধুরা আর নিশ্চিত নয়।

শুভ্রকে নিয়ে নিশ্চিত। বিয়ে নিয়ে নয়। বিয়ে এখন করবে না, শুভ্রকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে মধুরা।

"এক বছর পর?" শুভ্র প্রশ্ন করেছে।

মধুরা মানসিকভাবে গ্রহণ করেও বুঝতে পারত না, শুভ্রকে সে ভালবাসে, না ভালবাসে না।

"আয়াম নট শিওর।"
"আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে?"
"আমার অ্যাজেন্ডায় এই মুহূর্তে বিয়ে নেই," জানিয়েছে মধুরা।
অনেকটা ভালবাসা আর সামান্য ক্রোধ মেশানো দৃষ্টিতে মধুরার দিকে তাকিয়ে শুভ্র বলেছে, "আমি আছি কি?"
"উফ্! কী রাগ!" শুভ্রর গাল টিপে দিয়ে, চুল ঘেঁটে দিয়ে, ঠোঁটে চকাম করে একটা চুমু খেয়ে মধুরা বলেছে, "আছ। ভীষণভাবে আছ।"
সেই ভরসাতেই মঞ্জু আর গুরুপদ আজ এয়ারপোর্টে। ভাবী বেয়াই-বেয়ানরা যখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় ব্যস্ত, তখন শুভ্র মধুরাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলে, "ভাবছিলাম, স্যান্ডিকে জপিয়ে লন্ডনে কোনও একটা প্রজেক্ট নিয়ে মাসখানেকের জন্য তোমার কাছে গিয়ে থাকব। সেটা আর হওয়ার নয়।"
শুভ্রর ইঙ্গিত স্যান্ডির কেলেঙ্কারির দিকে। সেটা বুঝতে পেরে মধুরা বলে, "এতটা ঝাড় না দিলেই পারতে।"
"অফিসে তোমার সঙ্গে ও যেভাবে মিসবিহেভ করেছিল, তাতে আমার তরফে আরও বড় ঝাড় পাওনা ছিল। এখন শুনছি, ক্যান্টিনের কন্ট্র্যাক্ট পাইয়ে দেওয়ার কেলেঙ্কারিটা নিয়েও ইনভেস্টিগেশন হবে। গতকাল জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে পিলখানার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার সময়ে সুলতানদাকে দিয়ে সই করিয়ে আমি একটা মেল পাঠিয়েছি দিল্লি অফিসে। উইথ অল নেসেসারি ডকুমেন্টস।"
"স্যান্ডি জানে যে, এগুলো তোমার কাজ?" কার পার্কিংয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে মধুরা। সুলতানের প্রসঙ্গ তাকে ভিতরে-ভিতরে প্রচণ্ড উত্তেজিত করে দিয়েছে। গত ১৫ দিনের ঝোড়ো ব্যস্ততায় সুলতানের খবর নিতে পারেনি সে।
সেই রাতে পুলিশ সুলতানকে অ্যারেস্ট করেছিল। মধুরার এমার্জেন্সি ফোন পেয়ে গুরুপদ অনেক চেষ্টা করেও সুলতানের গ্রেফতার হওয়া আটকাতে পারেননি। অ্যারেস্টের নির্দেশ এসেছে অনেক উপরতলা থেকে। নিউ টাউন থানার বড়বাবুর পক্ষে সেই নির্দেশ অমান্য করে অন্য থানার বড়বাবুর অনুরোধ রাখা সম্ভব হয়নি। পুলিশকে সরকারি কাজের সময় বাধাদান, মারধর করা, চিটিং। একাধিক আইপিসি। দফা ৪২০, নন বেলেবল অফেন্স। ১৪ দিন সুলতানকে জেল হাজতে রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে পুলিশ গিয়ে ক্যালকাটা ধাবা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। একজন ফুটপাত জবরদখলকারীর হাত থেকে মুক্ত হয়েছে কলকাতা শহর।
পারুল আর মন্টু ফিরে গিয়েছে পিলখানার বস্তিতে। ব্যাঙ্কে জমানো কিছু টাকা ছিল। তাই দিয়ে উকিল অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া, আরবিএম, সেক্টর ফাইভের অন্য অফিসের ছেলেমেয়েরা মিলে একটা ফান্ড তৈরি করেছে। চেক বা ড্রাফটও জমা পড়েছে কিছু। রাহুলও চেক পাঠিয়েছে। কৃশানু আর শুভ্রর চেষ্টায়, গুরুপদর তৎপরতায়, গতকাল সুলতান জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। গত ১৪ দিন সুলতানকে ফোন করেনি মধুরা। জেলে মোবাইল কাছে রাখতে দেয় না। গতকাল ছাড়া পাওয়ার পরে বার চারেক ফোন করেছিল। প্রতিবার রিং হয়ে গিয়েছে। কেউ ধরেনি।
"স্যান্ডি জানে," মধুরার প্রশ্নের উত্তর দেয় শুভ্র, "লিগাল সেলের ল-ইয়ারদের ব্যক্তিগত কাজে লাগানো আর ক্যান্টিনে চেনাশোনা লোককে কন্ট্র্যাক্ট পাইয়ে দিয়ে কাট মানি খাওয়া, এই দু'টো অভিযোগ দিল্লি অফিসে আমিই মেল করেছি।
ও আমার বস হতে পারে, কিন্তু আমি ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্টাফ। কোম্পানির ভাল-মন্দ দেখার অধিকার আমার আছে।"

"তোমার কোনও ক্ষতি হবে না তো?" ভয়ে-ভয়ে জানতে চায় মধুরা।

"হোপফুলি না," মধুরার পিঠে হাত দিয়ে শুভ্র বলে, "তোমার এবার ভিতরে ঢোকা উচিত। পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে গল্প করতে-করতে ফ্লাইট মিস করবে।'"

ডোমেস্টিক টার্মিনালের ভিড় টপকে ১২ জনের দলটা ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালে পৌঁছল। লিজ় আর তার টিম অলরেডি সেখানে মজুত। রাহুলও রয়েছে। সে মধুরার সঙ্গোপাঙ্গকে দেখে বলল, "ডার্টি ডজন?"

"এখনই ১১ জন চলে যাবে!" ফুট কাটে মেরি।

যূথিকা, মনোহর, মঞ্জু, গুরুপদ, মেরি, সকলের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মধুরা। কৃশানু বলে, "আমায়ও প্রণাম কর!" দাদাকে জড়িয়ে ধরে মধুরা। দিয়ার কানে-কানে বলে, "সাবধানে অফিস কোরো। সবে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার।" বিমল আর সবিতার হাত ধরে। অ্যানিকে বলে, "'বাই অ্যানি, ফেসবুকে কথা হবে।"

শুভ্রকে বলে, "এলাম।" তারপর লিজ়ের টিমের সঙ্গে কাচের দরজা পেরিয়ে এয়ারপোর্টের পেটের ভিতরে ঢুকে পড়ে। সিকিওরিটি চেক হয়ে গেল। লাউঞ্জে কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের লন্ডনগামী ফ্লাইটের জন্য যাত্রীদের দু' নম্বর গেটের সামনে জমা হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল। হাই লাইফ টিমের কেউ নিজের আসন থেকে নড়ল না।

লিজ়ের পাশে বসে, মোবাইলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মধুরা। মনে নানা চিন্তা। সুলতানের কী হল? সুলতান ফোন করছে না কেন? মধুরার কি আর একবার ফোন করা উচিত? সুলতান কি তার উপরে অভিমান করেছে? অভিমান তো মধুরার করা উচিত। কাল একবারও ফোন ধরেনি সুলতান...

নীচের ঠোঁট কামড়ে সামান্যক্ষণভাবে মধুরা। ফোন না করাটা বোকামি হয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই প্লেনে উঠবে সে। কলকাতার মাটি থেকে এক বছরের জন্য উড়ে যাওয়ার আগে সুলতানকে একবার ফোন করবে না? কি-প্যাডে আঙুল রাখে মধুরা। রিং হচ্ছে...এয়ারলাইনসের বাস এসে দাঁড়িয়েছে কাচের দরজার বাইরে। এই বাসে চেপে প্লেন পর্যন্ত যেতে হবে। লোকজন হ্যান্ডব্যাগ ঝুলিয়ে লাইন তৈরি করেছে। এয়ারলাইনসের লোক আর সিকিওরিটি মিলে যাত্রীদের টিকিট দেখে বাসে তুলছে। রাহুল টুক-টুক করে এগোচ্ছে সে দিকে। লিজ় মধুরার কাঁধে হাত রেখে দরজার দিকে ইশারা করছে।

"এয়ারপোর্টে এক কাপ কফির কত দাম রে?" মধুরার কানের মধ্যে গর্জন করে উঠল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সুলতান! মধুরার গলার মধ্যে একটা রসগোল্লা আটকে গিয়েছে। মধুরার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে। মধুরার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। মধুরার পা দুটো ময়দা দিয়ে তৈরি। মধুরা বোধ হয় এয়ারপোর্টের মেঝেতে ল্যাগ-ব্যাগ করে পড়ে যাবে!

"এভরিথিং অল রাইট?" মধুরার মুখচোখ দেখে শঙ্কিত প্রশ্ন করছে লিজ়।

"তু-তুমি কি এয়ারপোর্টে?" লাইনে না দাঁড়িয়ে প্রধান দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মধুরা, "আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"না রে, পটের বিবি! আমি পিলখানায়।"

"তোমাকে কাল থেকে অনেকবার ফোন করেছি। তুমি কেন আমার ফোন ধরছ না? তুমি কেন এয়ারপোর্টে এলে না? কেন আমাকে সি অফ করলে না? আমার মনখারাপ করবে না বুঝি?"

হা-হা করে হেসে ওঠে সুলতান। লিজ় মধুরাকে টানতে-টানতে লাইনে দাঁড় করিয়েছে। চেকিং পর্ব চুকিয়ে তুলে নিয়েছে বাসে। বাস দৌড় লাগাচ্ছে হাওয়াই জাহাজের উদ্দেশে। জাহাজ নয়, ওটা একটা ধাতব পাখি, যে আর একটু বাদেই ডানা মেলে মধুরাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে। অন্য এক দেশে। যেখানে সুলতান নেই। যেখানে ক্যালকাটা ধাবা নেই। যেখানে কলকাতা নেই। যেখানে ফুচকা, ঝালমুড়ি, চিকেন রোল, চপকাটলেট, পাপড়ি চাট নেই।

"আমাকে নিয়ে একদম মনখারাপ করিস না, বুঝলি পটের বিবি? লন্ডনে রোজ ১৮ ঘণ্টা শুটিং করতে-করতে যখন কোমর ভেঙে আসবে, বার্নারের সামনে দাঁড়িয়ে রান্না করতে-করতে যখন চোখ-মুখ জ্বালা করবে, চার ঘণ্টা ঘুমের শেষে যখন বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করবে না, ইউনিটের লোকজন যখন 'লেজি ইন্ডিয়ান' বলে আওয়াজ দেবে, তখন রাগের চোটে দাঁত কিড়মিড় করে কাকে গালাগালি দিবি? তোর শান্ত জীবনকে ভেঙে তছনছ করে দিল কে? সেই শয়তানটাকে নিয়ে একদম মনখারাপ করিস না!"

পাইলট তার বক্তব্য পেশ করছে। আপৎকালীন অবতরণের সময় কীভাবে মাস্ক পরতে হবে আর তিরচিহ্নিত পথে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, মাইম করে বুঝিয়ে দিয়েছে বিমানবালা। যাত্রীদের সিটবেল্ট বাঁধা শেষ। সকলে মোবাইল সুইচ অফ করে দিয়েছে। ঘরঘর শব্দে কেঁপে উঠে ধাতব পাখি টুকটুক করে হাঁটছে। দৌড়চ্ছে। রানওয়ে বরাবর দৌড়ের গতি ক্রমশ বাড়ছে। উইন্ডো সিটে বসা মধুরাকে আইল সিটে বসা লিজ় হাতের ইশারায় বলছে, মোবাইল সুইচ অফ করতে। শাড়ি পরা বিমানবালা ভুরু কুঁচকে মধুরার দিকে তাকিয়ে।

"আমি একশোবার মন খারাপ করব। হাজার বার মন খারাপ করব! একলাখ বার মন খারাপ করব। সব্বাইকে ছেড়ে একদল অচেনা লোকের সঙ্গে আমি বিদেশে চলে যাচ্ছি। আমার মনখারাপ হবে না? আমার বুকের ভিতরটা ধুকপুক করছে। কষ্ট হচ্ছে।"

"ওই ধুকপুকুনিটাই তো আমি রে পটের বিবি! ওই কষ্টটাই আমি। ওটাকে জিইয়ে রাখ। ফোকাস ঠিক রাখ। ফোকাস..."

প্লেন ইউ টার্ন নিয়েছে। খুঁজে পেয়েছে উড়ালের পথ। চাকার সঙ্গে রানওয়ের ঘর্ষণে ঠিকরে উঠছে আগুনের ফুলকি। অবশেষে প্লেন উড়ল। মধুরার মোবাইলের টাওয়ারও চলে গেল।

"সুলতানদা! বাই!" বন্ধ হয়ে যাওয়া মোবাইলে ফিসফিস করে বলল মধুরা। চোখের জল মুছে মোবাইল হ্যান্ডব্যাগে ঢোকাল। জানলা দিয়ে তাকাল নীচে।

ওই তো! ক্যান্ডি ফ্লসের মতো মেঘ উড়ে যাচ্ছে। ওই তো! গড়িয়ে পড়া দুধের ধারার মতো বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা! ওই তো! বুফে টেবিলে পাতা নানা পদের মতো সাজানো রয়েছে বাংলার গ্রামগঞ্জ, শহর, নগর। ওই তো! গাঢ় কফির মতো আস্তে-আস্তে ধূসর হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। বাবা-মা, দাদা-বউদি, সহকর্মী-বন্ধুবান্ধব, প্রেমিক-কাছের মানুষদের পিছনে ফেলে রেখে মধুরা উড়ে যাচ্ছে এক বাস্তবতা থেকে অন্য এক বাস্তবতায়।

"কেমোন লাগচে?" নতুন শেখা বাংলা দিয়ে মধুরাকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছে লিজ়, "ফিলিং বেটার?"

খাবারের ট্রলি ঠেলতে-ঠেলতে বিমানবালা এখন তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। এ-ই একটু আগে মোবাইলে কথা বলার জন্য মধুরার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল। এখন তার মুখে স্মিত হাসি। 'ফিলিং বেটার?' লিজ়ের প্রশ্নটিকে নিজের ভিতরে গড়াতে দেয় মধুরা। এখন তার কেমন লাগছে? ভাল? মন্দ? না অন্য রকম?

ভিতর থেকে উত্তর পেয়ে যায় মধুরা। বিমানবালার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বলে, "ফিলিং হাংরি!"

লিজ় আর এয়ারহোস্টেস হেসে ওঠে। প্লেন উড়ে যেতে থাকে।

অলংকরণ: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য